পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

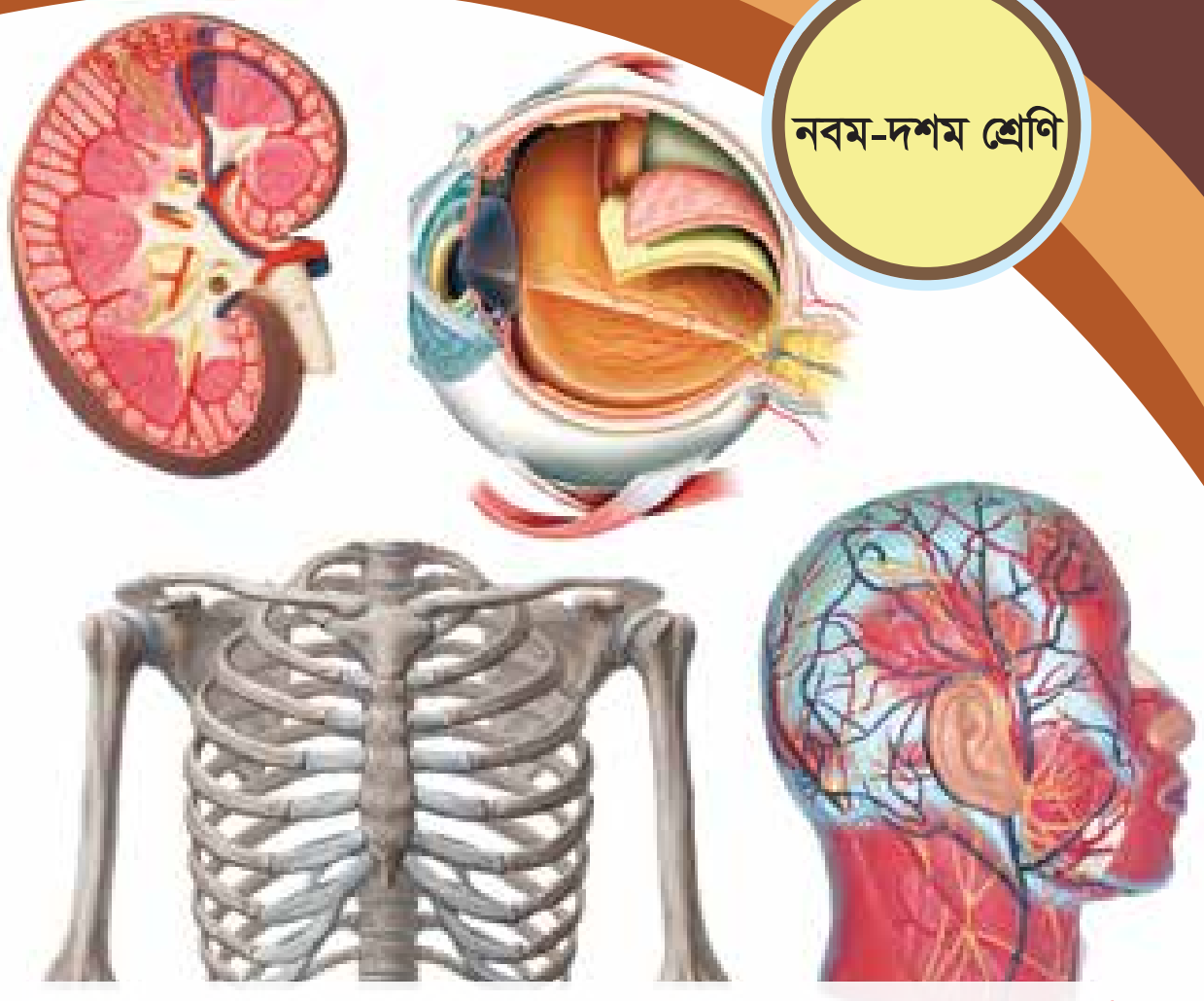

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

ড. এন. এম. কিরন

এম, ডি (হংকং); পিইচ ডি (শ্রীলংকা);
ডিপিএম (জাপান); জিএনডব্লিউসি (আমেরিকা);
ডক্টরেট ইন আকুপাংচার; আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক ও নিবন্ধনপ্রাপ্ত
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর ইন্টিগ্রেডেট মেডিসিন, ধানমন্ডি, ঢাকা

সম্পাদক

ডাঃ ফাতেমা জোহরা আখন্দ

এমবিবিএস,
পিজিটি (গাইনী অ্যান্ড অবস্)
এফসিপিএস-২ (ফিজিক্যাল মেডিসিন)
উপাধ্যক্ষ
বাংলাদেশ রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর ইন্টিগ্রেডেট মেডিসিন, ধানমন্ডি, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগারি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র		
অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	দেহ তত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান	১-৯
দ্বিতীয়	কোষের গঠন, উপাদান ও কাজ	১০-১৭
তৃতীয়	কলার গঠন ও কাজ	১৮-২৬
চতুর্থ	মানবদেহের কাঠামো	২৭-৪৫
পঞ্চম	রক্ত, রক্ত সংবহনতন্ত্র ও হৃদপিন্ড	৪৬-৭০
ষষ্ঠ	লসিকা ও লসিকাতন্ত্র	৭১-৭৩
সপ্তম	শ্বসনতন্ত্র	৭৪-৮৩
অষ্টম	পরিপাকতন্ত্র	৮৪-৯৭
নবম	রেচনতন্ত্র	৯৮-১০৬
দশম	প্রজননতন্ত্র	১০৭-১২০
একাদশ	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	১২১-১২৫
দ্বাদশ	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি	১২৬-১৩০
ত্রয়োদশ	স্নায়ুতন্ত্র	১৩১-১৪৫
চতুর্দশ	সংবেদী অঙ্গসমূহ	১৪৫-১৬০
ব্যবহারিক		
১	দৈহিক অবস্থা ও দেহের বিভিন্ন তলের চিত্র	১৬৩
২	পেটের ৯টি ভাগের চিত্র	১৬৪
৩	একটি মানব কোষের চিত্র	১৬৫
৪	একটি নিউক্লিয়াসের চিত্র	১৬৬
৫	একটি মাইটোকন্ডিয়ার চিত্র	১৬৭
৬	বিভিন্ন পেশি কলার চিত্র	১৬৭
৭	মানব অস্থি তন্ত্রের চিত্র	১৬৭
৮	আদর্শ সাইনোভিয়াল জয়েন্টের চিত্র	১৬৮
৯	রক্ত কনিকার চিত্র	১৬৯
১০	হৃদপিন্ডের চিত্র	১৭০
১১	রক্ত সংবহনের চিত্র	১৭১
১২	শ্বসনতন্ত্রের চিত্র	১৭২
১৩	পরিপাকতন্ত্রের চিত্র	১৭৩
১৪	যকৃত ও পিত্তথলির চিত্র	১৭৪
১৫	একটি বৃক্কের চিত্র	১৭৫
১৬	অক্ষিগোলকের চিত্র	১৭৬

দ্বিতীয় পত্র		
অধ্যায়	বিষয়বস্তু (তাত্ত্বিক)	পৃষ্ঠা
প্রথম	অণুজীব বিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান	১৭৯-১৮৪
দ্বিতীয়	অণুজীব ও অণুজীবের প্রকারভেদ	১৮৪-১৯৬
তৃতীয়	জীবাণুমুক্তকরণ	১৯৬-২০২
চতুর্থ	প্রদাহ ও নিরাময়	২০২-২০৪
পঞ্চম	পরজীবী ও পরজীবীর প্রকারভেদ	২০৫-২১৮
ষষ্ঠ	গণস্বাস্থ্য	২১৯-২৪০
ব্যবহারিক		
১	একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ এবং অংশগুলোর কাজ বর্ণনা	২৪৩
২	একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পায়খানার নমুনায় পরজীবীর উপস্থিতি নিরূপণ	২৪৪
৩	একটি ব্যাকটেরিয়ার আঙ্গিক গঠন বর্ণনা করণ এবং অঙ্গসমূহ	২৪৫
৪	এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকার জীবন চক্রের ধাপ বর্ণনা কর	২৪৬
৫	ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবন চক্রের ধাপগুলো চিহ্নিত কর	২৪৭
৬	চিত্র চিহ্নিতকরণ	২৪৮

প্রথম অধ্যায়

দেহতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান

দেহতত্ত্ব বা এনাটমি ও শরীরতত্ত্ব বা ফিজিওলজি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

দেহতত্ত্ব বা এনাটমি (Anatomy) হলো মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান।

সামগ্রিক দেহতত্ত্ব (Gross Anatomy) হলো মানবদেহের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান যা খালি চোখে দেখা যায়।

স্থানিক দেহতত্ত্ব (Regional Anatomy) হলো মানবদেহের এক একটি অংশ বা স্থানের বিভিন্ন অংশের বর্ননা। যেমন- মাথা ও গলা (Head-Neck), উর্ধ্বাঙ্গ (Upper Limb), নিম্নাঙ্গ (Lower Limb) ইত্যাদি।

তন্ত্রীয় দেহতত্ত্ব (Systemic Anatomy) হলো মানবদেহের এক একটি তন্ত্রের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System), পরিপাকতন্ত্র (Digestive System) ইত্যাদি।

আণুবীক্ষণিক দেহতত্ত্ব (Microscopic Anatomy) হলো মানবদেহের ক্ষুদ্র অঙ্গসমূহের গঠন যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscopic) এর সাহায্যে দেখা যায়। যেমন- কোষের গঠন, কলার গঠন প্রভৃতি।

সাধারণ শরীরতত্ত্ব (General Physiology) হলো মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও জীব কোষের মৌলিক গঠন, উৎপত্তি, বৃদ্ধি সংক্রান্ত ভৌতিক ও রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান।

শরীরতত্ত্ব বা হিউম্যান ফিজিওলজি (Human Physiology) হলো মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যপ্রণালি সম্পর্কে জ্ঞান।

অস্থি বিদ্যা (Osteology) হলো হাড় (Bone) সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- হিউমেরাস, ফিমার, রেডিয়াস ও আলনা, টিবিয়া, ফিবুলা, কশেরুকা ইত্যাদি।

সন্ধি বিদ্যা (Arthrology) হলো মানবদেহের বিভিন্ন সন্ধি (Joint) সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- স্কন্ধ সন্ধি (Shoulder Joint), জঙ্ঘা সন্ধি (Hip Joint), কনুই সন্ধি (Elbow Joint) ইত্যাদি।

পেশি বিদ্যা (Myology) হলো পেশি (Muscle) সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন- বাহুর পেশি:-ডেলটয়েড (Deltoid), বাইসেপস্ (Biceps), হৃদপেশি (Cardiac Muscle) ইত্যাদি।

রক্তরোগ বিদ্যা (Haematology) হলো রক্তরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

যকৃতরোগ বিদ্যা (Hepatology) হলো যকৃতের রোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

চর্মরোগ বিদ্যা (Dermatology) হলো চর্মরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

স্নায়ুরোগ বিদ্যা (Neurology) হলো স্নায়ুরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

হৃদরোগ বিদ্যা (Cardiology) হলো হৃদরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

স্ত্রীরোগ বিদ্যা (Gynaecology) হলো স্ত্রীরোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

মূত্ররোগ বিদ্যা (Urology) হলো মূত্র ও মূত্ররোগ সম্পর্কে জ্ঞান।

দেহতত্ত্ব বা এনাটমিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দাবলি

দৈহিক অবস্থা (Anatomical Position) ঃ একজন মানুষ সোজাভাবে হাত, পা, সোজা করে খাড়া হয়ে দাঁড়ালে ও সামনে তাকালে তার যে অবস্থা সেটাকে বলা হয় দৈহিক অবস্থা (Anatomical Position)।

দেহতত্ত্বের বর্ণনা ও বোঝার সুবিধার জন্য কতকগুলো কাল্পনিক রেখা দ্বারা দেহকে ভাগ করা হয়ে থাকে।

মধ্যমা তল (Median Plane) ঃ মধ্যমা তল হলো একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে গেছে এবং মানবদেহকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে।

তীর্যক তল (Sagittal Plane) ঃ এটি একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা দেহের মধ্যমা তলের সমান্তরালভাবে অতিক্রম করেছে।

কিরীট তল (Coronal Plane) ঃ এটি একটি কাল্পনিক উল্লম্ব তল যা দেহের মধ্যমা তলের সমকোণে অতিক্রম করে দেহকে সামনে এবং পিছনে দুইটি অংশে বিভক্ত করেছে।

অনুভূমিক তল (Horizontal or Transverse Plane) ঃ এটি একটি কাল্পনিক তল যা দেহের মধ্যমা ও কিরীট তলকে সমকোণে অতিক্রম করে দেহকে উপর এবং নিচ দুইটি অংশে বিভক্ত করেছে।

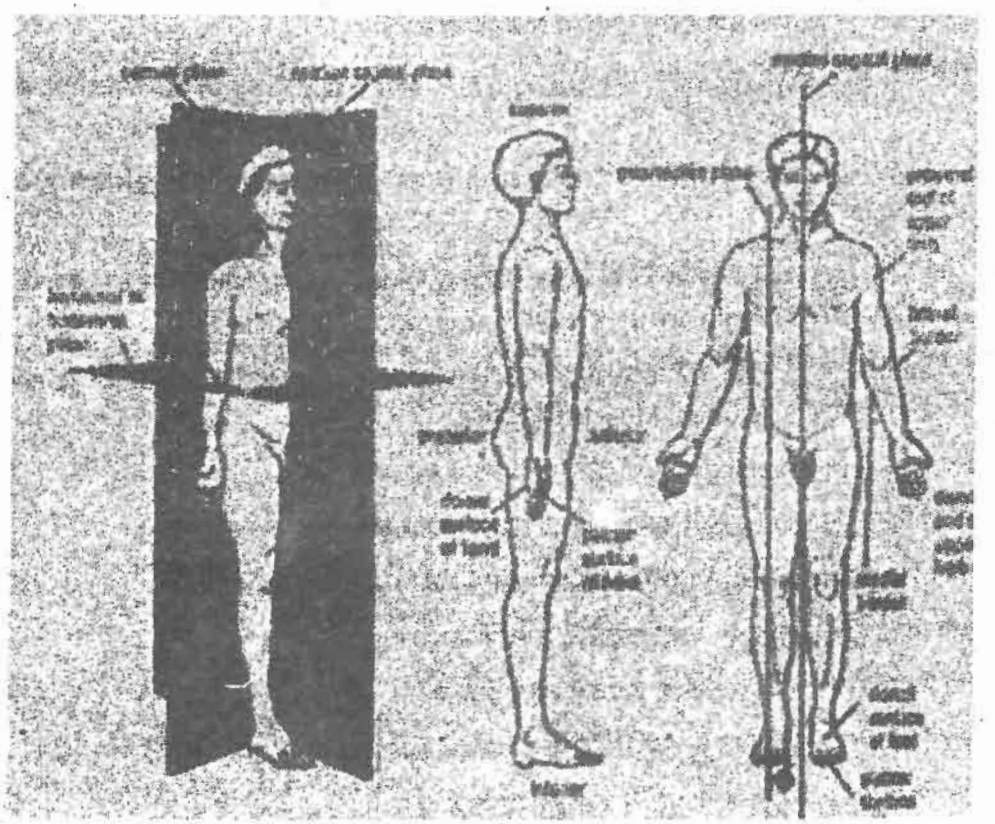

দৈহিক অবস্থা ও দেহের বিভিন্ন তল

মধ্যমাবর্তী (Medial) ঃ মধ্যমা তলের নিকটবর্তী অঙ্গাকে মধ্যমাবর্তী অঙ্গা বলে। যেমন– আলনা (Ulna) হাড়টি রেডিয়াস (Radius) হাড় থেকে মধ্যমাবর্তে (Medially) অবস্থিত।

পার্শ্ববর্তী (Lateral) ঃ মধ্যমা তলের দূরের অঙ্গাকে বলা হয় পার্শ্ববর্তী (Lateral)। যেমন– হাতের রেডিয়াস (Radius) হাড়টি আলনা (Ulna) থেকে পার্শ্ববর্তী (Laterally) অবস্থানে রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ (Internal) ঃ দেহের কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত যে কোন শিরা, নালী, অঙ্গা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গা (Internal Organ)। যেমন– পিত্ত থলি (Gall Bloder) আভ্যন্তরীন অঙ্গা।

বাহ্যিক (External) ঃ দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত অঙ্গাসমূহকে বাহ্যিক অঙ্গা (External Organ) বলে। যেমন– ত্বক (Skin) বাহ্যিক অঙ্গা।

উর্ধ্ববর্তী (Superficial) ঃ দেহের উপরিভাগ থেকে কল্পনা করলে যেটা উপরিভাগের কাছে অবস্থিত তাকে উর্ধ্ববর্তী অঙ্গা (Superficial Organ) বলা হয়। যেমন– বাহুর মাংশ পেশি হাড়ের উর্ধ্ববর্তে অবস্থিত।

গভীর (Deep) ঃ দেহের গভীরে বা ভেতরে অবস্থিত অঙ্গাসমূহকে গভীরের অঙ্গা (Deep Organ) বলা হয়। যেমন– বাহুর হাড় মাংশ পেশির গভীরে অবস্থিত।

সম্মুখবর্তী (Anterior) ঃ দেহের সামনের দিকের অঙ্গা, প্রত্যঙ্গা হলো সম্মুখবর্তী অঙ্গা (Anterior Organ)। যেমন– হাতের তালু (Palm) সম্মুখবর্তী।

পশ্চাৎবর্তী (Posterior) ঃ দেহের পিছনের দিকের অঙ্গা প্রত্যঙ্গা হলো পশ্চাৎবর্তী অঙ্গা (Posterior Organ)। যেমন– হাতের পিঠ (Dorsam) পশ্চাৎবর্তী।

উর্ধ্বে (Superior) ঃ দেহের মাথার নিকটবর্তী অঙ্গা হলো উর্ধ্বের অঙ্গা। যেমন– হৃদপিন্ড ব্যবচ্ছেদ পেশির (Diaphargm) উর্ধ্বে অবস্থিত।

নিচে (Inferior) ঃ দেহের পায়ের দিকের অঙ্গা হলো নিচের অঙ্গা। যেমন– ব্যবচ্ছেদ পেশি (Diaphargm) হৃদপিন্ডের নিচে অবস্থিত।

এক দিকে (Ipsilateral) ঃ দেহের একই পার্শে অবস্থিত অঙ্গা। যেমন– ডান হাত এবং ডান পা দেহের একই দিকে অবস্থিত।

বিপরীত দিকে (Contralateral) ঃ দেহের বিপরীত পার্শে অবস্থিত অঙ্গা। যেমন– ডান হাত এবং বাম হাত দেহের বিপরীত দিকে অবস্থিত।

যদি শরীরের তিনটি অঙ্গা পাশাপাশি বা সমান্তরালভাবে চলে বা এগিয়ে যায় তাহলে যেটি বাইরের দিকে সেটি হলো পার্শ্ববর্তী অঙ্গা (Lateral Organ), মাঝেরটি হলো অন্তস্ত অঙ্গা (Intermediate Organ) এবং ভেতরেরটি হলো মধ্যমাবর্তী অঙ্গা (Medial Organ) প্রভৃতি।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গার মৌলিক গঠন অনুযায়ী বর্ণনা

কোষ (Cell) হলো মানব দেহ গঠনের ও কাজের একটি একক (Unit)। একই উৎস থেকে উদ্ভূত, একই আকৃতির বা ভিন্ন আকৃতির কোষগুলো (Cells) যখন মিলিতভাবে কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে তখন সমষ্টিগত কোষকে একত্রে কলা (Tissue) বলা হয়। যেমন একটির পর একটি ইঁট দিয়ে এক একটি দালানের অংশ গঠিত হয় তেমনি একটির সঙ্গে অন্য অনেকগুলো কোষ (Cell) যোগ হয়ে তৈরি হয় একটি কলা (Tissue)। মানব দেহে প্রধানত চার ধরনের কলা (Tissue) থাকে। যেমন– আবরণী কলা, যোজক কলা, পেশি কলা ও স্নায়ু কলা।

দুই বা ততধিক ধরনের কলা একত্রিত হয়ে তৈরি হয় এক একটি অঙ্গ (Organ); যেমন হৃৎপিন্ড (Heart), ফুসফুস (Lung), বৃক্ক (Kidney) ইত্যাদি এবং কয়েকটি অঙ্গ একত্রিত হয়ে তৈরি হয় একটি তন্ত্র (Organ System)। মানবদেহকে প্রধানত ১১ টি তন্ত্রে বিভক্ত করা যায়। যেমন– কঙ্কাল তন্ত্র, পেশি তন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, হৃদপিন্ড ও রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকাতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র, অন্তঃক্ষরাতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও বহিরাবরণতন্ত্র।

কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal System) ঃ এই তন্ত্র অস্থি, তরুণাস্থি, সন্ধি প্রভৃতি সমন্বয়ে গঠিত।

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ ঃ দৈহিক কাঠামো গঠন, চলাচল, রক্ষণাবেক্ষণ, সঞ্চয়, লোহিত কণিকা উৎপাদন প্রভৃতি।

পেশিতন্ত্র (Muscular System) ঃ এই তন্ত্র অস্থির সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশি নিয়ে গঠিত।

পেশিকলার কাজ ঃ পেশি কলা মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের জন্য দায়ী। অস্থি সংলগ্ন পেশির সংকোচন – প্রসারণের ফলে মানুষ চলা ফেরা ও স্থানান্তরিত হতে পারে।

শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System) ঃ এই তন্ত্র হলো শ্বাস যন্ত্র বা Pharynx, শ্বাসনালী বা Trachea, শ্বাসঝিল্লির বা Bronchi এবং তার সঙ্গে যুক্ত ফুসফুসদ্বয় বা Lungs ও তার বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত।

শ্বসনতন্ত্রের কাজ ঃ বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্তে মিশ্রিত করা ও কার্বন–ডাই–অক্সাইড রক্ত থেকে বের করে দিয়ে রক্তকে বিশুদ্ধ করা।

হৃদপিন্ড ও রক্তসংবহনতন্ত্র (Cardio Vescular System) ঃ এর মধ্যে আছে হৃৎপিন্ড বা Heart, ধমনী বা Artery, শিরা বা Vain এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত সরু ও সূক্ষতম ধর্মনী ও শিরার নালিকাগুলো।

হৃদপিন্ড ও রক্তসংবহন তন্ত্রেরকাজ ঃ রক্তসঞ্চালন, অক্সিজেন পরিবহন, কার্বন–ডাই–অক্সাইড পরিবহন, খাদ্যসার পরিবহন, সঞ্চিত খাদ্য পরিবহন, হরমোন পরিবহন, দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি।

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System) ঃ লসিকা, লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা নালী নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়।

লসিকারকাজ ঃ প্রতিরক্ষা, প্রতিরোধ, প্রোটিন পরিবহন, তৈলাক্ত বা স্নেহ পদার্থ পরিবহন, পুষ্টি সাধন, শোষণ, দেহরসের পুনর্বন্টন প্রভৃতি।

পরিপাকতন্ত্র (Digestive System) ঃ মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র , যকৃত, অগ্নাশয়, পিত্তথলি প্রভৃতি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়।

পরিপাকতন্ত্রের কাজ ঃ খাদ্যগ্রহন, পরিপাক, শোষণ, বৈর্জ্য পদার্থ ত্যাগ প্রভৃতি এই তন্ত্রের কাজ।

রেচনতন্ত্র (Urinary System) : এক জোড়া বৃক্ক, এক জোড়া রেচন নালী বা ইউরেটার, একটি মূত্রথলি ও মূত্রনালী নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত।

রেচনতন্ত্রের কাজ ঃ রক্ত থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য অপসারণ করা, রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা, ভিটামিন ডি ও লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশ নেয়া, দেহে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদির পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ করা।

জননতন্ত্র (Reproductive System) ঃ পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত।

জননতন্ত্রের কাজ : মানুষের বংশবৃদ্ধি করা, পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেট শুক্রাণু, ডিম্বাণু সৃষ্টি ও নিষেকের মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করে সন্তান–সন্ততি উৎপন্ন করা।

অন্তঃক্ষরা তন্ত্র (Endocrine System) ঃ পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারা থাইরয়েড, এড্রেনাল প্রভৃতি গ্রন্থি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত হয়।

অন্তঃক্ষরা তন্ত্রের কাজ ঃ দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ, জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্য নিয়ন্ত্রণ, মাতৃদেহে দুগ্ধ ক্ষরণ ও নিয়ন্ত্রণ, বিপাক বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ এবং যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করা।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System) ঃ এই তন্ত্র হলো মস্তিষ্ক (Brain) ও তা থেকে ছড়িয়ে পড়া সুষুম্না কান্ড (Spinal Cord) এবং তার সংলগ্ন অসংখ্য স্নায়ু (Nerves) নিয়ে গঠিত।

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ ঃ অনুভূতি গ্রহণ, পরিবহন, সমন্বয় এবং স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করা।

বহিরাবরণ তন্ত্র (Integumental System) ঃ ত্বক, চুল, নখ, ঘর্ম গ্রন্থি এবং তৈল গ্রন্থি নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত।

বহিরাবরণ তন্ত্রের কাজ ঃ দেহের প্রতিরক্ষা, তাপ নিয়ন্ত্রণ, জলীয় পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

বিশেষ অনুভূতির অঙ্গসমূহ ঃ

মানুষের বিশেষ বিশেষ অনুভূতি ও কাজের জন্য যে সব অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় তাকে বিশেষ অনুভূতির অঙ্গ (Special Sense Organs) বলা হয়। সেগুলি হলো ঃ

১। জিহ্বা বা Tongue যার দ্বারা আমরা স্বাদ গ্রহণ করি।

২। চক্ষু গোলক বা Eye ball যার দ্বারা আমরা দর্শন করি।

৩। নাক বা Nose যার দ্বারা আমরা ঘ্রাণ উপভোগ করি।

৪। কান বা Ear যার দ্বারা আমরা শব্দ শ্রবণ করি।

৫। চর্ম বা Skin যার দ্বারা আমরা স্পর্শ অনুভব করি।

দেহের নানা তরল পদার্থ

মানব দেহের বিভিন্ন স্থানে নানা ভাবে প্রচুর তরল পদার্থ (Body Fluids) রয়েছে। এই সব তরল পদার্থের অভাব হলে পানি দ্বারা পূর্ণ হয়। তরল পদার্থের অভাব প্রকট হলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যেমন: কলেরা বা ডাইরিয়া হলে অথবা অতিরিক্ত রক্তপাত হলে মানুষের শরীরে তরল পদার্থের অভাব প্রকট হয়ে পরে। সেই জন্য ঐ সময়ে পানি, চিনি ও লবনের মিশ্রণ (Saline) রক্তে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়। মানব দেহের বিভিন্ন তরল পদার্থের (Fluids) বর্ণনা নিচে দেয়া হলো:

আন্তঃকোষ তরল পদার্থ বা Intracellular Fluids ঃ মানব দেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যস্থিত তরল পদার্থকে আন্তঃকোষ তরল পদার্থ (Intracellular Fluids) বলা হয়। আন্তঃকোষ তরল পদার্থ শরীরের মোট ওজনের ৪০%।

বহিঃকোষ তরল পদার্থ বা Extracellular Fluids ঃ দেহের বিভিন্ন কোষের বাইরের তরল পদার্থ। শরীরের মোট তরল পদার্থের শতকরা ২০% ভাগ হলো এই গুলো। এই গুলো হলো সেই মাধ্যম বা Midium, যার মধ্যে কোষ বা Cell গুলো বেঁচে থাকে এবং এদের মাধ্যমে খাদ্য, পুষ্টি, লবণ, অক্সিজেন পেয়ে থাকে। বহিঃকোষ তরল পদার্থ আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন– ক) কোষসমূহের মধ্যবর্তী তরল পদার্থ (Interstitial Fluids), খ) রক্তের তরল পদার্থ (Blood Plasma)। এ ছাড়াও বিশেষ ধরনের বহিঃকোষ তরল পদার্থ আছে তাদের ট্রান্সসেলুলার তরল পদার্থ (Transcellular Fluid) বলা হয়। যেমন ঃ–

ক) সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal Fluid),
খ) সাইনোভিয়াল ফ্লুইড (Synovial Fluid),
গ) পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড (Peritonial Fluid),
ঘ) পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড (Pericardial Fluid),
ঙ) ইন্ট্রাঅকুলার ফ্লুইড (Intraocular Fluid) প্রভৃতি।

রক্তের তরল পদার্থ বা Blood Plasma ঃ এ গুলোর পরিমাণ হলো শরীরের মোট ওজনের প্রায় শতকরা ৫% বা প্রায় ৩ লিটার এবং এগুলো পরিবহনের কাজ করে। বহিঃকোষ তরল পদার্থের সঙ্গে রক্তের তরল পদার্থের যে মিলন বা আদান–প্রদান চলে তা প্রত্যক্ষভাবে হয় না। প্লাজমার রক্তে তরল পদার্থের চাপ বা 'Hydrostatic Pressure' থাকে বেশি। তাই প্রস্বেদন প্রক্রিয়া (Osmotic) দ্বারা এই আদান–প্রদান (Fluid Exchange) হয়ে থাকে। প্লাজমাতে প্রোটিন আছে, যা বহিঃকোষ তরল পদার্থের মধ্যে নেই।

সারা দেহের বিভিন্ন অংশের পরিচয়

ভালোভাবে এনাটমি শেখার জন্য মানবদেহকে ৫টি এলাকায় (Region) ভাগ করা হয়। তা হলো:

১) মাথা এবং গলা বা Head & Neck,
২) বুক বা Chest or Thorax,
৩) পেট বা Abdomen,
৪) হাত বা Superior Extremity এবং
৫) পা বা Inferior Extremity

মাথার দুইটি ভাগ। তা হলো– ক) মস্তিষ্ক বা Cranium এবং খ) মুখ বা Face। তাছাড়া হাত ও পা নানাভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে যেমন–

হাতের ভাগ: ক) উর্ধ্ব বাহু বা Arm, খ) সম্মুখ বাহু বা Forearm, গ) কব্জি বা Wrist, ঘ) করতল বা Palm এবং ঙ) হাতের আঙুল বা Finger।

পায়ের ভাগ: ক) উরু বা Thigh, খ) পা বা Leg, গ) পদতল বা Foot এবং ঘ) পায়ের আঙুল বা Toe।

ডায়াফ্রাম বা ব্যবচ্ছেদ পেশি: এটি হলো একটি পেশি, এই পেশি উপরের দিকে বেঁকে আছে এবং বুক ও পেঠকে ঠিক দুইটি ভাগে ভাগ করেছে। এর উপরে আছে বুক এবং এর নিচে আছে পেট।

বুকে বা Thorax এ প্রধান যে সব অঙ্গসমূহ থাকে তাহলো:

১) হৃদপিন্ড বা Heart,
২) দুইটি ফুসফুস বা Lungs,
৩) শ্বাসনালী বা Trachea ও বায়ুনালী বা Bronchi,
৪) অন্ননালী বা Oesophagus

হৃদপিন্ড বা Heart থাকার কারণে ফুসফুস দুইটি বা Lungs এর মাঝে যে গর্ত হয় তার নাম বক্ষ গহবর বা Mediastenum। এ ছাড়া সব শিরা ও ধমনীর উৎস মুখে এই বক্ষ গহ্বর অবস্থিত।

পেটের ভাগ : পেটের প্রধান দুইটি অংশ হলো: ক) উপরের পেট ও খ) তলপেট। এর অবস্থান হলো ব্যবচ্ছেদ পেশি বা Diaphragm এর নিচে।

পেটের উপরের অংশে আছে: ১) পাকস্থলী বা Stomach, ২) পরিপাকের যন্ত্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র বা Intestines, ৩) যকৃৎ বা Liver, ৪) প্লীহা বা Spleen, ৫) পিত্তকোষ বা Gall Bladder, ৬) অগ্নাশয় বা Pancreas, ৭) বৃক্ক বা Kidney এবং ৮) মহাধমনী বা Aorta ও মহাশিরা বা Inferior Vena Cava এখানে থাকে।

নিচের অংশ বা বস্তিকোটরে (Pelvic Cavity) যে অঙ্গসমূহ রয়েছে, তা হলো:

১) মূত্রথলি বা Urinary Bladder,
২) জনন অঙ্গসমূহ বা Reproductive Organs এবং
৩) বৃহৎ অন্ত্রের অংশ বা Colon & Rectum।

এটি হলো পেটের মোটামুটি ভাগ। তা ছাড়া এনাটমির বর্ণনার জন্য পেটকে চারটি কাল্পনিক লাইন দিয়ে মোট নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়, তা হলো–

১) ডান উল্লম্ব তল (Right Vertical Plane)- এই তলটি ডান স্তনবৃন্তের সোজাসুজি নিচে নেমে আসে।

২) বাম উল্লম্ব তল (Left Vertical Plane)- এই তলটি বাম স্তনবৃন্তের সোজাসুজি নিচে নেমে আসে।

৩) পাইলোরাসের মধ্যতল (Transpyloric Plane)– এটি সামনের পাঁজরার বরাবর আড়াআড়ি তল।
৪) টিউবারকুলের অন্তর্বর্তী তল (Inter Tubercular Plane)– বস্তির দুইটি প্রধান হাড় (Pelvic Bone) এর পয়েন্ট বা Anterior Superior Iliac Spine– এর সংযোগ লাইন।

এর ফলে পেট যে নয়টি ভাগে বিভক্ত হলো, তা হচ্ছে–

ক) উপরের তিনটি ভাগ–
১) ডান হাইপোকোনড্রিয়াক (Right Hypochondriac),
২) ইপিগ্যাসট্রিক (Epigastriac) ও
৩) বাম হাইপোকোনড্রিয়াক (Left Hypochondriac)।

খ) মাঝের তিনটি ভাগ–
৪) ডান লাম্বার (Right Lumber),
৫) আম্বিলিক্যাল (Umbilical) ও
৬) বাম লাম্বার (Left Lumber)।

গ) নিচের তিনটি ভাগ–
৭) ডান ইলিয়াক (Right Iliac),
৮) হাইপোগ্যাস্ট্রিক (Hypogastric) ও
৯) বাম ইলিয়াক (Left Iliac)।

এই ভাগ অনুযায়ী পেটের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের অবস্থান ও রোগের লক্ষণ বুঝতে সুবিধা হয়। কোন্ কোন্ অঙ্গ কোথায় অবস্থান করে, তা এ থেকে সহজে বোঝা যায়।

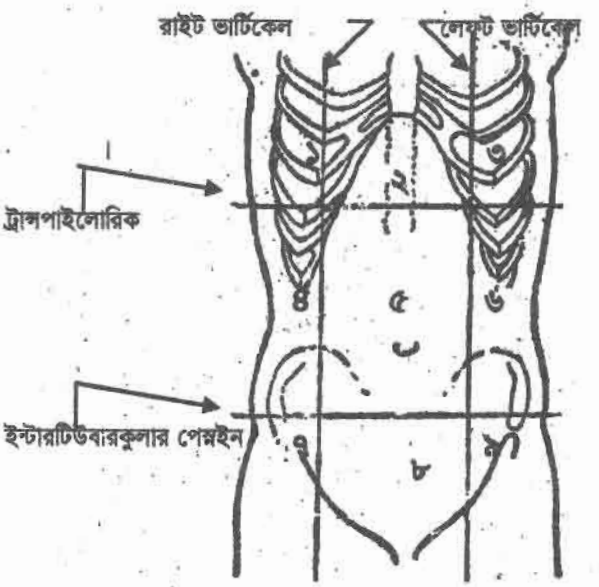

পেটের নয়টি ভাগ

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। দেহতত্ত্ব কাকে বলে?

২। শরীরতত্ত্ব কাকে বলে?

৩। দেহতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। মানবদেহের অঙ্গাসমূহের কার্যপ্রণালি সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচিত হয়?

৫। স্নায়ুরোগ বিদ্যা কাকে বলে?

৬। দৈহিক অবস্থা বলতে কি বোঝ?

৭। মানব দেহকে কয়টি তলে বিভক্ত করা যায়? তলগুলো কি কি?

৮। তীর্যক তল কাকে বলে?

৯। সম্মুখবর্তী বলতে কি বোঝ?

১১। অঙ্গ বলতে কি বোঝ?

১২। বিশেষ অনুভূতির অঙ্গ কয়টি? কি কি?

১৩। আন্তঃকোষ তরল পদার্থ কাকে বলে?

১৪। আন্তঃকোষ তরল পদার্থ ও বহিঃকোষ তরল পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কি?

১৫। ভালোভাবে দেহতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য মানব দেহকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়? ভাগগুলো কি কি?

১৬। ডায়াফ্রাম কাকে বলে?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানবদেহের তলগুলোর বর্ণনা দাও।

২। তন্ত্র কাকে বলে? মানব দেহের বিভিন্ন তন্ত্রগুলোর বর্ণনা দাও।

৩। মানব দেহের বিভিন্ন তরল পদার্থের বর্ণনা দাও।

৪। পেটকে প্রধানত কয়টি অংশে ভাগ করা হয়? কোন কোন অংশে কি কি অঙ্গ থাকে?

৫। পেটের ৯টি ভাগ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোষের গঠন, উপাদান ও কাজ

কোষ ও কোষের গঠন

মানুষসহ সকল জীবের দেহের গঠন ও কাজের একক (Unit) হলো কোষ (Cell)। মানবদেহ প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন বা ততোধিক কোষ নিয়ে গঠিত।

কোষের আকার, আকৃতি ও সংখ্যা

আকার (Size) : কোষের আকার বিভিন্ন মাপের হতে পারে। সাধারণত ৫ মাইক্রোমিটার (5 lm) থেকে ৫০ মাইক্রোমিটার (50 lm) পর্যন্ত হয়।

আকৃতি (Shape) : কোষের আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– লম্বা, চ্যাপ্টা, মাকু, পিরামিড, ফ্লাস্ক প্রভৃতি আকৃতির হতে পারে।

সংখ্যা (Number) : মানবদেহ ২০০ শত অপেক্ষা বেশি বিভিন্ন ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

কোষ (Cell) এর গঠন

অতি সামান্য একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ (Chemical) বা প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) ও তার মাঝে একটি প্রাণ কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস (Nucleas) একটি কোষ আবরণী (Cell Membrane) দ্বারা বেষ্টিত হয়ে একটি কোষ (Cell) গঠিত হয়। তা ছাড়া আরও নানা পদার্থ থাকে এর মধ্যে। নিউক্লিয়াস (Nucleus) বাদে কোষের (Cell) বাকি প্রোটোপ্লাজমের নাম সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)। সাইটোপ্লাজমের ভেতর যে সমস্ত সজীব বস্তু থাকে তাকে কোষের অঙ্গাণু বলা হয়। অঙ্গাণুগুলো হলো– মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, গলজি বস্তু, লাইসোজোম, রাইবোজোম, সেন্ট্রিওল প্রভৃতি।

১) কোষ আবরণী (Cell Membrane) : কোষের প্রোটোপ্লাজম বাইরের দিক হতে যে সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক, ভেদ্য, লাইপো–প্রোটিন দিয়ে গঠিত ত্রিস্তরীয় আবরণে আবৃত থাকে তাকে কোষ আবরণী বলে। এটি কোষকে সর্বদা ঘিরে রাখে। এর মধ্য দিয়ে কোনো কোনো বস্তু কিন্দু কিন্দু করে প্রবেশ করতে ও বেরিয়ে যেতে পারে, তবে সব বস্তু প্রবেশ করতে বা বেড়িয়ে যেতে পারে না। এই আবরণের পুরুত্ব ৭.৫ থেকে ১০ ন্যানোমিটার (7.5 to 10 nm) এবং শুধুমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায়।

কোষ আবরণীর কাজ :

* কোষ অভ্যন্তরের বস্তুসমূহকে রক্ষা করা ও আবৃত রাখা এর প্রধান কাজ।
* বিভিন্ন কোষাঙ্গাণু যেমন– মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, নিউক্লিয়ার পর্দা প্রভৃতি তৈরিতে সহায়তা করা।
* কোষের সঠিক আকৃতি প্রদান করা।
* অভিস্রবণ বা ব্যাপনের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুকে কোষের অভ্যন্তরে নেয়া ও কোষ থেকে বের করা।
* ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) ও পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis) পদ্ধতিতে কোষের বাইরের বস্তুকে ভক্ষণ করা।

২) প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) : কোষ প্রাচীর দ্বারা আবৃত কোষ মধ্যস্থ, অর্ধ স্বচ্ছ, দানাদার, বর্ণহীন জেলীর মতো সজিব বস্তুই প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজমের দুইটি অংশ : সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) এবং নিউক্লিয়াস (Nucleus)।

ক) সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) : কোষ প্রাচীর থেকে নিউক্লিয়ার পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত জেলীর মতো অর্ধতরল, অস্বচ্ছ, দানাদার প্রোটোপ্লাজমীয় অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে।

ইলেকট্রন অনুবিক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট একটি মানব কোষের বর্ণিত

সাইটোপ্লাজমের কাজ ঃ

* কোষের অঙ্গাণু ও অন্তস্থ বস্তুকে ধারণ করা।
* কোষের বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করা।
* কোষের অঙ্গাণুগুলোকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ এবং খাদ্যের সারাংশ, এনজাইম, হরমোন প্রভৃতিকে কোষের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করা।
* কোষ বিভাজন ও কোষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

খ) প্রাণ কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস (Nucleus) ঃ নিউক্লিয়াস হলো কোষের (Cell) প্রাণ কেন্দ্র। প্রোটোপ্লাজমের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সর্বাপেক্ষা বড়, ঘন ও গোলাকার বা ডিম্বাকার অংশটি হলো নিউক্লিয়াস। এর আকার ও আকৃতি কোষ ভেদে বিভিন্ন হয়, সাধারণত ৫ থেকে ১০ মাইক্রোমিটার–এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। একটি আদর্শ কোষে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। তবে কোন কোন কোষে ২ থেকে ১০টি নিউক্লিয়াস থাকতে পারে। কোষ বিভাজনের সময় একটি নিউক্লিয়াসে ৪টি অংশ দেখা যায়। যথা–

র) নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (Nuclear Membrane) ঃ নিউক্লিয়াস যে স্বচ্ছ অর্ধভেদ্য এবং অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত নরম পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে তাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলে। এটা লাইপো–প্রোটিন দ্বারা গঠিত হয়।

নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের কাজ ঃ

* নিউক্লিয়াসের আকৃতি প্রদান করা।
* নিউক্লিয়াসের রক্ষণাবেক্ষণ করা।
* এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তৈরি করা।
* বিভিন্ন বস্তুর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা।

ii) নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm) ঃ নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্বচ্ছ, দানাদার, সমসত্ত্ব তরল পদার্থ হলো নিউক্লিওপ্লাজম। এর রাসায়নিক গঠন জটিল। এর মধ্যে নিউক্লিওপ্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, এনজাইম ও খনিজ লবন ইত্যাদি থাকে।

নিউক্লিওপ্লাজমের কাজ ঃ

* নিউক্লিয়াসে জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করা।
* ডিএনএ (DNA), আরএনএ (RNA) ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ তৈরি করা।

iii) নিউক্লিওলাস (Nucleolus) : নিউক্লিয়াসের সর্বাপেক্ষা ঘন ও গোলাকার বস্তুটি হলো নিউক্লিওলাস। এটা DNA, RNA, প্রোটিন ও লিপিড দ্বারা গঠিত হয়। এতে অনেক এনজাইম আছে।

নিউক্লিওলাসের কাজ :

* কোষ বিভাজনে অংশগ্রহন করা।
* আরএনএ (RNA), রাইবোজোম ও প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করা।

iv) ক্রোমাটিন তন্তু (Cromatin Network) ঃ নিউক্লিওপ্লাজমের অভ্যন্তরে সুতার মত পদার্থ হলো ক্রোমাটিন তন্তু। এর এক একটি অংশকে বলা হয় ক্রমোজোমস (Cromosomes)। এগুলো হলো কোষের সমস্ত কর্ম ক্ষমতার মূল উপাদান।

ক্রোমাটিন তন্তুর কাজ ঃ

* ক্রমোজোমস্ এ DNA ধারণ করা।
* কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করা।
* বংশগতি ধারণ ও বহন করা।
* প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করা।

নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ

৩) **মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria)** : মাইটোকনড্রিয়া হলো অতি ক্ষুদ্র লম্বা লম্বা পদার্থ যা কোষের সাইটোপ্লাজমে সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে থাকে এবং কোষ বিভাজনের (Cell Division) সময় স্পিন্ডল্ (Spindle) –এর কাছাকাছি থাকে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ মাইক্রোমিটার, প্রস্থ ০.৫ মাইক্রোমিটার, পুরুত্ব ০.২ থেকে ২ মাইক্রোমিটার। প্রতি কোষে এর সংখ্যা ২০০ থেকে ৩০০টি। মাইটোকন্ডিয়া একটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। ঝিল্লিটি প্রোটিন ও লিপিড দ্বারা গঠিত। বাইরের স্তরটি মসৃণ কিন্তু ভেতরের স্তরটি অনিয়মিতভাবে ভাঁজ হয়ে থাকে। এই ভাঁজ হওয়া অংশকে ক্রিস্টি (Cristae) বলে। ক্রিস্টির গায়ে বহু সবৃন্তক গোলাকার বস্তু থাকে, এদের অক্সিজম (Oxyzome) বলে। শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন এনজাইম অক্সিজমে সুবিন্যস্ত থাকে।

মাইটোকনড্রিয়ার কাজ ঃ

* শ্বসনের বিভিন্ন বিক্রিয়া মাইটোকন্ডিয়াতে সংঘটিত হয়ে থাকে। কোষের বিভিন্ন প্রকার জৈবিক কাজে শক্তি সরবরাহ করে বলে মাইটোকন্ডিয়াকে কোষের শক্তিকেন্দ্র (Power House) বলে।
* কিছু ডিএনএ (DNA) ও আরএনএ (RNA) উৎপন্ন করে।
* স্নেহ বিপাকে অংশগ্রহণ করে।
* প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

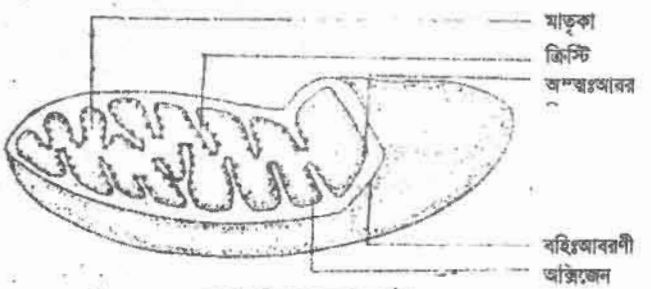

মাইটোকন্ড্রিয়ার রাসায়নিক গঠন

৪) **গলজি বস্তু (Golgi Complex)** ঃ কোষের নিউক্লিয়াসের (Nucleus) কাছে মসৃণ জালিকাযুক্ত বিশেষ ধরনের অঙ্গাণু হলো গলজি বস্তু। ক্ষরণ কাজে নিয়োজিত কোষে এই অঙ্গাণুগুলো বেশি পরিমাণে থাকে। ইলেক্ট্রোন মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রে এদের তিন ধরনের গঠন দেখা যায় ঃ

ক) সিস্টারনি (Cisternae) ঃ এইগুলো সমান্তরালে অবস্থিত লম্বা, চ্যাপ্টা, অসমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট।
খ) ভেসিকল (Vesicle) ঃ এইগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও গোলাকার, সিস্টারনির নিম্নদেশে থাকে।
গ) ভ্যাকুওল (Vacuole) ঃ এইগুলো গোলাকার থলির মত, সিস্টারনির কাছে থাকে।

গলজি বস্তুর কাজ ঃ

* কোষে নিঃসরিত পদার্থ পরিবহণ করা।
* বহুবিধ খাদ্যবস্তুর সঞ্চয় ভান্ডার হিসেবে কাজ করা।
* বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করা।

৫) এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা (Endoplasomic Reticulum) : নিউক্লিও পর্দা থেকে শুরু করে সাইটোপ্লাজম পর্যন্ত বিস্তৃত জালীকা আকারে বিন্যস্ত কোষ অঙ্গাণুগুলোকে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা বলে। এদের গায়ে রাইবোজোম থাকলে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা এবং রাইবোজোম না থাকলে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা বলা হয়।

এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার কাজ ঃ

* কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা।
* কোষের অভ্যন্তরে এনজাইমের সুষ্ঠু বন্টন করা।
* অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার কাজ প্রোটিন তৈরি ও সংরক্ষণ করা।
* মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার কাজ লিপিড বিপাক ও হরমোন তৈরি করা।

৬) লাইসোজোম (Lysosome) ঃ সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত সূক্ষ্ম আবরণ বেষ্টিত কোষের পরিপাককারী ক্ষুদ্র অঙ্গাণু হলো লাইসোজোম। এরা সাধারণত গোলাকার হয়।

লাইসোজোমের কাজ ঃ

* জীব দেহের অকেজো অংশকে ধ্বংস করা।
* খাদ্যকণা কোষে প্রবেশ করলে লাইসোজোমের এনজাইম তাকে পরিপাক করে।
* ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় শ্বেত কণিকাকে সহায়তা করা।

৭) রাইবোজোম (Ribosome) ঃ কোষের সাইটোপ্লাজোমে ও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের বাইরের দিকে অবস্থিত রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো প্রোটিন সংশ্লেষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তারা হলো রাইবোজোম।

রাইবোজোমের কাজ ঃ

- প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করা।
- স্নেহ জাতীয় পদার্থ গঠন ও বিপাকে সহায়তা করা।
- ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় শ্বেত কণিকাকে সহায়তা করা।

কোষের উপাদান ও কাজ

কোষ (Cell) -এর উপাদানসমূহ

কোষে অবস্থিত বস্তুগুলো রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যে সমস্ত বস্তু পাওয়া যায় তা হলো ঃ

১) প্রোটিন জাতীয় পদার্থ যার রাসায়নিক গঠন খুবই জটিল ধরনের।
২) চর্বি বা স্নেহ (Fat) জাতীয় পদার্থ।
৩) শর্করা (Carbohydrate) জাতীয় পদার্থ।
৪) লবণ (Inorganic Salt) জাতীয় পদার্থ। এর মধ্যে প্রধান হলো সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম এর ফসফেট ও ক্লোরাইড।
৫) পানি বা (H_2O)।

কোষের বিভিন্ন ক্রিয়াচক্র

১) **খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ এবং হজম করা** (Ingestion and Assimilation) – অন্তর্স্থিত তরল পদার্থ এবং আন্তঃকোষ তরল পদার্থ (Interstitial Fluid and Intracellular Fluid) এই দুটির মধ্যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া (Osmosis) দ্বারা যে আদান প্রদান হয়, এর মাধ্যমে কোষ তার প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acid), লবণ (Salt) প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করে ও পরিত্যাজ্য অংশ ত্যাগ করে। এর ফলে কোষের পুষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি হয়ে থাকে।

২) **বৃদ্ধি, মেরামত বা ক্ষয়পূরণ** (Growth and Repair) – প্রতিটি কোষের মধ্যে নতুন প্রোটোপরাজম জন্ম নেয় ও তার পুষ্টি ঘটে। তাছাড়া গঠনমূলক কাজ (Anabolism) দ্বারা কোষের ক্ষয়পূরণ বা মেরামতের কাজ হয়ে থাকে।

৩) **বিপাক প্রক্রিয়া** (Metabolism) – প্রতিটি কোষের কাজ করার জন্য চাই শক্তি (Energy)। খাদ্যের কণাগুলো প্রথমত ভেঙে যায়, এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভঙ্গ প্রক্রিয়া (Catabolism)। তারপর খাদ্য কণাগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠনমূলক কাজ করে ও তাপ সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় (Anabolism)। এই দুইটি প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে বলা হয় বিপাক প্রক্রিয়া (Metabolism)।

৪) **বায়ু পরিবর্তন** (Respiration) – ফুসফুস যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তা মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ে রক্তের মাধ্যমে। এমনকি প্রতিটি কোষ পর্যন্ত তা পৌঁছে যায় এবং কোষগুলো অক্সিজেন গ্রহন করে। আবার কোষ থেকে নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা CO_2 শিরা দ্বারা বাহিত হয়ে যায় হৃদপিন্ডে। তারপর তা ফুসফুস থেকে প্রশ্বাসের সঙ্গে বেড়িয়ে যায়।

৫) **দূষিত পদার্থ ত্যাগ** (Excretion) – শরীরের ত্যাজ্য বা বিষাক্ত পদার্থ কোষগুলো থেকে বেরিয়ে রক্তে মিশে যায়। তারপর তারা নানা পথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহের ত্যাজ্য পদার্থ যে সমস্ত পথে দেহ থেকে বের হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক) কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হয় ফুসফুস থেকে নাকের ছিদ্র পথে।
খ) কতকগুলো তরল পদার্থ বের হয় বৃক্ক বা Kidney দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে। বৃক্ক মানবদেহের ছাকনির কাজ করে থাকে।
গ) কতগুলো ত্যাজ্য পদার্থ বের হয় মলাশয় বা Colon দিয়ে পায়খানার সঙ্গে আবর্জনা রূপে।

৬) উত্তেজনা ও সঞ্চালন (Irritability and Conductivity) – প্রতিটি কোষ হলো কর্মক্ষম। যে কোনো রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়াজনিত–তাপ, চাপ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, আঘাত প্রভৃতিতে কোষগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠে। আবার কখনও কখনও এটি সংকুচিত হয় যেমন মাংশ পেশীর তন্তু বা Muscle Fibre। আবার কখনও বা বার্তা বয়ে নিয়ে যায় বা সঞ্চালন করে। যেমন : স্নায়ুতন্তু বা Nerve Fibre।

৭) প্রজনন (Reproduction) – একটি কোষ ভেঙে দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে। এর মূল হলো সেন্ট্রোসাম (Centrosome) এর কাজ। সেন্ট্রোসাম দুভাগে ভাগ হয় ও সেই সঙ্গে নিউক্লিয়াসের (Nucleus) এর চেহারার পরিবর্তন ঘটে। তারপর দুটি কোষের মধ্যে একটি স্তর (Layer) পড়ে ও দুটি নিউক্লিয়াসে দুইটি কন্ট্রোসাম দেখা যায়।

একটি প্রাণকেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে ক্রোমজমের সংখ্যা হলো মোট ৪৬টি। যখন কোষ বিভাজন হয় তখন দেখা যায় প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ৪৬টি করেই ক্রোমজম আছে। তা থেকে এটা বুঝতে পারা যায় যে, প্রতিটি ক্রোমজম দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এ ভাবে কোষ বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা Mitosis। তবে সব সময় কোষ এ ভাবে বিভক্ত হয় না। দেহের জরুরি প্রয়োজনে এই ভাবে বিভক্ত হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আর এক ধরনের কোষ বিভাজন হলো পরোক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা Meosis। এটি সাধারণত জনন যন্ত্রেই হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় একটি কোষ বহু ভাগে বিভক্ত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারাই মাতৃগর্ভে ভ্রুণ ও সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কোষ কাকে বলে?

২। কোষের অঙ্গাণুগুলোর নাম উল্লেখ কর।

৩। সাইটোপ্লাজম বলতে কী বোঝ?

৪। এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা কত প্রকার ও কি কি?

৫। মাইটোকন্ড্রিয়া বলতে কি বোঝ?

৬। লাইসোজোমের কাজ কী?

৭। কোষের কোন অঙ্গাণুকে শক্তিকেন্দ্র বলা হয়?

৮। ক্রোমজোমের কাজ কী?

৯। একটি কোষে কয়টি নিউক্লিয়াস থাকে?

১০। কোষের রাসায়নিক উপাদানগুলোর নাম উল্লেখ কর।

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। একটি মানব কোষের চিত্র এঁকে চিহ্নিত কর।

২। কোষ আবরণীর গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

৩। নিউক্লিয়াসের কয়টি অংশ? চিত্রসহ বর্ণনা কর।

৪। মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

৫। কোষের কাজ বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়
কলার গঠন ও কাজ

কলা, কলার গঠন ও কাজ

একই উৎস থেকে উদ্ভূত, একই আকৃতির বা ভিন্ন আকৃতির কোষগুলো (Cells) যখন মিলিতভাবে কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে তখন সমষ্টিগত কোষকে একত্রে কলা (Tissue) বলা হয়। মানব দেহে প্রধানত চার ধরনের কলা (Tissue) থাকে। যেমন:

১। আবরণী কলা (Epithelial Tissue)
২। যোজক কলা (Connective Tissue)
৩। পেশি কলা (Muscular Tissue)
৪। স্নায়ু কলা (Nervous Tissue)

আবরণী কলা (Epithelial Tissue)

এই জাতীয় কলা উপরের আবরণের (Cover) কাজ করে। দেহের চর্ম, শিরা ও ধমনী প্রভৃতির উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগ প্রভৃতি নানা অংশে এই ধরনের কলা বর্তমান। এক ধরনের আবরণ দ্বারা এই কলার কোষগুলো আটকে থাকে তাকে ভিত্তি পর্দা বা Basement Membrane বলে। বিভিন্ন ধরনের আবরণী কলা সম্পর্কে নিচে বলা হল।

১। সাধারণ আবরণী কলা (Simple Epithelium) - এগুলো হলো একটি মাত্র কোষের স্তর (Layer) যার মধ্যে আবার তিন ধরনের প্রকারভেদ আছে।

ক) আঁইশাকার আবরণী কলা (Squamous Epithelium) ঃ এর কোষগুলো চ্যাপ্টা ও পাতলা হয় এবং একটির পাশে অন্যটি সাজানো থাকে। যেমন ঃ হৃদপিন্ডের প্রকোষ্ঠ বা Lining, ফুসফুসের বায়ুকক্ষ, রক্তবাহি নালীগুলোর ভেতরের আবরণ এইগুলো দ্বারা তৈরি।

খ) স্তম্ভাকার আবরণী কলা (Columnar Epithelium) ঃ এইগুলো লম্বা লম্বা হয় এবং একটি অন্যটির সাথে যুক্ত থাকে কিন্তু একই স্তরে পাশাপাশি অবস্থান করে। এরা সব গ্রন্থির (Gland) ভেতরের অংশে থাকে। যেমন ঃ পাকস্থলি (Stomach), বৃহদান্ত্র (Large intenstine) ও পিত্তথলি (Gall bladder)।

গ) লোমশ আবরণী কলা ঃ এগুগুলো লম্বা হয় এবং একটি অন্যটির সাথে যুক্ত থাকে কিন্তু একই স্তরে পাশাপাশি অবস্থান করে তবে উপরিভাগে সরু লম্বা লম্বা লোম (Cilia) থাকে যা নড়াচড়া করে। যেমন- বায়ুনালীর আবরণী কলা এই জাতীয় হয় এবং তার জন্য ধূলা, ধোয়া প্রভৃতি বায়ুনালী দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না অথবা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২। জটিল আবরণী কলা (Compound Epithelium) ঃ এইগুলোর মধ্যে একটির বেশি কোষের (Cells) স্তর (Layer) থাকে। চর্ম (Skin) এর উপরের অংশে এই ধরনের কলা (Tissue) থাকে।

৩। স্থানান্তরিত আবরণী কলা (Transitional Epithelium) ঃ এইগুলো হলো অনেক ধরনের কোষ (Cell) এর আস্তরণ। এদের উপরেরগুলো চ্যাপ্টা, মাঝের গুলো লম্বাটে ও নিচের স্তর বা Layer আরও লম্বাটে হয়। মূত্র থলি বা Urinary Bladder, বৃক্ক বা Kidney প্রভৃতিতে এই জাতীয় কলা থাকে।

আবরণী কলার (Epithelial Tissue) কাজ ঃ

- রক্ষা করা (Protection),
- নিঃসরণ করা (Secretion),
- শোষণ করা (Absorption),
- সংরক্ষণ করা (Storage),
- নড়াচড়া করা (Movement),
- পিচ্ছিল করা (Lubrication)।

গ্রন্থি বা Gland

গ্রন্থি বা Gland হলো নিঃসরণের যন্ত্র (Secretory Organ) যা দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। যেমন ঃ যকৃত (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas), পিত্তথলি (Gall Bladder), পাকস্থলী (Stomach) প্রভৃতি।

গ্রন্থিগুলো বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় নানা রস নিঃসরণ করে। এই সব বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থির আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন। গ্রন্থিগুলো প্রধানত ২টি ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

১। নালীযুক্ত গ্রন্থি (Gland with duct) ঃ এগুলো প্রত্যক্ষভাবে নালী দিয়ে নিঃসরণ পাঠিয়ে দেয়। যেমন :- লালা গ্রন্থি (Salivary Gland), যকৃত (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas) প্রভৃতি।

২। নালীবিহীন গ্রন্থি (Ductless Gland) ঃ এগুলোর কোন নালী নাই, এদের নিঃসরণ প্রত্যক্ষভাবে রক্তে মিশে বিরাট কাজ করে। যেমন ঃ পিটুইটারী (Pituitary), থাইরয়েড (Thyroid), এড্রিনাল (Adrenal) প্রভৃতি।

নিঃসরণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গ্রন্থিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

১। শ্লেষ্মা গ্রন্থি বা Mucous Gland ঃ এইগুলো শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে।
যেমনঃ- জিহ্বার নিচে সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual Gland)।

২। সিরাস গ্রন্থি বা Serous Gland ঃ এগুলো পাতলা জলীয় পদার্থ নিঃসরণ করে।
যেমন :- অগ্নাশয় (Pancreas), প্যারোটিড লালা গ্রন্থি (Parotid Salivary Gland)।

৩। মিশ্র গ্রন্থি বা MIxed Gland ঃ এরা শ্লেষ্মা ও পাতলা জলীয় পদার্থ উভয়ই নিঃসরণ করে।

আবার ক্ষরণ পদ্ধতি ও ক্ষরণ নির্গমন নালীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রন্থিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ১) বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) এবং ২) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland)।

১। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) - যে সব গ্রন্থি তাদের নিঃসৃত রাসায়নিক রস নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলের অদূরে বহন করে, সেগুলোকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। এদের নিঃসৃত পদার্থ রস বা জুস (Juice) নামে পরিচিত। যেমন :- লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি।

২। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland) - যে সব গ্রন্থি নালীবিহীন, তাদের ক্ষরণ সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়, সে সব গ্রন্থিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।
যেমন ঃ পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, এড্রেনাল প্রভৃতি গ্রন্থি।

পেশি কলা (Muscular Tissue) :

পেশি কলা সংকোচন-প্রসারণক্ষম ও অসংখ্য তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। পেশি কলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

১। এই কলার কোষগুলো লম্বা সূতার মত তাই এদের পেশি তন্তুও বলা হয়।
২। কোষগুলো সুস্পষ্ট নিউক্লিয়ার যুক্ত।
৩। প্রতিটি কোষ সারকোলেমা (Sarcolemma) নামক ঝিল্লিতে আবৃত এবং এর ভেতরের সাইটোপ্লাজোমকে সারকোপ্লাজোম বলে।
৪। সারকোপ্লাজোমের মধ্যে পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত অসংখ্য মায়োফাইব্রিল (Miofibril) নামক উপতন্তু থাকে।
৫। পেশি কলার প্রায় ৭৫ শতাংশ পানি ও অবশিষ্টাংশ কঠিন পদার্থে গঠিত।

পেশি কলার কাজ ঃ পেশি কলাই মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের জন্য দায়ী। অস্থি সংলগ্ন পেশির সংকোচন - প্রসারণের ফলে মানুষ চলাফেরা ও স্থানান্তরিত হতে পারে।

পেশি কলার প্রকারভেদ ঃ গঠন, অবস্থান ও কাজের উপর ভিত্তি করে পেশি কলাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১) ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary Muscle),
২) অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary Muscle),
৩) হৃদ পেশি (Heart Muscle)।

১। রৈখিক বা ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary or Striated Muscle) ঃ

রৈখিক বা ঐচ্ছিক পেশির গায়ে দাগ দাগ (Striate) এবং ভাগ ভাগ (Stripe) থাকে। এগুলো ইচ্ছার অধীনে কাজ করে। যেমন - হাতের পেশি, পায়ের পেশি।

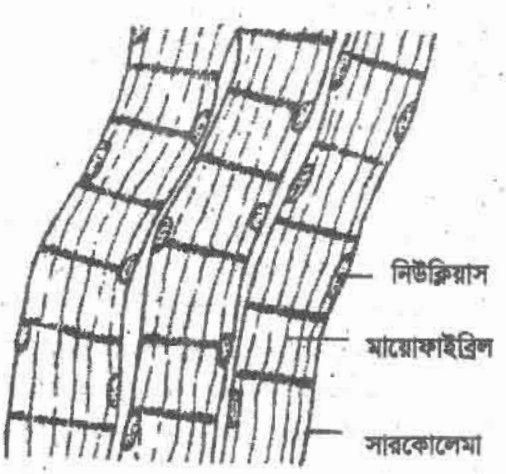

ঐচ্ছিক পেশি

অনৈচ্ছিক পেশি

২। মসৃণ বা অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary or Non-striated Muscle) ঃ
মসৃণ বা অনৈচ্ছিক পেশির কোন দাগ বা ভাগ নেই। এগুলো ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না। এগুলি আপন মনে কাজ করে। যেমন - পৌষ্টিক নালী, শ্বাস নালী, রক্ত নালী, মূত্র থলি, জরায়ু, প্রভৃতি অঙ্গের গায়ে এ পেশি পাওয়া যায়।

৩। হৃদ পেশি (Cardiac Muscle):

গঠনের দিক থেকে এরা অনেকটা রৈখিক পেশির মতো। এদের প্রকৃতি ও কাজ ভিন্ন ধরনের। হৃদ পেশির কার্যকারিতা ইচ্ছা নির্ভর নয়। এদের প্রতিটির সঙ্গে একটি শাখা দ্বারা যোগ থাকে। তার কারণ হলো, এদের কাজ কখনও বন্ধ হতে পারে না। যদি কয়েকটি পেশী অকর্মণ্য হয়, অন্য পেশিগুলো তাদের চালিত করে।

তাই কাজের দিক থেকে এরা অনৈচ্ছিক। এইসব পেশির কাজ এইসব পেশি দ্বারাই সম্পাদিত হবে অন্য কোনভাবেই সম্পন্ন করা যাবে না। একমাত্র হৃদপিন্ডের প্রাচীরেই এ ধরনের পেশি কলা পাওয়া যায়। এদের একটি গুণ আছে। তা হলো 'যথেষ্ট পরিমান উদ্দীপনা পেলে হৃদ পেশি তার সর্বচ্চ সাড়া দেয় কিন্তু উদ্দীপনা যথেষ্ট না হলে বিন্দু মাত্র সারা দেয় না'। একে বলে 'All or none' –law। শরীরের অন্য কোথাও এ ধরনের পেশি দেখা যায় না।

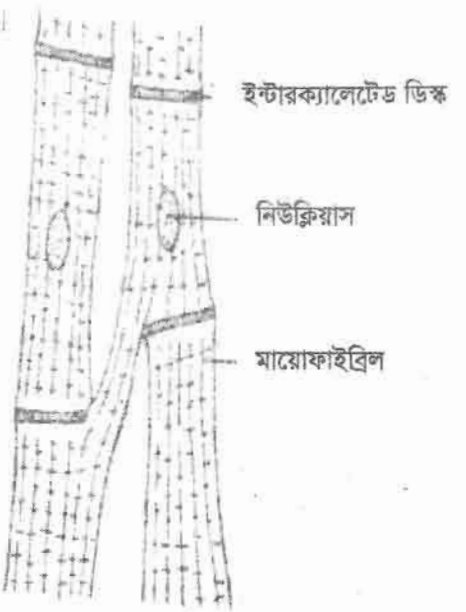

হৃদ পেশী

যোজক কলা (Connective Tissue) ঃ

যোজক কলা দেহের গাঠনিক, যান্ত্রিক ও প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি অন্যান্য কলার সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

যোজক কলার প্রকারভেদ : যোজক কলাকে প্রাথমিকভাবে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন:

১) প্রকৃত যোজক কলা (Proper Connective Tissue),
২) কঙ্কাল যোজক কলা (Skeletal Connective Tissue) ও
৩) তরল যোজক কলা (Fluid Connective Tissue)।

১। প্রকৃত যোজক কলা (Proper Connective Tissue) ঃ

প্রকৃত যোজক কলার কোষগুলো বিভিন্ন প্রকার তন্তু এবং স্বনিঃসৃত প্রচুর পরিমাণ ম্যাট্রিক্সে ছড়ানো থাকে। পানি, শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে এই কলা গঠিত।

প্রকৃত যোজক কলা চার প্রকার ঃ

ক) এরিওলার যোজক কলা (Areolar Tissue) ঃ এই কলার ম্যাট্রিক্স জেলীর মত থক থকে। এতে বিভিন্ন প্রকার কোষ ও তন্তু থাকে। কোষগুলোর মধ্যে ফাইব্রোব্লাস্ট, হিস্টিওসাইট, ম্যাক্রোফেজ কোষ, রঞ্জক কোষ, প্লাজমা কোষ ও মাস্ট কোষ উল্লেখযোগ্য। তন্তুগুলো দুই ধরনের; শ্বেত তন্তু ও পীত তন্তু।

অবস্থান ঃ দেহ ত্বকের নিচে, পেশিসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে, পাকস্থলী প্রভৃতি স্থানে এরিওলার কলা পরিলক্ষিত হয়।

এরিওলার যোজক কলার কাজ:

- ফাইব্রোব্লাষ্ট (Fibroblast) শ্বেত তন্তু উৎপাদনে সহায়তা করে এবং ক্ষতস্থান নিরাময়ে অংশগ্রহণ করে।
- রঞ্জক কোষ মেলানিন (Malanin) উৎপন্ন করে।
- মাষ্ট কোষ হেপারিন (Heparin) উৎপন্ন করে।
- হিস্টিওসাইট জীবাণু গ্রাস করে।
- প্লাজমা কোষ এন্টিবডি তৈরি করে।

খ) শ্বেত তন্তুময় যোজক কলা (White Fibrous Tissue) ঃ

এই কলার ম্যাট্রিক্সে শ্বেততন্তু নামে শ্বেত বর্ণের এবং শাখাবিহীন তন্তু ছড়ানো থাকে। এদের স্থিতিস্থাপকতা নেই। ফাইব্রোব্লাস্ট নামক কোষ থেকে এদের উৎপত্তি এবং কোলাজেন নামক প্রোটিনে এ কলা তৈরি হয়।

অবস্থান: দেহত্বকের নিচে এবং অন্ত্র প্রাচীরে একটি ধারাবাহিক স্তর রূপে অবস্থান করে।

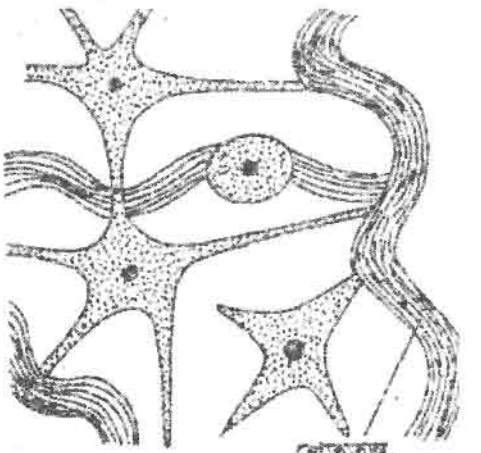
শ্বেততন্তু

শ্বেত তন্তুময় যোজক কলার কাজ

- দেহের অস্থির সাথে পেশিকে যুক্ত করে।
- অস্থি বন্ধনী তৈরিতে সাহায্য করে।
- চাপ ও টানের হাত থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে রক্ষা করে।

গ) পীত তন্তুময় যোজক কলা (Yellow Fibrous Tissue)

এই কলার ম্যাট্রিক্সে পীত বর্ণের ও শাখাযুক্ত কতকগুলি তন্তু ছড়ানো থাকে। এদের স্থিতিস্থাপকতা আছে, তাই এদের স্থিতিস্থাপক তন্তুও বলা যায়। এইগুলি ইলাস্টিন (elastin) নামক প্রোটিনে গঠিত।

অবস্থান : ফুসফুস, ধমনীর প্রাচীর, স্বর যন্ত্র ও সন্ধিবন্ধনীতে পাওয়া যায়।

পীত তন্তুময় যোজক কলার কাজ ঃ

- রক্ত নালীকে স্থিতিস্থাপক করে।
- ফুসফুসের সংকোচন ও প্রসারণে অংশগ্রহণ করে শ্বাস কাজে সহায়তা করে।

ঘ) মেদ কলা (Adipose Tissue)

এই কলার ম্যাট্রিক্সে অন্যান্য যোজক কলার তুলনায় কোষের সংখ্যা বেশি। এতে কিছু স্থিতিস্থাপক তন্তু দেখা যায়।

অবস্থান ঃ মেদ কলা ত্বকের নিচে, স্তন গ্রন্থিতে, হলুদ অস্থি মজ্জাতে ও বৃক্কের চারদিকে বেশি পাওয়া যায়।

মেদ কলার কাজ ঃ

- দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে রক্ষা করে।
- দেহের সুষম আকৃতিদানে সাহায্য করে।
- দেহে শক্তির সঞ্চিত ভান্ডার রূপে কাজ করে।

২। কঙ্কাল যোজক কলা (Skeletal Connective Tissue) ঃ

এই ধরনের যোজক কলা অর্ধকঠিন ও কঠিন দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন - তরুণাস্থি এবং অস্থি।

ক) তরুণাস্থি (Cartilage) ঃ

এই কলার ম্যাট্রিক্স কনড্রিন (Chondrin) নামক এক প্রকার কঠিন এবং স্থিতিস্থাপক পদার্থ দিয়ে তৈরি। তরুণাস্থির কোষকে কনড্রোসাইট (Condrocyte) বলে।

তরুণাস্থির কাজ ঃ

- ম্যাট্রিক্সের গঠনের জন্য তরুণাস্থি অন্যান্য কলা অপেক্ষা অনেক বেশি চাপ ও টান (Tension) সহ্য করতে পারে।

তরুণাস্থির প্রকার ভেদ ঃ ম্যাট্রিক্সের গঠনের উপর ভিত্তি করে তরুণাস্থিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

i) **স্বচ্ছ তরুণাস্থি** (Hyaline Cartilage) ঃ এর ম্যাট্রিক্স ইষৎ স্বচ্ছ, নীলাভ, নমনীয় এবং তন্তুবিহীন।

অবস্থান ঃ পর্শুকার তরুণাস্থি, শ্বাসনালীর তরুণাস্থি, নাক, বাড়ন্ত লম্বা অস্থির প্রান্তে এই স্বচ্ছ তরুণাস্থি থাকে।

ii) **স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি** (Elastic Cartilage) ঃ এর ম্যাট্রিক্স অস্বচ্ছ ও হালকা হলুদ বর্ণের, ম্যাটিক্সে স্থিতিস্থাপক তন্তু ছড়ানো থাকে।

অবস্থান ঃ কর্ণছত্র বা পিনা (External Ear or Pina) ইউস্টেশীয়ান নালী (Eustetian Tube) প্রভৃতি অংশে এই ধরনের তরুণাস্থি থাকে।

iii) **শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি** (White Fibrous Cartilage) ঃ এর ম্যাটিক্সে প্রচুর পরিমাণ শ্বেত তন্তু থাকে।

অবস্থান : বিশেষ সন্ধিতে শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি থাকে। যেমন:– দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে থাকে।

খ) অস্থি (Bone) ঃ

অস্থি হচ্ছে দেহের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় যোজক কলা। এর ম্যাট্রিক্স পানি (২৫%), জৈব পদার্থ (৩০%) ও অজৈব পদার্থ (৪৫%) দ্বারা গঠিত হওয়ায় সম্পুর্ণ কলাটি কঠিন আকার ধারণ করে। জৈব অংশটি কোলাজেন (Collagen) ও অস্টিওমিউকয়েডে (Osteomucoid) গঠিত হয়। অজৈব অংশটি প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট নিয়ে গঠিত। ম্যাট্রিক্সে অস্থিকোষ (Osteocyte) ছড়ানো থাকে। পেরিঅস্টিয়াম (Periosteum) নামক তন্তুময় যোজক কলা নির্মিত পাতলা ও মসৃণ আবরণ প্রতিটি অস্থিকে ঘিরে রাখে।

অস্থির গঠন ঃ অস্থির ম্যাট্রিক্স কতকগুলি স্তরে সাজানো থাকে। স্তরগুলিকে ল্যামেলী (Lamellae) বলে। ল্যামেলীগুলি একটি সুস্পষ্ট নালীর চারদিকে চক্রাকারে বিন্যস্ত। কেন্দ্রিয় এই নালীকে হ্যাভারসিয়ান নালী (Haversian canal) বলে। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান নালী ও একে বেষ্টনকারী ল্যামেলীগুলোর সমন্বয়ে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (Haversian system) সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ল্যামেলায় ল্যাকুনা নামে কতগুলো ক্ষুদ্র গহবর থাকে। অস্থিকোষ ল্যাকুনার ভেতরে অবস্থান করে। প্রতিটি ল্যাকুনার চারদিক থেকে সূক্ষ্ম কতগুলো নালিকা বেরোয়। এদের ক্যানালিকুলি (Canaliculi) বলা হয়। এসব নালিকার মাধ্যমে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের বিভিন্ন ল্যাকুনা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

অস্থি মজ্জা : অস্থির কেন্দ্রস্থলে যে গহবর থাকে তার নাম মজ্জা গহবর (Medullary cavity)। লম্বা অস্থির মজ্জা গহ্বরে এবং স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে যে নরম, জেলি সদৃশ, উচ্চ রক্তবাহী নালী সমৃদ্ধ বস্তু থাকে তাকে অস্থি মজ্জা (Bone marrow) বলে। অস্থি মজ্জা দেহের বৃহত্তম অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি এবং এর প্রধান কাজ রক্ত উৎপন্ন করা। অস্থি মজ্জা দুই ধরনের।

যথা ঃ ১) লাল অস্থি মজ্জা (Red bone marrow), ২) হলুদ অস্থি মজ্জা (Yellow bone marrow)।

অস্থির প্রকারভেদ ঃ

ক) ঘনত্ব ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে অস্থিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

১। ঘনসন্নিবিষ্ট বা দৃঢ় অস্থি (Compact or Dense bone) ঃ আদর্শ লম্বা অস্থি যেমন ফিমার ও হিউমেরাস এর অস্থিকান্ডে (Diaphysis) এ দৃঢ় অস্থি পাওয়া যায়।

২। স্পঞ্জ বা জালিকা সদৃশ অস্থি (Spongy or Cancellers bone) ঃ মাথার খুলি ও চ্যাপ্টা অস্থিগুলিতে এ ধরনের অস্থি পাওয়া যায়।

খ) আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে অস্থিকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। লম্বা অস্থি (Long Bone),
২। খাট অস্থি (Short bone),
৩। চ্যাপ্টা অস্থি (Flat bone),
৪। অসম আকৃতির অস্থি (Irregular bone),
৫। বায়ু প্রকোষ্ঠ অস্থি (Pneumatic bone),
৬। পেশী বন্ধনী থেকে উদ্ভুত ছোট অস্থি (Sesamoid bone)

১। **লম্বা অস্থি** (Long Bone): যেমন হিউমেরাস (Humerus), রেডিয়াস (Redius), আলনা (Ulna), ফিমার (Femer), টিবিয়া (Tibia) এবং ফিবুলা (Fibula)।

ডান হিউমেরাস : সম্মুখবর্তি দৃশ্য (Interior Veiw)

রেডিয়াস ও আলনা : সম্মুখবর্তি দৃশ্য (Interior Veiw)

চ্যাপ্টা অস্থি- স্ক্যাপুলা

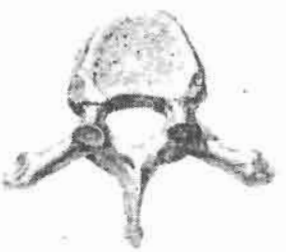

অসম আকৃতির অস্থি- কশেরুকা

২। **খাট অস্থি** (Short bone) ঃ যেমন হাত ও পায়ের ছোট ছোট অস্থি কারপাল (Carpal) এবং টারসাল (Tarsal) প্রভৃতি।

৩। **চ্যাপ্টা অস্থি** (Flat bone) ঃ যেমন স্ক্যাপুলা (Scapula), স্টারনাম (Sternum), পাজরের অস্থি বা রিব (Rib)।

৪। **অসম আকৃতির অস্থি** (Irregular bone) ঃ যেমন- কশেরুকা (Vertebra)।

৫। **বায়ু প্রকোষ্ঠ অস্থি** (Pneumatic bone) ঃ যেমন- ম্যাক্সিলা (Maxilla), স্ফেনয়েড (Sphenoid) ও ইথময়েড (Ethmoid)।

৬। **পেশি বন্ধনী থেকে উদ্ভূত ছোট অস্থি** (Sesamoid bone) ঃ যেমন- প্যাটেলা (Patella) ও ফিজিফর্ম (Pisiform)।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কলা কাকে বলে?

২। কলা কত প্রকার ও কি কি?

৩। আবরণী কলা কাকে বলে?

৪। গ্রন্থি বলতে কি বোঝ?

৫। পেশি কলা বলতে কি বোঝ?

৬। যোজক কলা বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও।

৭। ঐচ্ছিক পেশি ও অনৈচ্ছিক পেশির মধ্যে পার্থক্য কি?

৮। তরুণাস্থি বলতে কী বোঝ?

৯। অস্থি কি?

১০। অস্থি মজ্জা কাকে বলে?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আবরণী কলা কত প্রকার ও কি কি? তা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২। পেশি কলা কত প্রকার ও কি কি? তা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩। যোজক কলার প্রকারভেদ, উদাহরণ ও কাজসহ বর্ণনা কর।

৪। তরুণাস্থির প্রকারভেদ, উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৫। আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে অস্থিকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়
মানবদেহের কাঠামো

কঙ্কাল/অস্থি তন্ত্র

অস্থি তন্ত্র (Skeletal system)

বিশেষ ধরনের যোজক কলা নির্মিত অস্থি (Bone) ও তরুণাস্থি (Cartilage) –এর সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের কাঠামো নির্মাণ করে, নরম অঙ্গগুলিকে সংরক্ষণ করে, দেহের ভার বহন করে এবং পেশি সংযোজনের জন্য উপযুক্ত স্থান সৃষ্টি করে তাকে অস্থি তন্ত্র বলে।

অস্থি তন্ত্রের কাজ ঃ

- **দৈহিক কাঠামো গঠন ঃ** অস্থিতন্ত্র দেহ কাঠামো গঠন করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।
- **চলাচল ঃ** পেশিসমূহ বিভিন্ন অস্থির সাথে যুক্ত থেকে পেশি সংকোচনের মাধ্যমে অস্থি চালিত করে চলন ঘটায়।
- **রক্ষণাবেক্ষণ ঃ** মস্তিষ্ক, সুষুম্না কান্ড, হৃদপিন্ড, ফুসফুস প্রভৃতি নরম ও সংবেদনশীল অঙ্গসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।
- **সঞ্চয় ঃ** অস্থি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সঞ্চয় করে।
- **লোহিত কণিকা উৎপাদন :** অস্থি মজ্জা থেকে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়।

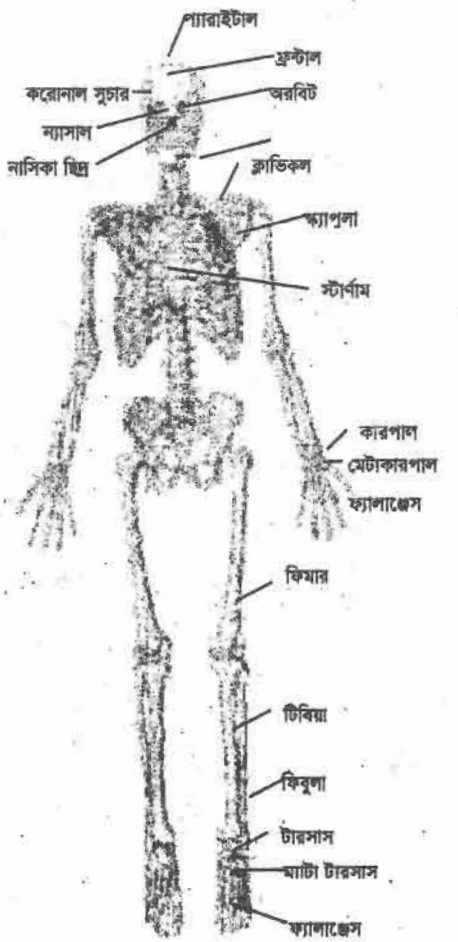

অস্থি তন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস ঃ

মানবদেহের মোট ২০৬টি অস্থি আছে। সমগ্র অস্থিতন্ত্রকে প্রধান ২ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

১) অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র (Axial skeletal system),
২) উপাঙ্গীয় অস্থিতন্ত্র (Appendicular skeletal system)।

অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র : যে অস্থিসমূহ দেহের অক্ষরেখা বরাবর অবস্থান করে মস্তিষ্কের এবং দেহ গহ্বরের নরম অঙ্গগুলোকে ধারণ করে ও রক্ষা করে, তাদের সমন্বয়ে অস্থিতন্ত্রের যে অংশ তৈরি হয় তাকে অক্ষীয় অস্থিতন্ত্র বলে। এই তন্ত্রে যে সব অস্থি আছে সেগুলিহল

১) মাথার খুলি বা করোটির অস্থি (Skull bones)
২) গলার অস্থি (Hyoid bone)
৩) মেরুদন্ডের অস্থি (Vertebral column)
৪) বুকের অস্থি ও পাঁজরের অস্থিসমূহ (Sternum and rib)

মানবদেহের অস্থিসমূহের তালিকা

প্রধান ভাগ	অস্থির সংখ্যা	অন্তর্ভুক্ত অংশ	অস্থির সংখ্যা	বিন্যাস ও সংখ্যা	মোট অস্থির সংখ্যা
অক্ষিয় অস্থি	৮০ টি	করোটি	২৮ টি	করোটিকা: ১। ফ্রন্টাল ---- ---- ---- ১টি; ২। প্যারাইটাল ---- ---- ---- ২টি; ৩। টেমপোরাল - -- ---- ---- ২টি ৪। অক্সিপেটাল ---- ----- ১টি; ৫। স্ফেনয়েড ---- - ---- ১টি; ৬। এথময়েড ---- ---- ---- ১টি	৮টি
				মুখমণ্ডলীয় অস্থি: ১। ম্যাক্সিলা ---- ---- ---- ২টি; ২। ম্যান্ডিবল ---- ---- ---- ১টি; ৩। জাইগোম্যাটিক ----- ---- ২টি; ৪। ন্যাসাল ---- ---- ---- ২টি; ৫। ল্যাক্রিমাল ---- ---- ---- ২টি; ৬। ইনফিরিয়র ন্যাসাল --- ---- ২টি; ৭। ভোমার ---- ---- ---- ১টি; ৮। প্যালেটাইন ---- ---- ---- ২টি	১৪টি
				কানের অস্থি: ১। ম্যালিয়াস ---- ---- ---- ২টি; ২। ইনকাস ---- ---- ---- ২টি; ৩। স্টেপিস ---- ---- ---- ২টি	৬টি
		হাইওয়েড	১ টি	হাইওয়েড অস্থি ---- ---- ---- ১টি	১টি
		দেহকান্ড	৫১ টি	বক্ষপিঞ্জর: ১। স্টার্ণাম ---- ---- ---- ১টি; ২। পর্শুকা ---- ---- ---- ২৪টি	২৫টি
				মেরুদন্ড: ১। সারভাইক্যাল -- ----- ---- ৭টি; ২। থোরাসিক -- ---- --- ১২টি; ৩। লাম্বার -- ---- ---- ৫টি; ৪। স্যাক্রাল ---- ---- ---- ৫টি; ৫। কক্সিজিয়াল ---- ---- ---- ৪টি	৩৩টি (*)
উপাঙ্গীয় অস্থি	১২৬টি	উর্ধ্বাঙ্গ	৬৪টি	বক্ষ-অস্থি: ১। ক্ল্যাভিকল ---- ---- ---- ২টি; ২। স্ক্যাপুলা ---- ---- ---- ২টি	৪টি
				উত্তর বাহু: ১। হিউমেরাস ---- ---- ---- ২টি; ২। রেডিয়াস ---- ---- ---- ২টি; ৩। আলনা ---- ---- ---- ২টি	৬টি
				উত্তর হাত: ১। কারপাল ---- ---- ---- ১৬টি; ২। মেটা কারপাল ---- ---- ১০টি; ৩। ফ্যালাঞ্জেস্ ---- ---- ---- ২৮টি	৫৪টি
		নিম্নাঙ্গ	৬২টি	শ্রোণী-অস্থি: ১। নিতম্ব অস্থি (ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম ও পিউবিস) ---- ২টি	২টি
				উত্তর উরু ও পা: ১। ফিমার ---- ---- ---- ২টি; ২। টিবিয়া ---- ---- ---- ২টি; ৩। ফিবুলা ---- ---- ---- ২টি; ৪। প্যাটেলা ---- ---- ---- ২টি	৮টি
				উত্তর পাতা: ১। টার্সাল ---- ---- ---- ১৪টি; ২। মেটা টার্সাল ---- ---- ---- ১০টি; ৩। ফ্যালাঞ্জেস ---- ---- ---- ২৮টি	৫২টি

করোটি (Skull)

২৮টি অস্থি নিয়ে করোটি গঠিত। করোটির অস্থিসমূহ দুভাগে বিভক্ত। যথা :-

ক) করোটিকা (Cranium) বা খুলির অস্থি (Cranial bone), খ) মুখমণ্ডলীয় অস্থি (Facial bone)।

ক) **করোটিকা** (Cranium) ঃ করোটিকা ৮টি চ্যাপ্টা ও শক্ত অস্থি নিয়ে গঠিত। অস্থিগুলি খাঁজকাটা কিনারাযুক্ত হওয়ায় একত্রে ঘন সন্নিবেশিত ও দৃঢ়সংলগ্ন থাকে।

১) **সম্মুখস্থ অস্থি** (Frontal bone) ঃ এটি সম্মুখ কপাল নির্মাণকারী বড় ঝিনুকের মতো আকার বিশিষ্ট কপালের অস্থি। এতে দুই অক্ষিকোটর এবং নাকের অংশ থাকে। প্রতিটি অক্ষিকোটরের অংশ সামনে এসে ভুরুর অংশের সাথে মিশে।

২) **প্যারাইটাল অস্থি** (Parietal bone) ঃ এটি চার কোণা প্লেটের মতো এক জোড়া অস্থি। এর বহির্তলে একটি উঁচু অংশ থাকে।

৩) **টেমপোরাল অস্থি** (Temporal bone) ঃ এটি এক জোড়া অস্থি এবং ৪টি অংশে বিভক্ত, যথা ঃ ক) খোলসাকার অংশ, খ) গম্বুজ, গ) ম্যাস্টয়েড অংশ এবং ঘ) টিম্প্যানিক অংশ। এ অস্থিতে শ্রবণাঙ্গ, শ্রম্নতি নালী, ক্যারোটিড নালী ও মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুর নালী অবস্থান করে।

৪) **অক্সিপিটাল অস্থি** (Occipital bone) ঃ এটি একটি খোলসের মতো অংশ, দুটি পার্শ্বীয় এবং একটি গোড়াদেশীয় অংশ নিয়ে গঠিত। এ অংশগুলো মহাবিবরের চারদিক ঘিরে অবস্থান করে। মহাবিবরের দুইপাশে দুইটি কন্ডাইল থাকে যার সাহায্যে অক্সিপিটাল অস্থি এটলাসের (১ম সার্ভাইক্যাল কশেরুকা) সাথে করোটিকাকে যুক্ত করে।

৫) **স্ফেনয়েড অস্থি** (Sphenoid bone) ঃ এটি একটি দেহকাণ্ড ও তিন জোড়া উদ্গত অংশ নিয়ে গঠিত হয়। উদ্গত অংশগুলো হলো বড় ডানা, ছোট ডানা ও টেরিগয়েড প্রসেস।

৬) **এথময়েড অস্থি** (Ethmoid bone) ঃ এটি একটি ছিদ্রযুক্ত আড়াআড়ি প্লেট, একটি অনুলম্ব প্লেট, দুটি অক্ষিকোটরীয় প্লেট এবং দুটি ল্যাবিরিন্থ নিয়ে গঠিত হয়। প্রত্যেক ল্যাবিরিন্থ প্লেট কতগুলো ক্ষুদ্র বায়ু প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত হয়। প্রকোষ্ঠগুলো পাতলা অস্থিময় প্লেটে পৃথকভাবে থাকে। প্রতিটি ল্যাবিরিন্থের ভেতরের তল থেকে ঊর্ধ্ব ও মধ্য নাসিকা অস্থি নামে দুটি বাঁকা অস্থিপ্লেট ঝুলে থাকে।

করোটিকার কাজ ঃ

- করোটিকা মস্তিষ্ককে আবৃত রাখে।
- মস্তিষ্ককে ধারণ করে এবং
- আঘাত হতে রক্ষা করে।

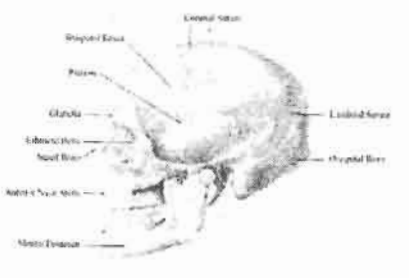

মুখমণ্ডলীর অস্থি ঃ

করোটিকার সামনের ও নিচের দিকের অংশকে মুখমন্ডল বলে। মুখমন্ডল নিম্নোক্ত অস্থি নিয়ে গঠিত: (প্রত্যেক কানে ৩টি করে মোট ৬ টি অস্থি আছে। জিহবার পেছন দিকে বা গোড়ায় হাইরয়েড নামে একটি পাতলা অস্থিও থাকে। এসব অস্থি অস্থিগণনার বাইরে থাকে।)

১) **ম্যাক্সিলা** (Maxilla) **বা উর্ধ্ব চোয়াল** ঃ ম্যাক্সিলা একটি জোড় অস্থি। এটি একটি দেহকাণ্ড ও ৪টি প্রবর্ধন নিয়ে গঠিত। প্রবর্ধনগুলো হচ্ছে - জাইগোম্যাটিক, প্যালেটাইন, ফ্রন্টাল ও অ্যালভিওলার।

২) **ম্যান্ডিবুল** (Mandible) **বা নিম্ন চোয়াল** ঃ এটি U – আকৃতির এবং একটি দেহকান্ড ও দুটি শাখা নিয়ে গঠিত। ম্যান্ডিবুলের প্রত্যেক শাখা দেহকান্ডের সাথে সূক্ষ্ম কোণ রচনা করে উত্থিত হয় এবং চূড়ার দিকে শেষ হয় দুটি প্রবর্ধনে, যথা ঃ করনয়েড ও কন্ডাইলয়েড প্রসেস। প্রতিটি শাখার অন্তর্তলে একটি করে ম্যান্ডিবুলার ছিদ্র থাকে। ছিদ্রের সমাপ্তি ঘটে একটি করে ম্যান্ডিবুলার নালীতে। ম্যান্ডিবুলই করোটির একমাত্র নড়নক্ষম অস্থি।

৩) **জাইগোম্যাটিক অস্থি** (Zygomatic bone) ঃ এটি একটি অনিয়ত চতুষ্কোণা অস্থি যা মুখমন্ডলের পার্শ্বদেশে একটি উঁচু অংশ সৃষ্টি করে এবং জাইগোম্যাটিক আর্চ- এর অংশ গঠন করে।

৪) **ন্যাসাল অস্থি** (Nasal bone) ঃ এটি একটি আয়তকার অস্থি যা নাকের পিঠ নির্মাণে অংশগ্রহণ করে।

৫) **ল্যাক্রিমাল অস্থি** (Lacrimal bone) ঃ এটি একটি ল্যাক্রিমাল খাদ ও ঝুঁটি সংবলিত ক্ষুদ্র অস্থি যা ল্যাক্রিমাল থলি ও ন্যাসোল্যাক্রিমাল নালীছিদ্র গঠনে অংশ নেয়।

৬) **ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা** (Inferior Nasal Concha) ঃ এটি নাসা গহবরের দুইপাশে অবস্থিত একজোড়া পাতলা বাঁকা হাড়।

৭) **ভোমার** (Vomar) ঃ এটি নাসা ব্যবধায়কের অংশবিশেষ নির্মাণকারী একটি অনিয়ত চতুষ্কোণা প্লেট।

৮) **প্যালেটাইন অস্থি** (Palatine Bone) ঃ এটি আড়াআড়ি ও অনুলম্ব কতকগুলো প্লেটে গঠিত যা কঠিন তালু ও নাসা গহবরের পার্শ্ব প্রাচীর নির্মাণ করে।

হাইওয়েড অস্থি (Hyoid Bone) ঃ এটি একটি দেহকান্ড ও দুইজোড়া কর্ণুয়া (বড় ও ছোট) নিয়ে গঠিত U- এর আকৃতির অস্থি যা নিচের চোয়াল ও ল্যারিংক্সের মাঝখানে অবস্থিত। ঘাড়ের অনেক পেশি এ অস্থির সাথে লাগানো থাকে।

মুখমন্ডলীর অস্থির কাজ ঃ মুখমন্ডলের অস্থিগুলো সুসজ্জিত হয়ে চোখ, কান, নাক ও মুখগহবরের সৃষ্টি করে। এসব গহ্বরে চোখ, কান, নাক ও দাঁত সুবিন্যস্ত থেকে অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ গঠনে ও সংরক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

দেহকান্ড ঃ দেহকান্ড দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:- ক) মেরুদণ্ড ও খ) বক্ষপিঞ্জর।

ক) মেরুদন্ড (Vertibral Column) : মেরুদণ্ডকে শিরদাঁড়া, স্পাইন, স্পাইনাল কলাম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ৩৩টি অনিয়ত আকৃতির অস্থিখণ্ড নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত। মেরুদন্ডের প্রত্যেকটি অস্থিক্ষন্ডকে কশেরুকা বা Vertibra এবং বহুবচনে Vertibrae বলে।

একটি আদর্শ কশেরুকার গঠন ঃ দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের এমনকি একই অঞ্চলের বিভিন্ন কশেরুকায়ও পার্থক্য দেখা যায়। তা সত্বেও সকল কশেরুকাই একটি মৌলিক গড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিচে মানুষের একটি আদর্শ কশেরুকার (মধ্য বক্ষদেশীয় কশেরুকা) বর্ণনা দেওয়া হলো। দেহ ও আর্চ নিয়ে কশেরুকা গঠিত।

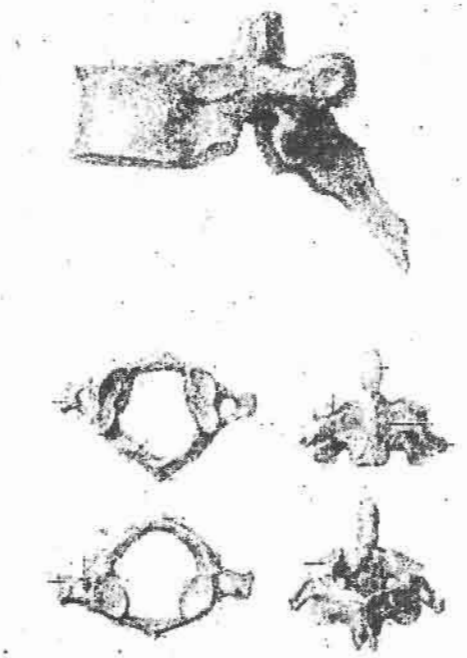

গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা

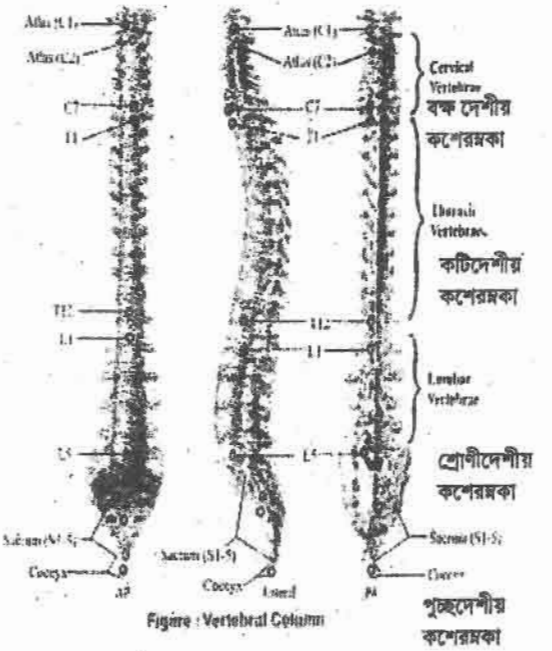

Figure : Vertebral Column

১) **দেহ** (Body) ঃ এটি কশেরুকার বৃহত্তম ও সম্মুখস্থ স্থূল অংশ যা দেখতে ডিম্বাকার রডের একটি খন্ডের মতো। আন্তঃকশেরুকীয় চাকতির সাহায্যে সমস্ত কশেরুকার দেহ পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকে। দেহ শক্ত, পুরু ও স্পঞ্জি অস্থিতে গঠিত।

২) **আর্চ** (Body) ঃ এটি কশেরুকা-দেহের পৃষ্ঠতলে অবস্থিত রিংএর মত গঠন। আর্চ নিম্নোক্ত অংশগুলো ধারন করে।

ক) **পেডিকল** (Pedicle) ঃ কশেরুকা-দেহের উভয় পশ্চাৎ-পার্শ্ব থেকে উত্থিত ও পেছনে বর্ধিত খাটো শক্ত গঠন।

খ) **ট্রান্সভার্স প্রসেস** (Transvers Process) ঃ উভয় পাশে পেডিক্‌ল ও ল্যামিনার সংযোগস্থল থেকে উত্থিত পার্শ্বীয় প্রবর্ধন ।

গ) **ল্যামিনা** (Lamina) ঃ উভয় পাশে ট্রান্সভার্স ও স্পাইনাস প্রসেসের মাঝখানে অবস্থিত চওড়া, চাপা, তির্যক ও ঢালু প্লেটের মতো অস্থি ।

ঘ) **আর্টিকুলার প্রসেস** (Articular Process) ঃ উভয় পাশে ল্যামিনা ও পেডিক্‌লের সংযোগস্থল থেকে উদত একটি সুপিরিয়র ও একটি ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। একটি কশেরুকার সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস অন্য কশেরুকার ইনফেরিয়র আর্টিকুলার প্রসেসের সংগে যুক্ত থাকে।

ঙ) **স্পাইনাস প্রসেস** (Spinous Process) ঃ দুই ল্যামিনির সংযোগস্থল থেকে একটি পশ্চাৎ মধ্যেরেখীয় প্রবর্ধন যা নিম্নমুখী প্রসারিত। ২য় -৬ষ্ঠ সারভাইকাল কশেরুকার এ প্রসেস প্রান্তের দিকে দ্বিখন্ডিত।

কশেরুকার ছিদ্রপথ ও নালী ঃ পেডিকলের উর্ধ্ব ও নিম্নদেশে যে নচ্ থাকে তা সম্মিলিতভাবে ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন (Intervertibral Foramen) গঠন করে। এ ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সুষুম্না স্নায়ু ও রক্তবাহিকা অতিক্রান্ত হয়। কশেরুকার যে বড় ছিদ্রটি সম্মুখে দেহ, পশ্চাতে আর্চ ও পাশে পেডিকলে নির্মিত হয়, তাকে ভার্টিব্রাল ফোরামেন (Vertibral Foramen) বলে। সকল কশেরুকার কশেরুকীয় ছিদ্র সম্মিলিতভাবে ভার্টিব্রাল ক্যানেল (Vertibral Canal) নির্মান করে। এর ভেতরে ঝিল্লিসহ সুষুম্না কান্ড (Spinal Chord) ও রক্তবাহিকা সুরক্ষিত থাকে।

কশেরুকার প্রকারভেদ ঃ অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকাগুলোকে নিম্নোক্ত ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে ;

১। সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা (Cervical vertebrae) --- --- --- --- --- ৭টি
২। থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা (Thoracic vertebrae) --- --- --- --- --- ১২টি
৩। লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা (Lumbar vertebrae) --- --- --- --- --- ৫টি
৪। স্যাক্রাল (শ্রোনিদেশীয়) কশেরুকা (Sacral vertgebrae) --- --- --- --- --- ৫টি (একীভুত)
৫। কক্কিজিয়াল (পুচ্ছদেশীয়) কশেরুকা (Coccygeal vertebrae) --- --- --- --- --- ৪টি (একীভুত)
মোট ৩৩ টি

পরিণত বয়সে শ্রেণিদেশীয় কশেরুকাগুলো একীভূত হয়ে স্যাক্রাম (Sacram) এবং কক্কিজিয় কশেরুকাগুলো কক্কিক্স (Coccyx) গঠন করে, ফলে সর্বমোট কশেরুকার সংখ্যা কমে ২৬(*) টি হয়।

নিচে এসব কশেরুকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো:

১) সারভাইকাল বা গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা:

গ্রীবদেশীয় অঞ্চলের এ ৭টি কশেরুকার মধ্যে ৩টির গড়নই ভিন্ন ধরনের। ভিন্ন গড়নের প্রথম কশেরুকাটি এ্যাটলাস (Atlas), দ্বিতীয়টি এ্যাক্সিস (Axis), ও তৃতীয়টি (৭ম কশেরুকা) ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স (Vertibra Prominans) নামে অভিহিত। আদর্শ কশেরুকার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সারভাইকাল কশেরুকায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলো লক্ষণীয় ঃ

১) ট্রান্সভার্স প্রসেস খাটো এবং ট্রান্সভার্স ফোরামেন (Transverse Foramen) নামে ছিদ্র বহন করে (কশেরুকার ধমনী অতিক্রমের জন্য)।
২) ট্রান্সভার্স প্রসেস সম্মুখ ও পশ্চাৎ টিউবাক্লযুক্ত।
৩) ২য় থেকে ৬ষ্ঠ কশেরুকার স্পাইনাস প্রসেসের প্রান্ত দ্বিখন্ডিত।
৪) দেহ অপেক্ষাকৃত ছোট।
৫) ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণাকার।

নিচে এ্যাটলাস, এ্যাক্সিস ও ভার্টিব্রার প্রমিনেন্সের বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

এ্যাটলাস (১ম সারভাইকেল কশেরুকা)

বৈশিষ্ট্য ঃ

১) দেখতে রিং এর মত আকৃতির।
১) দেহ নেই।
২) স্পাইনাস প্রসেস অনুপস্থিত।
৩) সম্মুখ ও পশ্চাৎ আর্চ এবং পার্শ্বীয় পিন্ড নিয়ে গঠিত।
৪) স্পাইসাস প্রসেস ক্ষুদ্র হয়ে পশ্চাৎ টিউবারক্ল এবং সম্মুখ আর্চের সামনের দিক ক্ষুদ্র হয়ে সম্মুখ টিউবারক্ল গঠন করে।
৫) ট্রান্সভার্স প্রসেস বড় আকৃতির এবং ট্রান্সভার্স ফোরামেন যুক্ত। পার্শ্বীয় পিন্ডে সুপিরিয়র ও ইনফেরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট রয়েছে।

এ্যাক্সিস (২য় সারভাইকাল কশেরুকা)

বৈশিষ্ট ঃ

১) দেহ সংক্ষিপ্ত।
২) দেহের উর্ধ্বপৃষ্ঠ থেকে সুদৃঢ়, ত্রিকোণা ও ডোন্টয়েড প্রসেস উদ্গত।
৩) পেডিক্‌ল চওড়া ও দৃঢ়।
৪) ল্যামিনা পুরু ও দৃঢ়।
৫) ট্রান্সভাস প্রসেস ক্ষুদ্র, একেকটি টিউবার্কলে সমাপ্ত এবং ট্রান্সভার্স ফোরামেনযুক্ত।
৬) ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় (কিন্তু এ্যাটলাস আপেক্ষা ছোট)।
৭) সুপিরিয়র আর্টিকুলার সারফেস গোলাকার, সামান্য উত্তল এবং দেহ, পেডিক্‌ল ও ট্রান্সভার্স প্রসেসের উপর অবলম্বিত।
৬) স্পাইনাস প্রসেস বড়, সুদৃঢ় ও গভীর খাদযুক্ত এবং শীর্ষে দ্বিখন্ডিত।

ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স (৭ম সারভাইকাল কশেরুকা) :

বৈশিষ্ট্য ঃ

১) স্পাইনাস প্রসেসর, সুস্পষ্ট ('Prominent' শব্দটি থেকেই এর নাম হয়েছে ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স), পুরু, সোজা ও অখন্ডিত।
২) ট্রান্সভার্স ফোরামেন বড় ।
৩) ট্রান্সভার্স প্রসেসর সম্মুখ অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট (এ অংশটি কখনও কখনও বড় হয়ে পৃথক অস্থি হিসেবে অবস্থান করে তখন একে সারভাইকাল পর্শুকা বলে।)

২) থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা

বৈশিষ্ট্য ঃ

১) দেহ মাঝারী ও হৃদপিন্ড আকৃতির।
২) ভার্টিব্রাল ফোরামেন ছোট ও গোলাকার।
৩) দেহের উভয় পাশে দেহ ও আর্চের সংযোগস্থলে পর্শুকার মস্তক সংযোগের জন্য কোস্টাল ফ্যাসেট (Costal Facet) উপস্থিত।
৪) পর্শুকার টিউবার্কল সংযোগের জন্য ট্রান্সভার্স প্রসেসেও কোস্টাল ফ্যাসেট থাকে (১১শ ও ১২শ কশেরুকা বাদে)।
৫) স্পাইনাস প্রসেস লম্বা ও সুরু।

৩। লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা

বৈশিষ্ট্য ঃ

১) দেহ বড় ও বৃক্ক আকৃতির (সমস্ত কশেরুকার মধ্যে এদের দেহ সবচেয়ে মজবুত ও বড়)।
২) ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণা।
৩) ট্রান্সভার্স প্রসেস লম্বা সুরু, ট্রান্সভার্স ফোরামেন নেই।
৪) ট্রান্সভার্স প্রসেসের পশ্চাৎ তলে ম্যামিলারি ও অ্যাকসেসরি প্রসেস (Mammilary and Acessory Processes) উপস্থিত।
৫) স্পাইনাস প্রসেস খাটো, মোটা ও চতুষ্কোণা।

৪। স্যাক্রাল (শ্রেণিদেশীয় কশেরুকা)

বৈশিষ্ট্য ঃ

মানুষের দেহে লাম্বার কশেরুকার নিচে ৫টি স্যাক্রাল কশেরুকা থাকে। এগুলো ক্রমশ একীভূত হতে শুরু করে এবং ২৬ বছর বয়সে একীভূত হয়ে স্যাক্রাম (Sacram) নামে একটি ত্রিকোণা অস্থি গঠন করে। এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১) অঙ্ক ও পৃষ্ঠতলে ৪ জোড়া করে যথাক্রমে সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্যাক্রাল ছিদ্র বহন করে।

২) প্রমোন্টরি (Promontory) নামে একটি অঙ্কীয় অগ্রমুখী প্রবর্ধন থাকে।

৩) পার্শ্বদেশে অমসৃন পাতার মতো চাপা সংযোগী তল (আর্টিকুলার সারফেস)।

৪) কেন্দ্রীয় অংশ হচ্ছে দেহ।

৫) ৫ম কশেরুকার ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস বর্ধিত হয়ে স্যাক্রাল কর্ণুয়া সৃষ্টি করে।

৬) একীভূত স্পাইনাস প্রসেস মধ্যরেখীয় ক্রেস্ট গঠন করে।

৭) উর্ধ্বক্ষপ্রান্তের চওড়া অংশে উর্ধ্বক্ষমুখী সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস থাকে।

কক্সিক্স বা কক্সিজিয়াল কশেরুকা

সাধারণত ৪টি ছোট কশেরুকা যুক্ত হয়ে কক্সিক্স গঠন করে। এর প্রথম ৩টি কশেরুকাকে শুধু সংক্ষিপ্ত দেহ এবং আর্টিকুলার ও ট্রান্সভার্স প্রসেস দেখে সনাক্ত করা যায়। চতুর্থটি অস্থিগুটির মতো মনে হয়। প্রতিটি খন্ডই পেডিক্‌ল, ল্যামিনা ও স্পাইনাস প্রসেসবিহীন। প্রথম কশেরুকাটি সবচেয়ে বড় এবং দেখতে সবচেয়ে নিচের দিকের স্যাক্রাল কশেরুকার মতো। এটি অনেক সময় পৃথক খন্ড হিসাবে থাকে। বাকি ৩ টি ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে ছোট হয় এবং একীভূত থাকে।

কক্সিক্সের সম্মুখ তল অবতল, পশ্চাৎ তল উত্তল দিকে কক্সিজিয়াল কর্ণুয়া (Coccygeal Cornua) নামে একজোড়া উর্ধ্বমুখী প্রবর্তন থাকে। পার্শ্বতলে কতকগুলো ক্ষুদ্র উপবৃদ্ধি রয়েছে, এগুলি কক্সিজিয়াল কশেরুকার ট্রান্সভার্স প্রসেস।

মেরুদন্ডের কাজ

১। দেহকান্ডের সুষ্ঠু সঞ্চালনে মজবুত, নমনীয় অবলম্বন হিসেবে কাজ করে ।

২। সষুম্না কান্ড ও সুষুম্না স্নায়ুমূলকে বেষ্টন ও রক্ষা করে।

৩। মাথাকে অবলম্বন দেয় এবং পিভট (Pivot) –এর মতো কাজ করে।

৪। পর্শুকা সংযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেহের অক্ষরূপে কাজ করে।

৫। দেহের ভঙ্গি দানে ও চলাফেরায় গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ) বক্ষপিঞ্জর

দেহের পর্শুকাগুলো একদিকে থোরাসিক কশেরুকা ও অন্যদিকে স্টার্নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে খাঁচার মতো আকৃতি দান করে, তাকে 'বক্ষপিঞ্জর' বলে। মানুষের বক্ষপিঞ্জর একটি স্টার্নাম (Sternum), ১২ জোড়া পর্শুকা (Ribs) এবং ১২টি থোরাসিক কশেরুকা নিয়ে গঠিত হয়।

স্টার্ণাম ঃ বুকের কেন্দ্রীয় সম্মুখ অংশে অবস্থিত চাপা অস্থিটি স্টার্নাম। এটি ৩টি অংশে বিভক্ত - উপরের ত্রিকোণাকার ম্যানুব্রিয়াম; মাঝের লম্বা দেহ; এবং নিচের ক্ষুদ্র 'জিফয়েড প্রসেস'। ম্যানুব্রিয়াম দেহের সাথে সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে সম্মুখে প্রসারিত।

স্টার্নামের উর্ধ্ব কিনারায় একটি তথাকথিত 'জুগুলার নচ্' এবং পার্শ্ব কিনারায় ক্ল্যাভিক্‌লের এবং ৭ জোড়া পর্শুকার খাঁজ থাকে।

পর্শুকা ঃ পর্শুকাগুলি লম্বা, সুরু, চাপা ও বাঁকা অস্থি। মানুষের দেহে ১২ জোড়া পর্শুকা থাকে। একটি আদর্শ পর্শুকা পশ্চাৎপ্রান্তে ফ্যাসেটবাহী মস্তক বা ক্যাপিচুলাম, ক্রেস্টবাহী গ্রীবা, সংযোগী তলসহ 'টিউবার্কল' এবং কোণ করে ঝাঁকানো দেহ নিয়ে গঠিত। মস্তক দিয়ে থোরাসিক কশেরুকার দেহের সাথে এবং টিউবার্কল দিয়ে একই কশেরুকার ট্রান্সভার্স প্রসেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পর্শুকার সম্মুখ প্রান্ত তরুণাস্থিয়। প্রথম ৭ জোড়া পর্শুকা এদের তরুণাস্থি দিয়ে স্টার্ণামের সাথে যুক্ত থাকে,

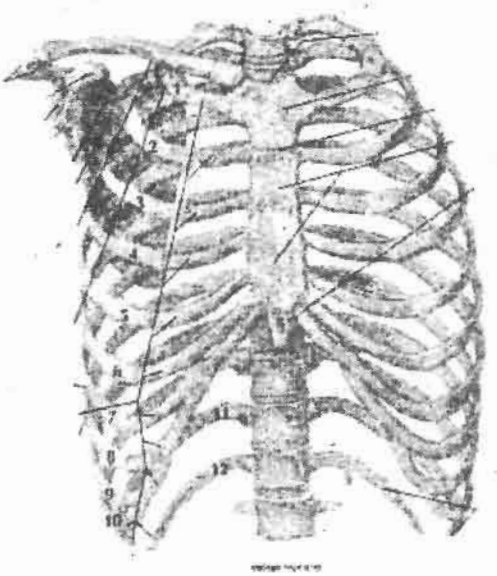

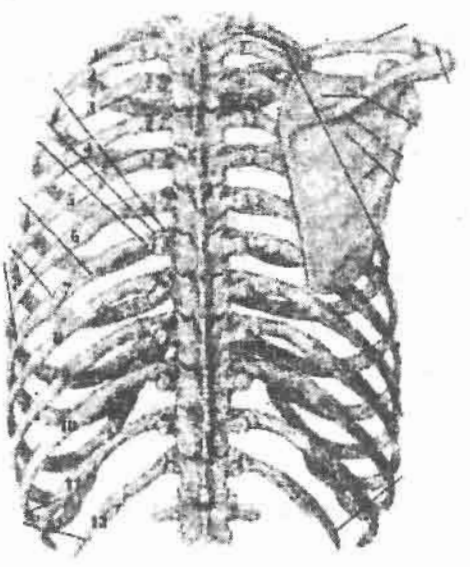

এগুলোকে প্রকৃত পর্শুকা বলে। বাকি ৫ জোড়া (৮ম-১২শ) স্টার্নামের সাথে যুক্ত নয় বলে নকল পর্শুকা বলে। ৮ম, ৯ম ও ১০ম পর্শুকা উপরস্থিত পর্শুকার তরুণাস্থির সাথে একীভূত হয়ে কোস্টাল আর্চ (Costal arch) নির্মাণ করে। ১১শ ও ১২শ পর্শুকা সামনে মাংশপেশিতে উন্মুক্ত থাকে। এগুলি সরল, ক্ষুদ্র এবং 'ভাসমান পর্শুকা' নামে অভিহিত। প্রকৃত কশেরুকার দৈর্ঘ্য উপর থেকে নিচে ক্রমশ বাড়তে থাকে, কিন্তু নকল পর্শুকার ক্ষেত্রে ঘটে উল্টো ঘটনা।

পর্শুকার অন্তর্তলের নিচের কিনারায় কোস্টাল খাদে স্নায়ু ও রক্তবাহিকা অবস্থান করে। প্রথম পর্শুকাজোড়ার উপরতলে পেশি সংযোজনের জন্য দুটি এবং সাবক্লাভিয়ান ধমনী ও শিরা ধারণের জন্য দুটি খাদ থাকে। বহিঃ ও অন্তঃ ইন্টারকোস্টাল পেশি প্রতি দুই কশেরুকার মধ্যে তির্যকভাবে বিন্যস্ত। উপরে ও নিচে দুই কোস্টাল তরুণাস্থির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে ইন্টারকোস্টাল স্পেস বলে।

বক্ষ পিঞ্জরের কাজ : হৃদপিন্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ বক্ষপিঞ্জরের ভেতরে সুরক্ষিত থাকে।

২। উপাঙ্গীয় কঙ্কাল ঃ

উধর্ষ্কাঙ্গ (দুইবাহু ও বক্ষ-অস্থিচক্র) ও নিম্নাঙ্গ (দুইপা ও শ্রোণী-অস্থিচক্র) এর অস্থিগুলোকে একত্রে উপাঙ্গীয় কঙ্কাল বলে।

উধর্ষ্কাঙ্গের অস্থিসমূহ ঃ

বক্ষ-অস্থিচক্র ও দুইবাহু নিয়ে উধর্ষ্কাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩২ টি করে মোট ৬৪ টি অস্থি উর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্গত। নিচে এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

বক্ষ অস্থি ও হাতের অস্থি ঃ

১) পিঠের ত্রিকোণাস্থি (Scapula), ২) কণ্ঠার অস্থি (Clavilce), ৩) উর্ধ্ব বাহুর অস্থি (Humarus), ৪) সম্মুখ বাহুর অস্থি (Radius & Ulna), ৫) কারপাল অস্থি (Carpal Bones), ৬) মেটা কারপাল অস্থি (Meta carpal Bones) এবং ৭) হাতের আঙুলের অস্থি (Phalanges)।

বক্ষ-অস্থিচক্র বা পেকটোরাল গার্ডল (Pectoral Girdle)

মানুষের বক্ষ-অস্থিচক্র ২ জোড়া অস্থি নিয়ে গঠিত, যথা-একজোড়া ক্লাভিক্‌ল ও একজোড়া স্কাপুলা। ক্ল্যাভিক্‌ল দেখতে ইটালিক *'f'* এর মত বাঁকা অস্থি। এটি একটি দেহ ও দুটি প্রান্ত, যথা স্টার্নাল প্রান্ত (স্টার্নামের ম্যানুব্রিয়ামে যুক্ত থাকে) এবং এক্রোমিয়াল প্রান্ত (স্ক্যাপুলায় যুক্ত থাকে) নিয়ে গঠিত।

স্ক্যাপুলা দেখতে চাপা ও ত্রিকোণাকার অস্থি। এর একটি সম্মুখ বা কোস্টাল তল (Costal Surface), একটি পশ্চাৎ তল বা কোরাকয়েড ও অ্যাক্রোমিয়ল প্রসেস এবং গ্লেনয়েড গহবর নামে একটি সংযোগী অবতল আছে।

সম্মুখ তল পর্শুকাগুলোর দিকে মুখ করে থাকে। এতে সাবস্ক্যাপুলার ফসা (Subscaspular fossa) নামে একটি অবতল অংশ আছে। পশ্চাৎ তল স্ক্যাপুলার কাঁটা (Spine of scapula) অস্থির পশ্চাৎ তলকে সুপ্রাস্পাইনাস (Supraspinous) ও ইনফ্রাস্পাইনাস (Infraspinous) ফসায় বিভক্ত করে। গ্লেনয়েড গহবরে হিউমেরাসের মস্তক আটকানো থাকে।

বাহুর অস্থি ঃ বাহুকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা উর্ধ্ববাহু, সম্মুখবাহু এবং হাতের অস্থি।

১) উর্ধ্ববাহুর অস্থি (হিউমেরাস) ঃ উর্ধ্ববাহু হিমেরাস নামে একটি লম্বা, নলাকার অস্থি দিয়ে গঠিত। এর উর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে মসৃণ, গোল মস্তক যা স্ক্যাপুলার গ্লেনয়েড গহবরে প্রবিষ্ট থাকে। তা ছাড়াও আছে ছোট ও বড় টিউবার্কল এবং এর মাঝখানে এনাটমিক গ্রীবা (Anatomic neck) নামে একটি খাঁজ।

টিউবার্কলের নিচে যে সরু অংশ থেকে হিউমেরাসের মূল দেহ গঠিত হয় তাকে সার্জিকাল গ্রীবা (Surgical neck) বলে (কারণ, দুর্ঘটনায় এ অংশেই সচরাচর ফাটিল ধরে)। মূল দেহের মধ্যভাগে পেশি সংযুক্তির জন্য খসখসে ডেলটয়েড রিজ (Deltoid ridge) রয়েছে। দেহের কিনারা নিম্নপ্রান্তে এসে এপিকন্ডাইল গঠন করে। এপিকন্ডাইলের মাঝে কন্ডাইল অবস্থিত যা উত্তল ক্যাপিচুলাম ও কপিকলের মতো ট্রকলিয়া নিয়ে গঠিত। সংযোগী তল হিসেবে এ প্রান্তে করনয়েড ও ওলেক্রেনন ফসাও থাকে।

২) সম্মুখবাহুর অস্থি ঃ সম্মুখবাহু দুটি লম্বা, নলাকার ও ঘনসংলগ্ন অস্থি নিয়ে গঠিত, যথা - আলনা ও রেডিয়াস।

অন্তর্ভাগের অস্থিটি আলনা। এর উর্ধ্বপ্রান্তে করনয়েড প্রসেস ও ওলেক্রেনন প্রসেস, একটি ট্রকলিয়ার নচ্ ও একটি টিউবারোসিটি (অর্বুদ) অবস্থিত। নিম্নপ্রান্তে মাথা ও স্টাইলয়েড প্রসেস এ বিভক্ত।

রেডিয়াসের উর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে একটি খাঁজসহ মাথা, গ্রিবা ও অর্বুদ এবং নিম্নপ্রান্তে কার্পাল অস্থির সংযোগী তল ও একটি স্টাইলয়েড প্রসেস।

উর্ধ্বপ্রান্তে রেডিয়াস ও আলনা এনুলার পেশিতে এবং বাকি অংশ এন্টিব্রাকিয়াল ঝিল্লি দিয়ে যুক্ত থাকে।

৩) হাতের অস্থি ঃ কব্জি, করতল ও আঙুল নিয়ে হাত গঠিত।

কব্জি ঃ দুই সারিতে ৪টি করে মোট ৮টি ছোট ছোট বিভিন্ন আকৃতির কার্পাল অস্থি দিয়ে কব্জি গঠিত। [গোড়ার দিকের সারিতে থাকে স্ক্যাফয়েড, লুনেট, ট্রাইকুয়েট্রাল ও পিসিফর্ম অস্থি, এবং প্রান্তের দিকে থাকে ট্র্যাপেজিয়াম, ট্র্যাপেজয়েড, ক্যাপিটেট ও হ্যামেট অস্থি।

করতল ঃ করতলের অস্থিকে মেটাকার্পাল বলে। মেটাকার্পাল অস্থির সংখ্যা ৫। এগুলি লম্বা ও নলাকার এবং একটি গোড়া, শ্যাফট ও মাথা নিয়ে গঠিত।

আঙুল ঃ আঙুলের অস্থিগুলোকে ফ্যালাঞ্জেস (একবচনে ফ্যালাংক্স) বলে। এগুলো খাটো ও নলাকার। বৃদ্ধাঙুলে ২টি এবং অন্য আঙ্গুলগুলোতে ৩টি করে ফ্যালাঞ্জেস থাকে।

নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ ঃ

শ্রেণি-অস্থিচক্র ও দুইপা নিয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩১টি করে মোট ৬২টি অস্থি নিম্নাঙ্গের অন্তর্গত। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

শ্রেণি অস্থি ও পায়ের অস্থি ঃ ১) বস্তি দেশের হাড় (Pelvis), ২) উরুর অস্থি (Femer), ৩) পায়ের দুইটি অস্থি (Tibia & fibula), ৪) টারসাল অস্থি (Tarsal bones), ৫) মেটাটারসাল অস্থি (Metatarsal bones) এবং ৬) পায়ের আঙ্গুলের অস্থি (Phalanges)।

শ্রোণী-অস্থিচক্র বা পেলভিক গার্ডল (Pelvic girdle) ঃ

এটি ইলিয়াম (Ilium) ইশ্চিয়াম (Ischium) ও পিউবিস (Pubis) অস্থি নিয়ে গঠিত। বয়স্ক মানবে এ অস্থিগুলো একত্রিত হয়ে নিতম্বাস্থি (Hip bone) গঠন করে। দুটি নিতম্বাস্থি একত্রে মিলে গঠিত হয় শ্রেণি-অস্তিচক্র। ইলিয়ামটি দেহ সম্মুখ সুপিরিয়র ও পশ্চাৎ সুপিরিয়র কাঁটা বলে। এদের নিচে থাকে সম্মুখ ইনফিরিয়র কাঁটা তা ছাড়াও ইলিয়ামে আর্কুয়েট রেখা, ইলিয়াক ফসা, ইলিয়াক ফসা গ্লুটিয়াল রেখা ও একটি অরিকুলার সংযোগী তল থাকে। পিউবিসটি দেহ ও দুটি শাখায় বিভক্ত। শাখা দুটিকে উর্ধ্ব ও নিম্ন র‍্যামি (একবচনে- র‍্যামাস) বলে। উর্ধ্ব র‍্যামাসে একটি পিউবিক অর্বুদ (টিউবারোসিটি) এবং একটি পিউবিক ঝুটি থাকে। ইশ্চিয়মাটি দেহ, উর্ধ্ব ও নিম্ন র‍্যামি, ইশ্চিয়াল অর্বুদ এবং ইশ্চিয়াল কাঁটা নিয়ে গঠিত। কাঁটাটি বড় ইশ্চিয়াল খাঁজকে ছোটটি থেকে পৃথক করেছে। পিউবিক ও ইশ্চিয়াল র‍্যামি অবটুরেটর ছিদ্রকে বেষ্টন করে রাখে। ছিদ্রটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে যোজক

কলার ঝিল্লিতে আবৃত। ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম ও পিউবিসের সংযোগস্থলে এসিটাবুলাম নামে একটি অগভীর অংশ রয়েছে এতে ফিমারের মস্তক আটকানো থাকে।

শ্রেণি-অস্থি চক্রের কাজ ঃ বস্তিকোটর, মূত্রাশয়, অন্ত্রের নিম্নাংশ প্রভৃতি অঙ্গে অবলম্বন দান করা, ভার বহন করা এবং সুরক্ষা করা শ্রেণিচক্রের কাজ। ফিমারের মস্তক এসিটাবুলাম (Acetabulum) এ যুক্ত থাকে।

কব্জি ও হাতের অস্থি

শ্রাণী অস্থি

পা -এর অস্থি ঃ মানুষের পা, উর্ধ্ব পা, নিম্ন পা ও চরণ নিয়ে গঠিত।

১) **উর্ধ্ব পা এর অস্থি ঃ** উর্ধ্ব পা এর অস্থিকে ফিমার বলে। এর উর্ধ্ব প্রান্তে একটি গোল মস্তক, গ্রীবা এবং ছোট ও বড় ট্রোক্যান্টার অবস্থিত। দেহটি শক্ত ও নলাকার। এর পশ্চাৎতল একটি অমসৃণ আলযুক্ত। নিম্নপ্রান্ত দুটি প্যাটেলার সংযোগী তল এবং দুপাশে একটি করে এপিকন্ডাইলার ছিদ্র, প্যাটেলার সংযোগী তল এবং দুইপাশে একটি করে এপিকন্ডাইল নামে সামান্য উঁচু জায়গা। ফিমারের প্রান্তে প্যাটেলা নামে একটি প্রায় ত্রিকোণাকার অস্থি অবস্থিত। প্যাটেলা একটি সিসামায়েড অস্থি, কারণ এর উৎপত্তি পেশির টেনডন থেকে। প্যাটেলা একটি পশ্চাৎভাগের উর্ধ্বংশ ফিমারের সাথে এবং নিম্নাংশ টিবিয়ার সাথে সংযুক্ত।

২) **নিম্ন পা এর অস্থি ঃ** নিম্ন পা এ দুটি অস্থি থাকে, যথা- টিবিয়া ও ফিবুলা। টিবিয়া বেশি মোটা এর উর্ধ্ব প্রান্ত দুটি কণ্ডাইল, একটি আন্তঃ কণ্ডাইলার স্ফীমারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য দুটি সংযোগী তল এবং পেশি সংযোজনের জন্য একটি টিউবারোসিটি বহন করে। টিবিয়ার দেহ ত্রিধারবিশিষ্ট। এর সম্মুখ কিনারা ঝুঁটি নামে পরিচিত। টিবিয়ার নিম্ন প্রান্তে ম্যালিওলাস নামে দুইপাশে উঁচু অংশ থাকে। এতে ট্যালাসের (টার্সাল অস্থি) সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সংযোগী তলও রয়েছে। ফিবুলা দেখতে একটি দীর্ঘ ষষ্টির মতো। এর মস্তক চোখা ধরনের। উর্ধ্বপ্রান্তে টিবিয়ার সংযোগের জন্য একটি সংযোগের জন্য একটি সংযোগী তল থাকে। নিচের প্রান্তে থাকে ম্যালিওলাস।

৩) **চরণ ঃ** গোড়লি, পদতল ও আঙুল নিয়ে চরণ গঠিত। গোড়ালি ও পদতলের পৃষ্ঠভাগ গঠিত হয় ৭টি বিভিন্ন আকৃতির টার্সাল অস্থি দিয়ে। এরা হলো একটি করে ক্যালকেনিয়াস, ট্যালাস, কিউবয়েড, নেভিকুলার ও ৩টি কিউনিফর্ম। মেটাটার্সালের সংখ্যা ৫। এগুলো নলাকার ও সামান্য লম্বা এবং পদতল গঠন করে। পায়ের আঙ্গুলের অস্থিগুলি ফ্যালাঞ্জেসে গঠিত। পা এর অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে সন্ধির মাধ্যমে যুক্ত। এদের মধ্যে নিতম্ব সন্ধি, হাটুর সন্ধি ও গোড়ালি সন্ধি সবচেয়ে বড়।

পায়ের কাজ ঃ পা দুটি প্রত্যক্ষভাবে ভারবহন করে ও চলাচলের সাথে জড়িত।

অস্থিসন্ধি (Joints)

যে স্থানে দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগ হয়, তাদের মধ্যে নড়াচড়া হলে অথবা না হলেও তাকে অস্থিসন্ধি বলে। অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে যোজক কলা দিয়ে এমনভাবে যুক্ত থাকে যাতে সংলগ্ন অস্থিগুলো বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চালিত হতে পারে। তাই দেখা যায়, কোন কোন অস্থিসন্ধি একেবারেই অনঢ়, যেমন- করোটির অস্থিসন্ধি; কোনটি আবার সামান্য সঞ্চালনক্ষম, যেমন- আন্তঃকশেরুকীয় অস্থিসন্ধি। কিছু সন্ধির ফলে অস্থিগুলি মুক্ত ও স্বচ্ছন্দে সঞ্চালনক্ষম হয়ে থাকে।

অস্থিসন্ধির শ্রেণিবিন্যাস :

অস্থিসন্ধি ৩ রকমের হয়ে থাকে, যথা- ক) তন্তুময় সন্ধি, খ) তরুণাস্থিময় সন্ধি এবং গ) সাইনোভিয়াল সন্ধি।

ক) **তন্তুময় সন্ধি** (Fibrous joints) ঃ দুটি সংলগ্ন অস্থি যখন তন্তুময় কলা দিয়ে পরস্পর দৃঢ় সংঘবদ্ধ থাকে ফলে ওদের মধ্যে খুব সামান্য সঞ্চালন ঘটে বা একেকারেই ঘটে না, তখন তাকে তন্তুময় অস্থিসন্ধি বলে। আকারের ভিত্তিতে তন্তুময় অস্থিসন্ধিকে নিম্নোক্ত তিনটি উপভাগে ভাগ করা যায় :

১) সুচার, ২) সিনডেসমোসিস, ৩) গমফোসিস ।

১) **সুচার** (Suture) ঃ এ ক্ষেত্রে দুটি অস্থি পরস্পরের সঙ্গে একটি ঘন তন্তুময় কলার পাতলা স্তর ও দাঁতকাটা প্রান্ত দিয়ে যুক্ত থাকে।

উদাহরণ:

- এ ধরনের সন্ধি কেবল করোটিকার অস্থিতে পাওয়া যায়।

২) **সিনডেসমোসিস** (Syndenmois) ঃ এ ক্ষেত্রে দুটি অস্থি ঘন তন্তুময় যোজক কলার রজ্জু বা পাত দিয়ে পরস্পর ঘনসংবদ্ধ থাকে।

উদাহরণ ঃ

- টিবিয়া ও ফিবুলার অস্থিসন্ধি এ ধরনের।

৩) **গমফোসিস** (Gomphosis) ঃ পাতলা তন্তুময় পেরিওডেন্টাল লিগামেন্টের সাহায্যে দাঁতের গোড়া যেভাবে কীলকের মতো চোয়ালের দন্তকোটরে আবদ্ধ থাকে, তাকে গমফোসিস বলে।

উদাহরণ ঃ

- এ সন্ধি কেবল দাঁত ও চোয়ালের মধ্যেই দেখা যায়।

খ) **তরুণাস্থিময় অস্থিসন্ধি** (Cartilaginous joints) ঃ যে অস্থিসন্ধিতে তরুণাস্থি দিয়ে দুইটি অস্থির সংযোগ হয়, তাকে তরুণাস্থিময় অস্থিসন্ধি বলে। তরুণাস্থির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এ ধরনের অস্তিসন্ধি নিম্নোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় : ১) সিমফাইসিস ও ২) সিনকোন্ড্রসিস।

১) **সিমফাইসিস** (Symphyses) ঃ এ ক্ষেত্রে অস্থিসন্ধিতে দুইটি অস্থি স্বচ্ছ ও তন্তুময় তরুণাস্থির মাধমে যুক্ত থাকে। উভয় অস্থির সংযোগস্থল স্বচ্ছ তরুণাস্থির পাতলা স্তরে আবৃত থাকে এবং এই দুই স্তরকে তন্তুময় তরুণাস্থি আবদ্ধ রাখে। তন্তুময় তরুণাস্থির স্থুলত্বের উপর নির্ভর করে এ ধরনের সন্ধিতে সীমিত সঞ্চালন ঘটে থাকে।

উদাহরণ ঃ

- শ্রোণিদেশে পিউবিক সিমফাইসিস (Pubic Symphyses)।
- দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী আন্তঃকশেরুকীয় চাকতি (Intervertebral disc)।

২) **সিনকন্ড্রোসিস** (Synchondroses) ঃ এ ক্ষেত্রে অস্থিসন্ধিতে স্বচ্ছ তরুণাস্থির একটি প্লেট দুটি অস্থিকে যুক্ত করে এবং সন্ধিটি প্রায় অসঞ্চালনক্ষম হয়।

উদাহরণ ঃ

- স্টার্নামের সংগে প্রথম পর্শুকার সন্ধি।
- মেনুব্রিয়াম ও স্টার্নাল দেহের সন্ধি।
- বর্ধনশীল লম্বা হাড়ের সন্ধি।

গ) সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি (Synovial joints) ঃ সাইনোভিয়াল গহবর সমন্বিত অস্থিসন্ধিকে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে। এ ক্ষেত্রে দুই অস্থির সংযোগী তল আর্টিকুলার তরুণাস্থি নামে মসৃণ, স্বচ্ছ তরুণাস্থির (Hyaline cartilage) পাতলা স্তরে আর্বত থাকে এবং গহক্ষর বেষ্টনকারী সাইনোভিয়াল ঝিল্লি (Synovial membrane) নিঃসৃত মিউকোপলিস্যাকারাইডে গঠিত সাইনোভিয়াম নামে চটচটে ও পিচ্ছিল তরলে মাখানো থাকে। সন্ধি গহবরটি আর্টিকুলার ক্যাপসুল নামে একটি দ্বিস্তরী ঝিল্লিতে বেষ্টিত। এর বাইরের স্তরটি কলাজেন তন্তুর শক্ত ঝিল্লি যা অস্থি সন্ধির উভয় পাশে অস্থির সংযোগী তলের সংগে সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত এবং পেরিঅস্টিয়ামের সংগে অবিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে, ভেতরের স্তরটি শিথিল যোজক কলায় নির্মিত সাইনোভিয়াল ঝিল্লি সমস্ত অন্তঃস্থ সংযোগীতল আবৃত করে রাখে।

সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধির শ্রেণিবিন্যাস

সংযোগকারী তলের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধিকে দুই প্রকারে ভাগ করা হয় ঃ
১) সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি ও ২) জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি।

১) সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি (Simple Synovial joints) ঃ যখন একটি সন্ধিতে দুটি মাত্র অস্থির বহির্ভাগ এসে মিলিত হয় তখন তাকে সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে।

উদাহরণ ঃ

- দুইটি ফ্যালাঞ্জেস এর মধ্যবর্তী অস্থিসন্ধি (Interphalangeal joints)।

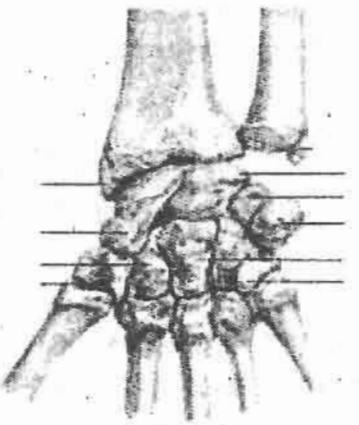

হাতের কব্জির সন্ধি (Wrist joint)

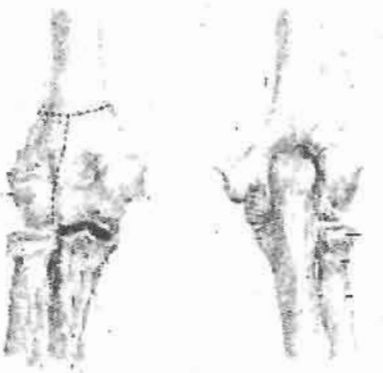

কনুই সন্ধি (Elbow joint)

২) জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি (Complex synovial joints) ঃ যখন দুয়ের বেশি অস্থি মিলিত হয় তখন একে জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে।

উদাহরণ ঃ

- গোড়ালির সন্ধি (Ankle joints)।
- হাঁটুর সন্ধি (Knee joints)।

সংযোগকারী তলের আকারের উপর ভিত্তি করে সানোভিয়াল অস্থিসন্ধিকে ৬ প্রকারে বিভক্ত করা যায় :

১) সমতল অস্থিসন্ধি, ২) হিঞ্জ অস্থিসন্ধি, ৩) পিভট অস্থিসন্ধি, ৪) কন্ডাইলয়েড অস্থিসন্ধি, ৫) স্যাড্‌ল অস্থিসন্ধি এবং ৬) বল ও কোটর অস্থিসন্ধি।

১) সমতল অস্থিসন্ধি (Plane joints) ঃ এক্ষেত্রে অস্থিসন্ধিতে দুটি অস্থির সংযোগী তল চাপা বা সামান্য বাঁকানো এবং অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় যে কোনো দিকে পিছলে সঞ্চালিত হয়।

উদাহরণ ঃ

- দুটি কার্পাল অস্থির মধ্যকার সংযোগ (Intercarpal joints)।
- দুটি মেটাটার্সাল অস্থির মধ্যকার সংযোগ (Intermetatarsal joints)।

২) হিঞ্জ (কব্জা) অস্থিসন্ধি (Hinge joints) ঃ এক্ষেত্রে একটি অস্থির উত্তল মস্তক অন্য অস্থির অবতল অংশে এমন চমৎকারভাবে বসানো থাকে যার ফলে অস্থির চলন শুধু দরজার কপাটের মতো একদিকে ঘটে।

উদাহরণঃ

- কনুইয়ের সন্ধি (Elbow joints)।
- হাঁটুর সন্ধি (Knee joints)।

৩) পিভট অস্থিসন্ধি (Pivot joints) ঃ এ ক্ষেত্রে একটি অস্থির গোল সুচালো বা কোণাকার সংযোগী তল এমন একটি রিং-এর ভেতর ঢোকানো থাকে যা অন্য একটি অস্থি ও লিগামেন্টের অংশ নিয়ে গঠিত এবং প্রবিষ্ট অস্থিটি কেবল ঘূর্ণনে সক্ষম হয়।

উদাহরণ ঃ

- প্রথম দুইটি গ্রীবা দেশীয় বা সারভাইকাল কশেরুকার মধ্যকার অস্থিসন্ধি (Atlanto-axial joint)।

৪) কন্ডাইলয়েড অস্থিসন্ধি (Condyloid joints) ঃ এ ক্ষেত্রে একটি অস্থির ডিম্বাকার মস্তক অন্য অস্থির ডিম্বাকার গহবরে ঢোকানো থাকে এবং যে কোনো তলে সঞ্চালনক্ষম হলেও ঘূর্ণনে অক্ষম থাকে।

উদাহরণ ঃ

- হাঁটুর সন্ধি (Knee joints)।

৫) স্যাডল বা জিন আকৃতির অস্থিসন্ধি ঃ এক্ষেত্রে এক অস্থির সংযোগী তলের একদিক উত্তল অন্যদিক অবতল এবং দ্বিতীয় অস্থির বৈশিষ্ট ঠিক তার বিপরীত। এই সন্ধিতে অস্থির বিভিন্নমুখী সঞ্চালন সম্ভব হলেও ঘূর্ণন অত্যন্ত সীমিত।

উদাহরণ ঃ

- বৃদ্ধাঙ্গুলের কার্পাল ও মেটাকার্পালের মধ্যকার সন্ধি (Carpometacarpal joint of the thumb)।

৬) বল ও কোটর অস্থিসন্ধি (Ball and socket joint) ঃ এক্ষেত্রে একটি অস্থির বলের মতো গোল মস্তক অন্য অস্থির পেয়ালাকৃতির গহবরে ঢোকানো থাকে এবং যে কোনো অক্ষে বা তলে তাদের সঞ্চালন ঘটে।

উদাহরণ ঃ

- স্কন্ধসন্ধি (Shoulder joints)।
- জঙ্ঘাসন্ধি (Hip joints)।

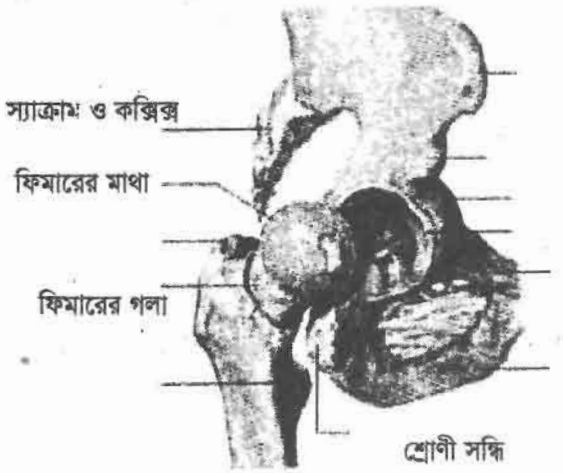

শ্রোণী সন্ধি (Hip joint)

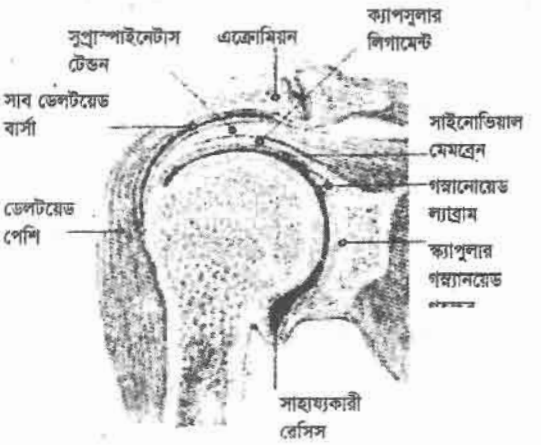

কাঁধের সন্ধি (Shoulder joint)

একটি আদর্শ অস্থি সন্ধির গঠন

একটি আদর্শ অস্থিসন্ধি নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত :

১। **অস্থিসন্ধির বহির্ভাগ** : অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্থিসন্ধির বহির্ভাগ স্বচ্ছ তরুণাস্থিতে (Hyaline cartilage) মোড়ানো থাকে।

২। **অস্থিসন্ধি আবরণী** : এ আবরণী সংযোগের মুখোমুখি দুই অস্থির মাঝখানে থাকে এবং তা অস্থিসন্ধির বহির্ভাগে থাকে ও সেখান থেকে অস্থি আবরণীতে মিলে যায়। অস্থিসন্ধি আবরণী দুটি অংশে বিভক্ত :- বাইরের দিকে কোলাজেন যুক্ত **তন্তুময় ঝিলিল্ল** এবং ভেতরের দিকে **সাইনোভিয়াল ঝিলিল্ল**।

৩। **অস্থিসন্ধি গহবর** : এ গহবর এমন এক সংকীর্ণ ফাঁকের মতো যা সন্ধির তরুনাস্থির বহির্ভাগ ও অস্থিসন্ধি আবরণী দিয়ে চারদিকে আবদ্ধ থাকে। এতে অস্থিসন্ধি আবরণীর সাইনোভিয়াল ঝিলিল্ল থেকে সামান্য তৈলাক্ত সাইনোভিয়াল রস নিঃসৃত হয়।

একটি আদর্শ সাইনোভিয়াল সন্ধি

বিভিন্ন সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির চিত্ররূপ

মানুষের চলনে পেশি ও অস্থিতন্ত্রের সমন্বয়

মানুষের চলনে পেশি ও পেশির সঙ্গে যুক্ত অস্থির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্থি দেহের অস্থিতন্ত্র (Skeletal system) গঠন করে দেহের কাঠামো দান করে। কাঠামোর উপরে আচ্ছাদন হিসেবে থাকে পেশিতন্ত্র (Muscular system)। এই পেশি ঐচ্ছিক পেশি হওয়ায় মানুষ দেহকে বা দেহের কোন উপাঙ্গকে ইচ্ছা মোতাবেক নড়াচড়া করাতে পারে। কন্ডরা বা টেন্ডন (Tendon) দিয়ে পেশি অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই কোনো অঙ্গকে যথেষ্ট নড়াচড়া করা বা স্থানান্তরে নেয়ার জন্য পেশি ও অস্থির সমন্বয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে পেশি–অস্থিতন্ত্র (Musculo-skeletal system) বলে।

মানুষের চলনে অস্থি ও পেশির ভূমিকা

মানুষের চলনে শুধু মাংসপেশীই নয় অস্থিতন্ত্রের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশি ও অস্থি সম্মিলিতভাবে মানুষকে চলতে সহায়তা করে। নিচে চলনে বিভিন্ন পেশির ভূমিকা উল্লেখ করা হলো।

১) **এক্সটেনসর** (Extensor) ঃ এ ধরনের পেশি অঙ্গকে প্রসারিত করে বা ছড়িয়ে দেয়। এ প্রক্রিয়াকে এক্সটেনসান বলে। যেমন – ট্রাইসেপস্ (Triceps) যা সম্মুখ বাহুকে প্রসারিত করে।

২) **ফ্লেক্সর** (Flexor) ঃ এ ধরনের পেশি অঙ্গকে দুই ভাঁজ করে, অর্থাৎ পেশির একাংশ অপর অংশের উপর দিকে বেঁকে যায়। এ পেশি ক্রিয়াকে ফ্লেক্সান (Flexion) বলে। যেমন- বাইসেপস্ (Biceps) যা কনুইকে বাঁকায়।

৩) **এবডাক্টর** (Abductor) ঃ এ পেশি দেহের অক্ষ থেকে দেহের অঙ্গকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এ পেশিক্রিয়াকে এবডাক্সান (Abuction) বলে। যেমন - ডেলটয়েড পেশি (Deltoid muscle)।

৪) **এডাক্টর** (Adductor) ঃ এ পেশি কোনো অঙ্গকে দেহ অক্ষের কাছে টেনে আনে। এ পেশিক্রিয়াকে এডাকসান (Adduction) বলে। যেমন - ল্যাটিসিমাস্ ডরসি (Latissimus dorsi)।

৫) **ডিপ্রেসর** (Depressor) ঃ এ পেশি কোনো অঙ্গকে নিচে নামায়। যেমন ঃ– ডিপ্রেসর ম্যানডিবুলা (Depressor mandibula) নামে পেশি নিচের চোয়াল নামিয়ে মুখগহবক্ষরকে উন্মুক্ত করে।

৬) **লিভেটর** (Levator) ঃ এটি ডিপ্রেসরের বিপরীত কাজ করে। অর্থাৎ কোনো অঙ্গকে নিচ থেকে উপরে তোলে। যেমন – ম্যাসেটার (Masseter) নিচের চোয়াল উপরে তুলে মুখ বন্ধ করে।

৭) **রোটেটর** (Rotator) ঃ এ পেশি অঙ্গকে প্রধান অক্ষের চারপাশে বা ডানে বাঁয়ে ঘোরায়। রোটেটর পেশির ক্রিয়াকে রোটেশান (Rotation) বলে। যেমন - পিরিফর্মিস (Pyriformis) ফিমারকে উপরে তোলে বা ঘোরায়। অঙ্কদেশীয় ঘূর্ণন সংক্রান্ত পেশিকে প্রোনেটর (Pronator) এবং পৃষ্ঠদেশীয় ঘুর্ণন সংক্রান্ত পেশিকে সুপিনেটর (Supinator) বলে।

৮) **প্রোট্র্যাক্টর** (Protractor) ঃ এ পেশি সংশ্লিষ্ট অস্থির (যেমন– ফিমার) মূলদেশকে উপর দিকে টেনে অঙ্গকে সামনে প্রসারিত হতে সাহায্য করে।

৯) **রিট্র্যাকটর** (Retractor) ঃ এ পেশি প্রোট্র্যাকটরের বিপরীত কাজ করে। ফলে একই অঙ্গ পেছনের দিকে প্রসারিত হয়।

মানুষের গমনে পেশি-অস্থিতন্ত্রের ভূমিকা ঃ

স্থানান্তরে যাওয়ার সময় মানুষ তার দেহের ভার পর্যায়ক্রমে ডান ও বাঁ পায়ের উপর ন্যস্ত করে। কারণ সেঁ সময় কোনো এক পা মাটির উপর উঠে থাকে। তখন মাটিতে লাগানো পা বা মেরুদন্ডের মধ্য দিয়ে অভিকর্ষ রেখা চলে যায়।

১) **দেহকে এগিয়ে নেয়া ঃ** গমনের প্রথম পর্যায়ে দেহের উর্ধ্বংশ কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে যায়, ফলে দেহের মধ্যে অভিকর্ষ রেখারও পরিবর্তন ঘটে। তখন গ্লুটিয়াস (নিতম্ব),কোয়াড্রিসেপস ফিমরিস (জঙ্ঘা) এবং গ্রাস্ট্রকনেমিয়াস ও সোলিয়াস (পায়ের) এবং ট্রাপিজিয়াস (কাঁধের পেশি) পেশিগুলি শিথিল হয়ে দেহের উর্ধ্বংশকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

২) **গোড়ালি উত্তোলন ঃ** দেহের অভিকর্ষ রেখা এগিয়ে যাওয়ায় গ্রাস্ট্রকনেমিয়াস ও সোলিয়াস সংকুচিত হয়ে বা পায়ের গোড়ালিকে মাটি থেকে উঠিয়ে আনে তখন বাম পায়ের পুরো ভার পায়ের আঙুলের উপর ন্যস্ত হয়।

৩) **মাটি থেকে পা উঠিয়ে আনা ও হাটু ভাঁজ ঃ** হ্যামস্ট্রিং ও গ্রাস্ট্রকনেমিয়াস পেশির সংকোচনে জানুসন্ধি ভাঁজ হলে বাম পা মাটি ছেড়ে পেছনের দিকে শুন্যে উঠে যায়।

৪) **নিতম্বের ভারসাম্য বজায় রাখা ঃ** বাম পা মাটির উপরে উঠে এলে দেহের সম্পূর্ণ ভার ডান পায়ের উপরে ন্যস্ত হয় এবং বাম পায়ের ভারে শরীর সামান্য বাম দিকে হেলে যায়। এ সময় পতন রোধের জন্য বাম (স্যাক্রোস্পাইনালিস) ও ডান দিকের পেশি (গ্লুটিয়াস মিডিয়াস ও গ্লুটিয়াস মিনিমাস) সংকুচিত হয়।

৫) **শ্রেণি-সন্ধি ভাঁজ ঃ** বাম পা মাটি থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইলিওসোয়াস ও রেক্টাস ফিমরিস পেশির সংকোচনে শ্রোণী-সন্ধি ভাঁজ হয়।

৬) **বাম পায়ের অগ্রগতি ঃ** উরুর সম্মুখ ভাগের পেশি কোয়াড্রিসেপস ফিমরিস সংকুচিত হলে জানুর প্রসারণ ঘটে এবং নিজস্ব পেশির (গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস) সংকোচনে বাম পা সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

৭) **মাটিতে বাম গোড়ালি প্রতিস্থাপন ঃ** বাম পায়ের পাতায় টিবিয়ালিস এন্টিরিয়র এবং এক্সটেনসর ডিজিটোরাম লঙ্গাস পেশির সংকোচনে প্রসারিত বাম পায়ের পাতা উপরের দিকে বেঁকে নামে এবং অভিকর্ষ বলের প্রভাবে প্রথম মাটির সংস্পর্শে আসে।

৮) **বাম পায়ের প্রতিস্থাপন ঃ** এর পর সোলিয়াস ও গ্যাস্ট্রকনেমিয়াস (গোড়ালীর পেশি) এবং ডিজিটোরাম লঙ্গাস (আঙ্গুলের পেশি)- এর সংকোচনে বাম পায়ের পাতা নিচের দিকে বেঁকে মাটি স্পর্শ করে। ফলে বাম পা সোজা হয় এবং দেহের উধর্ষ্কাংশের ভার আংশিক ভাবে বাম পায়ের উপরে এসে পড়ে।

৯) **ডান পায়ের চলন ঃ** এভাবে দেহের উর্ধ্বংশকে এগিয়ে নিয়ে পর্যায়ক্রমে বাম ও ডান পাকে ছন্দোবদ্ধভাবে উঠিয়ে পুনরায় সামনের মাটি স্পর্শ করে মানুষ স্থানান্তরে গমন করে।

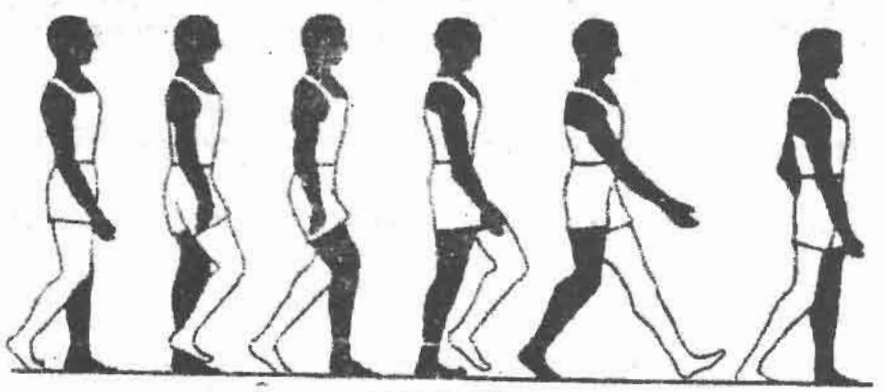

মানুষের চলা ফেরার পদ্ধতি

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অস্থি কাকে বলে?

২। মানবদেহে মোট কয়টি অস্থি আছে?

৩। সমগ্র অস্থিতন্ত্রকে প্রধান কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

৪। অক্ষীয় অস্থি বলতে কি বোঝ?

৫। উপাঙ্গীয় অস্থি বলতে কি বোঝ?

৬। করোটির কয়টি অস্থি আছে?

৭। মেরুদণ্ডে কয়টি অস্থি আছে?

৮। বক্ষপিঞ্জরের অস্থিগুলোর নাম কি?

৯। মানবদেহে বাহুতে কয়টি অস্থি আছে?

১০। মানবদেহে পায়ে কয়টি অস্থি আছে?

১১। অস্থি সন্ধি বলতে কি বোঝ?

১২। অস্থি সন্ধি কত প্রকার ও কি কি?

১৩। সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি বলতে কি বোঝ?

১৪। মানুষের চলনের জন্য কোন ধরনের পেশি কাজ করে?

১৫। পেশি–অস্থিতন্ত্র বলতে কি বুঝ?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। অস্থিতন্ত্রের কাজ বর্ণনা কর।

২। মানবদেহের ২০৬টি অস্থির নাম বর্ণনা কর।

৩। মেরুদণ্ডের অস্থিসমূহের নাম বর্ণনা কর।

৪। মানবদেহে বাহু ও পায়ের অস্থিসমূহের নাম বর্ণনা কর।

৫। সংযোগকারী আকার তলের আকারের উপর ভিত্তি করে সাইনোভিয়াল অস্থিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬। মানবদেহের বিভিন্ন চলনে বিভিন্ন পেশির ভূমিকা বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

রক্ত, রক্ত সংবহনতন্ত্র ও হৃদপিণ্ড

রক্ত ও রক্ত সংবহনতন্ত্র

রক্ত লাল বর্ণের অস্বচ্ছ আন্তঃকোষীয় বিশেষ ধরনের তরল যোজক কলা যার মধ্যে প্রধান দুটি অংশ আছে। একটি তরল রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma) ও তাতে ভাসমান থাকে রক্তকণিকা (Blood Corpuscles)।

রক্তের গুণাবলি

ক) রক্তের পরিমাপ : ৫-৬ লিটার।
খ) স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া : সামান্য ক্ষারীয়, P^H =৭.৩৬ -৭.৪৫
গ) আপেক্ষিক গুরুত্ব : ১.০৫২ হতে ১.০৬০ এর মধ্যে।
ঘ) রক্তের তাপমাত্রা : ৩৬° হতে ৩৮° সেলসিয়াস।
ঙ) স্বাদ : লবণাক্ত।
চ) বর্ণ : লাল; লোহিত কণিকায় লৌহ উপাদান হিমোগেস্নাবিনের উপস্থিতির জন্য রক্তের রং লাল হয়।

রক্তের কাজ :

- অক্সিজেন পরিবহণ : লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগেস্নাবিন ও পস্নাজমার মাধ্যমে রক্ত ফুসফুস (Lung) থেকে কলায় অক্সিজেন (O_2) বহন করে।
- কার্বন-ডাই-অক্সাইড : অন্তঃশ্বসনের ফলে সৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) কলা থেকে ফুসফুসে (Lung) পরিবহন করে।
- খাদ্যসার পরিবহণ : পরিপাককৃত খাদ্যসার অন্ত্র থেকে কলা ও কোষে পরিবহন করে।
- সঞ্চিত খাদ্য পরিবহন : দেহের বিভিন্ন সঞ্চয় ভান্ডার (যেমন-যকৃত) থেকে খাদ্যসার কলাকোষে বহন করে।
- হরমোন পরিবহণ : অন্তঃখরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোন দেহের প্রয়োজনে কোষে পরিবহন করে।
- দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ : অধিকতর সক্রিয় কলায় উৎপন্ন তাপ দেহের সর্বত্র রক্তের সাহায্যে বন্টনের ফলে শরীরের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে।
- জীবানু প্রতিরোধ : শ্বেত কণিকাগুলি ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) প্রক্রিয়ায় দেহে প্রবিষ্ট জীবানু গ্রাস করে ধক্ষংস করে।
- ক্ষত নিরাময় : ফাইব্রোব্লাষ্ট উৎপন্ন করে কলার ক্ষত নিরাময় করে।
- রক্তপাত প্রতিরোধ : তঞ্চন ধর্মের সহায়তায় রক্ত দেহের ক্ষতস্থান থেকে অস্বাভাবাবিক রক্তপাত বন্ধ করে।

রক্তের উপাদান

১) **রক্ত কণিকা** (Blood Corpuscles-45%)

রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ধরনের কোষকে রক্তকণিকা বলে। রক্তকণিকা প্রধানতঃ তিন প্রকার: ক) লোহিত রক্তকণিকা (Erythrocyte), খ) শ্বেত রক্তকণিকা (Leucocyte) ও গ) অনুচক্রিকা (Platelet)।

লোহিত রক্ত কণিকা (Erythrocyte) ঃ

গ্রীক শব্দ Erythros = লাল + Kytos = কোষ; এই দুইটি শব্দের সম্মিলিত উচ্চারণ হলো 'Erythrocyte'। মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা ক্ষুদ্র দ্বিঅবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন চাকটির মতো লাল রংয়ের কোষ। এতে হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। সুস্থ দেহে প্রতি

১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৫ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। হিমোগ্লোবিন সর্যূরশ্মির ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি (লাল ও সবুজ) অত্যাধিক শোষণ করে বলে এসব কণিকা লাল দেখায়। কণিকাগুলির ব্যাপক উপস্থিতির জন্য রক্তের রং গাড় লাল হয়।

আকার ঃ মানুষের পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা গোল, দ্বিঅবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো। এর কিনারা মসৃন এবং মধ্যাংশের চেয়ে পুরু। পরিণত কনিকা অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক।

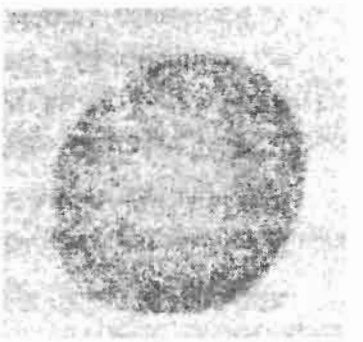

লোহিত কণিকা

আয়তন ঃ প্রত্যেক লোহিত রক্ত কণিকার গড় ব্যাস ৭.৩μ এবং গড় স্থুলতা ২.২μ।

সংখ্যা : বিভিন্ন বয়সের মানবদেহের প্রতিঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তণিকার সংখ্যা হচ্ছে ভ্রূণদেহে - ৮০-৯০ লক্ষ; শিশুর দেহে : ৬০-৭০ লক্ষ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষে : ৫০ লক্ষ; পুর্ণ বয়স্ক স্ত্রী দেহে - ৪৫ লক্ষ।

বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন– ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বেশি হয়। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ লক্ষের চেয়ে ২৫% কম হলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। কিন্তু এ সংখ্যা ৬৫ লক্ষের বেশি হলে তাকে পলিসাইথেমিয়া বলে।

উৎপত্তি স্থল ঃ ভ্রুণীয় জীবনে যকৃত, প্লীহা ও থাইমাস থেকে সৃষ্টি হয়। জন্মের পর ২০ বছর পর্যন্ত দেহের প্রায় সব লম্বা অস্থির অস্থিমজ্জার হেমোসাইটোব্লাষ্ট (Haemocytoblast) নামক কোষ থেকে এবং জীবনের বাকি সময় হিউমেরাস, ফিমার, স্টার্নাম, কশের"কা, পর্শুকা প্রভৃতি অস্থির শেষপ্রান্ত থেকে উৎপন্ন হয়।

আয়ু ঃ মানুষের লোহিত কণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন (অর্থাৎ ৪ মাস)।

লোহিত রক্ত কণিকার কাজ

- লোহিত কণিকার ভেতরকার হিমোগ্লোবিন শরীরের সবখানে অক্সিজেন (O_2) বহন করে।
- নিষ্কাশনের জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) কে কলা থেকে ফুসফুসে বহন করে।
- হিমোগ্লোবিন বাফার হিসেবে কাজ করে রক্তের সাধারণ ক্রিয়া বজায় রাখতে সাহায্য করে।

শ্বেত রক্ত কণিকা (Leucocyte) **ঃ** গ্রীক শব্দ Leucos = বর্ণহীন + Kytos = কোষ; এই শব্দ দুইটির সম্মিলিত উ"চারণ হলো Leucocyte। মানবদেহের পরিণত শ্বেতকণিকা হিমোগ্লোবিন বিহীন, অনিয়তাকার ও নিউক্লিয়াস যুক্ত বড় কোষ। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবানু ধক্ষংস করে।

আকার ঃ মানুষের শ্বেত রক্ত কণিকা নির্দিষ্ট আকারবিহীন, প্রয়োজনে আকার পরিবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াস প্রথমে গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কাকার ও অশ্বখুরাকার ধারণে করে। নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের চাপে একপ্রান্তে অবস্থান করে।

আয়তন ঃ এগুলি লোহিত রক্ত কণিকার চেয়ে বড়। এদের গড় ব্যস আকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ৭.৫μ-২০μ।

সংখ্যা ঃ মানবদেহের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে সংখ্যা বেড়ে যায়। লোহিত রক্ত কণিকা ও শ্বেত রক্ত কণিকার অনুপাত ৭০০ ঃ ১।

গঠন ঃ শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিওপ্রোটিনসমৃদ্ধ এবং গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, এসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে।

আকৃতি ও গঠনগতভাবে শ্বেতরক্তকণিকাকে প্রধান দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা -

ক) এগ্র্যানুলোসাইট (দানাহীন, Aagranulocytes) এবং

খ) গ্র্যানুলোসাইট (দানাময়, Granulocytes)।

ক) **এগ্র্যানুলোসাইট ঃ** এ ধরনের লিউকোসাইট দানাহীন, স্বচ্ছ ও বৃহদাকার নিউক্লিয়াসযুক্ত। আকৃতিগতভাবে এরা দুই ধরনের, যথা- লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) ও মনোসাইট (Monocyte)। এদের উৎপত্তি লসিকা গ্রন্থি, প্লীহা, থাইমাস ও ক্ষুদ্রান্ত্রের লসিকা কলা থেকে।

লিম্ফোসাইটগুলি সমসত্ব ও ক্ষারাসক্ত সাইটোপ্লাজোমের পাতলা স্তরে আবৃত বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ছোট কণিকা। এরা কৈশিক নালী থেকে যোজক কলায় অভিযাত্রী হতে পারে।

মনোসাইটগুলি বিপুল পরিমাণ সাইটোপ্লাজম ও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবাহী বড় কণিকা।

লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট রক্ত কণিকার কাজ :

- লিম্ফোসাইট এন্টিবডি উৎপন্ন করে।
- লিম্ফোসাইট থেকে ফাইব্রোব্লাস্ট সৃষ্টি হয়ে কলার ক্ষয়পুরণ করে।
- মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধক্ষংশ করে।
- উভয়েই প্লাজমা প্রোটিন থেকে ট্রিফোন নামক কলাকোষের পুষ্টিকারক পদার্থ উৎপন্ন করে।

লিম্ফোসাইট

মনোসাইট

খ) গ্রানুলোসাইট ঃ -এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ দানাময় এবং ২-৭ খন্ডযুক্ত নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। দানাগুলি লিশম্যান রঞ্জকে নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণধারার ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রানুলোসাইট ৩ ধরনের, যথা :-

নিউট্রোফিল (Neutrophil) ঃ নিউট্রোফিল এর সাইটোপ্লাজম বর্ণ নিরপেক্ষ দানাযুক্ত।
ইওসিনোফিল (Eosinophil) ঃ ইওসিনোফিল এর দানাগুলি ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণধারণ করে।
বেসোফিল (Basophil) ঃ বেসোফিল এর দানাগুলি ক্ষারাসক্ত হয়ে নীল বর্ণ ধারণ করে

নিউট্রোফিল

ইওসিনোফিল

ব্যাসোফিল

নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল কণিকার কাজ

- নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইট্রোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ভক্ষণ করে।
- ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নিঃসৃত করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- বেসোফিল নিসৃত হেপারিন রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতর জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

থ্রম্বোসাইট বা অনুচক্রিকা (Thrombocytes or platelets) :
থ্রম্বোসাইট ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা। এটি গোল, ডিম্বাকার বা রডের মতো, দানাময় কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন।

আকার ঃ থ্রম্বোসাইট দেখতে গোল, ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন।
আয়তন ঃ থ্রম্বোসাইট প্রায় ৩μ ব্যাস বিশিষ্ট, তবে ৪-৫μ ব্যাস সম্পন্ন বড় আকারের থ্রম্বোসাইট ও দেখা যায়।

থ্রম্বোসাইট

সংখ্যা ঃ পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে থ্রম্বোসাইটের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ। অসুস্থ দেহে এদের সংখ্যা আরও বেশি হয়।

গঠন ঃ প্রতিটি থ্রম্বোসাইট দানাময় সাইটোপ্লাজম, গহ্বর, পিনোসাইটিক গহ্বর ও অন্যান্য কোষ অঙ্গাণুবিশিষ্ট এবং একক ঝিল্লিতে আবৃত। থ্রম্বোসাইটে প্রোটিন ও প্রচুর পরিমাণ সেফালিন নামক ফসফোলিপিড থাকে।
উৎপত্তি স্থল ঃ থ্রম্বোসাইটের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোনো বিজ্ঞানীর মতে, লাল অস্থিমজ্জার বড় মেগাক্যারিওসাইট (Megakaryocyte) এর ভঙ্গুর ক্ষণপদ থেকে এদের উৎপত্তি হয়। অন্যদের মতে শ্বেত কণিকা থেকে থ্রম্বোসাইটের সৃষ্টি হয়।

আয়ু ঃ থ্রম্বোসাইটের গড় আয়ু প্রায় ৫-১০দিন ।

পরিণতি ঃ আয়ু শেষ হলে থ্রম্বোসাইট প্লীহা ও অন্যান্য রেটিনাকুলো–এন্ডোথেলিয়াল কোষে বিনষ্ট হয়।

অণুচক্রিকার কাজ

- রক্ত জমাট বাঁধতে অংশ নেয়।
- রক্তজালিকার ক্ষতিগ্রস্থ এণ্ডোথেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠনে অংশ নেয়।
- বিভিন্ন সংকোচনধর্মী পদার্থ ক্ষরণের মাধ্যমে রক্তবাহিকার সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত বন্ধে সাহায্য করে।

এরিথ্রোসাইট, লিউকোসাইট এবং থ্রম্বোসাইট-এর মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	এডরিথ্রোসাইট	লিউকোসাইট	থ্রোম্বোসাইট
সংখ্যা	১। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৫০ লক্ষ।	১। প্রতি কিউপিক মিলিমিটার রক্তে ৫–৮ হাজার।	১। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে আড়াই লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ।
নিউক্লিয়াস	২। প্রাথমিক ভাবে নিউক্লিয়াস থাকলেও হিমোগোবিন সঞ্চিত হবার পর নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয়।	২। সব সময় নিউক্লয়াস থাকে।	২। কোনো সময়ই নিউক্লিয়াস থাকে না।
বর্ণ	৩। সাইটোপাজমে হিমোগাবিন থাকায় এগুলিকে লাল বর্ণের দেখায় ।	৩। সাইটোপাজমে হিমোগাবিন না থাকায় এরা বর্ণহীন।	৩। বর্ণহীন ।
আয়ু	৪। ১২০ দিন ।	৪। সঠিক জানা যায়নি।	৪। ৫–৯ দিন ।
আকৃতি	৫। দ্বি–অবতল, চাকতির মতো।	৫। গোলাকার বা অনিয়ত।	৫। অনিয়ত আকৃতির।
কাজ	৬। দ্বি–অবতল, চাকতির মতো।	৬। রোগ প্রতিরোধ।	৬। রক্ত তঞ্চন।

২) **রক্তরস** (Plasma 55)

রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশকে রক্তরস বলে। এতে রয়েছে-

ক) পানির পরিমাণ - ৯১ থেকে ৯২%।

খ) দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ - ৮ থেকে ৯%।

গ) জৈব পদার্থ - ৭.১ থেকে ৮.১%। যেমন- গম্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, লবন, ভিটামিন ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, বিলিরুবিন, কেরোটিন ইত্যাদি।

ঘ) অজৈব পদার্থ - ০.৯%। যেমন- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি।

রক্ত রসের কাজ

- পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গে বাহিত হয়।
- কলা থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়।
- কলার অধিকাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্ত রসে বাইকার্বনেট রুপে দ্রবীভুত থাকে।
- অতি অল্প পরিমান অক্সিজেন এতে বাহিত হয়। লোহিত কণিকায় সংবদ্ধ হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়।
- হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অজো বহন করে।
- রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

রক্ত জমাট বাঁধার পদ্ধতি

দেহের ক্ষতস্থানে রক্ত বাহিকা থেকে তরল রক্ত বেরিয়ে ঘন জেলীর মতো থকথকে পিণ্ডে পরিণত হলে, তাকে রক্তজমাট (Clot) বলে। রক্তরস থেকে রক্তজমাটের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকে রক্তের জমাট বাঁধা বলে। রক্ত ঘাটতির হাত থেকে রক্ষা পেতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া মানুষের এক গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা। রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া ১৩টি ফ্যাক্টর (Factor) -এর সমন্বয়ে কয়েকটি ক্রমান্বয়িক ধাপে সংঘটিত হয়। নিচে রক্ত জমাট বাঁধার প্রধান ধাপগুলির বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১) আঘাতের ফলে ক্ষতস্থানে ক্ষতিগ্রস্থ কলা বা বিদীর্ণ থ্রম্বোসাইট থেকে থ্রম্বোপ্লাস্টিন নামক এনজাইম বের হয়।

২) থ্রম্বোপ্লাস্টিন ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রম্বিনকে সক্রিয় থ্রম্বিন এনজাইমে পরিণত করে।

৩) থ্রম্বিন ফিব্রিনোজেনকে প্রথমে ফিব্রিন মনোমার ও পরে ফিব্রিন পলিমার এবং সর্বশেষে ফিব্রিন নামে জালকের মত বস্তুতে রূপান্তরিত করে।

৪) ফিব্রিন জালকে লোহিত ও শ্বেত কণিকা জড়িয়ে যায় এবং কোষজাত উপাদানগুলি এবং রক্তের তরল অংশ আটকে থাকে, ফলে রক্ত জমাট বেধে যায়।

মানুষের বল্লাডগ্রুপ

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে বিভিন্ন এন্টিজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণি বিন্যাসকে ব্লাড গ্রুপ বলে। অস্ট্রিয়ায় জন্ম গহণকারী আমেরিকান জীববিজ্ঞানী কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার (Karl landsteiner) ১৯০১ সালে মানুষের রক্তের শেণিবিন্যাস করেন। রক্তকণিকায় কতকগুলো এন্টিজেন (Antigen) -এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী ল্যাণ্ডস্টেইনার মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিণ্যাস করেন, তা a, b,o ব্লাড গ্রুপ বা সংক্ষেপে ব্লাডগ্রুপ (Blood group) নামে পরিচিত। অনেক সময় একে ল্যাণ্ডস্টেইনার এর ব্লাডগ্রুপও (Landsteiner blood group) বলে। বিজ্ঞানীদের প্রচণ্ড আগ্রহের ফলে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আরও ১৩টি ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কৃত হয়।

এন্টিজেন ও এন্টিবডি

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে অবস্থিত মিউকোপলিস্যাকরাইড জাতীয় পদার্থ যা এন্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায়, তাকে এন্টিজেন বলে। যে সব এন্টিজেনের কারণে এন্টিজেন-এন্টিবডি ক্রিয়ায় লোহিত রক্ত কণিকাগুলি গুচ্ছবদ্ধ হয়ে যায়, সেগুলিকে এগ্লুটিনোজেন বলে।

এন্টিবডি হচ্ছে বহিরাগত পদার্থের প্রতি অর্থাৎ (এন্টিজেনের প্রতি) সাড়া দিয়ে প্লাজমা-কোষ (B-লিম্ফোসাইট) থেকে উৎপন্ন প্রোটিনধর্মী পদার্থ যা এর সমধর্মী এন্টিজেনের সংগে সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাকে (এন্টিজেনকে) নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে। এন্টিবডি থাকে ইম্যুনোগ্লোবিউলিনের (প্লাজমা প্রেটিন) অংশ রুপে। অধিকাংশ ব্লাড গ্রুপ এন্টিবডির ইম্যুনোগ্লোবিউলিন G (IgG) বা M (IgM) কখনও কখনও A (IgA) অণুতে পাওয়া যায়। যে এন্টিবডির সঙ্গে এন্টিজেনের বিক্রিয়ায় রক্তকণিকা জমাট বেধে যায় তাকে এগ্লুটিনিন বলে।

মানুষের রক্তে A ও B এই দুই রকম এন্টিজেন হতে পারে। এন্টিজেন A ও B -এর সাথে রক্তরসে কতকগুলি স্বতঃস্ফুর্ত এন্টিবডি রয়েছে। এদের বলে á (বা anti-A) এবং (â anti-B)। এভাবে এন্টিজেন ও এন্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা যায়, যথা- A, B, AB ও O।

নিচের তালিকায় ব্লাড গ্রুপের জিনোটাইপ ও এন্টিজেন এবং এন্টিবডির সম্পর্ক দেখানো হলো।

ব্লাড গ্রুপের জিনোটাইপ, এন্টিজেন ও এন্টিবডির সম্পর্ক

বাড গ্রুপ	জিনোটাইপ	এন্টিজেন (লোহিত কণিকায়)	এন্টিবডি (রক্তরসে)
A	AA, Ai	A	² (anti-B)
B	BB, Bi	B	(anti -A)
AB	AB	A, B	নেই
O	ii	নেই	ও (anti-A, anti-B)

উপরের ছক থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট ব্যক্তির রক্তে যে এন্টিজেন নেই, শুধু সেই এন্টিবডি সেখানে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ A ব্লাড গ্রুপে A এন্টিজেন, B ব্লাড গ্রুপে B এন্টিজেন এবং AB ব্লাড গ্রুপে A ও B উভয় এন্টিজেন থাকে। O ব্লাড গ্রুপে রক্তের কণিকা ঝিল্লিতে কোনো এন্টিজেন নেই কিন্তু রক্তরসে á ও â দুইরকম এন্টিবডি থাকে।

A MÖ"পের রক্তের এন্টিবডি B রক্তগ্রুপের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। অনুরুপভাবে, B গ্রুপের রক্তের এন্টিবডি A গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। কিন্তু AB গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তকে জমাতে পারে না, কারণ সেখানে কোন এন্টিবডি নাই। একই কারণে O গ্রুপের রক্ত নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য ৩টি গ্রুপের রক্তকে জমিয়ে দেয়। অর্থাৎ কারও দেহে O গ্রুপের রক্ত থাকলে সে কেবল O গ্রুপের রক্ত নিতে পারবে কিন্তু দেওয়ার সময় সব গ্রুপের রক্ত দিতে পারবে।

নিচে নির্ভরযোগ্য রক্তদাতা ও গ্রহীতার তালিকা দেওয়া হলো।

নির্ভরযোগ্য রক্তদাতা ও গ্রহীতার তালিকা

দাতার রক্ত গ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে	যে গ্রুপের রক্ত নিতে পারে
A	A ও AB	A ও O
B	B ও AB	B ও O
AB	AB	A, B, AB ও O
O	A, B, AB ও O	O

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, A ব্লাড গ্রুপের দাতা A ও AB রক্তের গ্রহীতাকে রক্ত দিতে পারে। তেমনি B ব্লাড গ্রুপের দাতা B ও AB রক্তের গ্রহীতাকে রক্ত দিতে পারে। AB ব্লাড গ্রুপের গ্রহীতাকে A, B, AB ও O অর্থাৎ যে কোনো গ্রুপের রক্ত দেওয়া যায়। এ কারণে AB MÖ"পের রক্তকে সার্বজনীন গ্রহীতা (Universal receipient) বলে। তেমনি O গ্রুপের রক্ত যে কেউ নিতে পারে, তার জন্য কোন পরীক্ষার দরকার হয় না অর্থাৎ O গ্রুপের রক্তকে সার্বজনীন দাতা (Universal donor) বলে।

সার্বজনীন দাতা ও সার্বজনীন গ্রহীতার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	সার্বজনীন দাতা	সার্বজনীন গ্রহীতা
১) রক্ত দানে সামর্থ।	১) সব বাড গ্রুপভুক্তকে।	১) কেবল নিজ বাড গ্রুপভুক্তকে।
২) রক্ত গ্রহণে সামর্থ।	২) কেবল নিজ বাড গ্রুপভুক্ত থেকে।	২) সব বাড গ্রুপভুক্ত দাতা থেকে।
৩) অ্যান্টিজেন।	৩) নেই।	৩) A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে।
৪) অ্যান্টিবডি।	৪) দুরকম থাকে।	৪) নেই।
৫) কোন বাড গ্রুপ।	৫) O বাড গ্রুপ।	৫) AB বাড গ্রুপ।

রক্ত সঞ্চারণ (Transfusion)

রক্তপাত, রক্তাল্পতা, শল্যচিকিৎসা প্রভৃতি নানা কারণে কোনো ব্যক্তির দেহে রক্তের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে কমে গেলে তার ক্ষয়পুরণে অন্য ব্যক্তির রক্ত সরাসরি বা ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করে রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। যে প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তির শিরার মধ্য দিয়ে বাহির থেকে শরীরে রক্ত প্রবেশ করনো হয়, তাকে রক্ত সঞ্চারণ বলে।

রক্ত সঞ্চারণকালে দাতা ও গ্রহীতার ব্লাড গ্রুপ ভাল করে পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। তা না হলে নানা বিপদের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন-

১) রক্তকণিকাগুলি একত্রে জমাট বেঁধে যাবে এবং বিশ্লিষ্ট হবে।
২) প্রস্রাবের সাথে হিমোগ্লোবিন নির্গত হবে।
৩) হিমোগ্লোবিন বৃক্কে জমে ইউরোমিয়া রোগ সৃষ্টি করে বৃক্কের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাবে।
৪) জণ্ডিসের প্রাদুর্ভাব হবে।
৫) নানা প্রকার আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া শেষে রোগীর মৃত্যু ঘটাবে।

রক্ত সঞ্চারণকালে শুধু ব্লাড নয় রক্তের Rh-factor নির্ণয় এবং রক্তজীবাণুর উপস্থিতি সম্বন্ধেও পরীক্ষা করা উচিত। আপদকালীন রক্ত সঞ্চারণকালে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের শ্রেণিবিভাগ না জানা থাকলে O এবং Rh নেগেটিভ রক্ত সঞ্চারণ করাই শ্রেয়।

Rh ফ্যাক্টর

১৯৪০ সালে কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার এবং উইনার (Karl Landsteiner and Wiener D.B→ 2002, 2004) রেসাস বানরের (Macaca mulatta) রক্ত খরগোসের শরীরে প্রবেশ করিয়ে খরগোসের রক্তরসে এক ধরনের এন্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম হন। এ এন্টিবডি অধিকাংশ শ্বেতকায় ব্যক্তির লোহিত কণিকাকে পিণ্ডে পরিণত করতে সক্ষম। এ ফলাফল থেকে বিজ্ঞানী দুজন ধারণা করেন যে মানুষের লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে রেসাস বানরের লোহিত কণিকার ঝিল্লির মতো এক প্রকার এন্টিজেন রয়েছে। রেসাস বানরের নাম অনুসারে ঐ এন্টিজেনকে রেসাস ফ্যাক্টর (Rhesus factor) বা সংক্ষেপে Rh factor বলে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শ্বেতকায় ব্যক্তিদের প্রায় ৮৫%, ভারত, শ্রীলংকা, চীন, জাপান ও আফ্রিকায় ৯৫% ব্যক্তির লোহিত কণিকায় এ জাতীয় এন্টিজেন রয়েছে। কিন্তু রক্তরসে এর সমধর্মী কোনো এন্টিবডি নেই।

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে Rh ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে Rh ব্লাড গ্রুপ বলে। Rh ফ্যাক্টরবিশিষ্ট রক্তকে Rh^+ (Rh পজিটিভ) এবং Rh ফ্যাক্টরবিহীন রক্তকে Rh^- (Rh নেগেটিভ) রক্ত বলে।

Rh ফ্যাক্টর মোট ৬টি সাধারণ এন্টিজেনের সমষ্টিবিশেষ। এদের ৩ জোড়ায় ভাগ করা যায়, যেমন- C, c; D, d; ও E,e। এদের মধ্যে C, D, E হচ্ছে মেণ্ডলীয় প্রকট এবং c, d. e হচ্ছে মেণ্ডেলীয় প্রচ্ছন্ন। মানুষের লোহিত কণিকায় একসঙ্গে ৩টি এন্টিজেন থাকে। কিন্তু প্রতি জোড়ার দুইটি উপাদান কখনও একসাথে থাকে না, যেমন- CDE, CDe, cDE এমন সন্নিবেশ সম্ভব, CDd অসম্ভব। মেণ্ডেলীয় প্রকট এন্টিজেন (C, D, E) যে রক্তে থাকে তাকে Rh^+ রক্ত বলে। প্রত্যেক Rh^+ রক্তে D থাকতে বাধ্য। যে রক্তে মেণ্ডেলীর প্রচ্ছন্ন এন্টিজেন (c, d, e) থাকে তাকে Rh^- রক্ত বলে।

Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব

১) সঞ্চারণজণিত গুরুত্ব : Rh^- রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির রক্তে Rh^+ বিশিষ্ট রক্ত দিলে প্রথমবার গ্রহীতার দেহে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু গ্রহীতার রক্তরসে ক্রমশ Rh^- এন্টিজেনের বিপরীত এন্টিবডি উৎপন্ন হবে। এই এন্টিবডিকে এন্টি Rh ফ্যাক্টর বলে। গ্রহীতা যদি দ্বিতীয়বার দাতার Rh^+ রক্ত গ্রহণ করে তা হলে গ্রহীতার

রক্তরসের এন্টি Rh ফ্যাক্টরের প্রভাবে দাতার লোহিত রক্তকণিকা জমাট বেঁধে পিণ্ডে পরিণত হবে। তবে একবার সঞ্চারণের পর যদি গ্রহীতা আর ঐ রক্ত গ্রহণ না করে তা হলে ধীরে ধীরে তার রক্তে উৎপন্ন সমস্ত এন্টি Rh ফ্যাক্টর নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়।

২) গর্ভাবস্থায় ঃ সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন Rh^- (Rh নেগেটিভ) মহিলার সঙ্গে Rh^+ (Rh পজিটিভ) পুরুষের বিয়ে হলে তাদের প্রথম সন্তান হবে Rh^+, কারণ Rh^+ একটি প্রকট বৈশিষ্ট। ভ্রূণ অবস্থায় সন্তানের Rh^+ ফ্যাক্টরযুক্ত লোহিত কণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্তে এসে পৌছাবে, ফলে মায়ের রক্ত Rh^- হওয়ায় তার রক্তরসে এন্টি Rh ফ্যাক্টর (এন্টিবডি) উৎপন্ন হবে।

এন্টি Rh ফ্যাক্টর মায়ের রক্ত থেকে আমরার মাধ্যমে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করলে ভ্রূণের লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে, ভ্রূণও বিনষ্ট হয় এবং গর্ভপাত ঘটে। এ অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচণ্ড রক্তাল্পতা এবং জন্মের পর জণ্ডিস রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থাকে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (Erythroblastosis foetalis) বলে। যেহেতু Rh বিরোধী এন্টিবডি মাতৃদেহে খুব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় তাই প্রথম সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সুস্থই জন্মায়। কিন্তু পরবর্তী গর্ভধারণ থেকে বিপত্তি শুরু হয় এবং ভ্রূণ এ রোগে ভূগে মারা যায়। তাই বিয়ের আগে হবু বর-কণের রক্ত পরীক্ষা করে নেয়া উচিত এবং একই Rh ফ্যাক্টরভুক্ত (হয় Rh^+ নয়তো, Rh^-) দম্পতি হওয়া উচিত।

রক্ত বাহিকা (Blood vessels)

যে সব নালিকার মাধ্যমে রক্ত সংবহিত হয়, অর্থাৎ রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে, সেগুলিকে রক্ত বাহিকা বলে।

আকার- আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে বাহিকা তিন রকম, যথা- ধমনী, শিরা ও কৈশিক জালিকা।

১) ধমনী (Artery) ঃ যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয়, তাকে ধমনী বলে। (এক্ষেত্রে পালমোনারী ধমনী ব্যতিক্রম। এটি অক্সিজেন (O_2) সমৃদ্ধ রক্তকে হৃদপিণ্ড থেকে ফুসফুসে পৌছে দেয়)। ধমনীপ্রাচীর তিনস্তর বিশিষ্ট, যথা-

ক) যোজক কলায় গঠিত বাইরের স্তর টিউনিকা এডভেনটিসিয়া বা টিউনিকা এক্সটার্না (Tunica adventitia or tunica external);

খ) পেশীতন্তু নির্মিত মাঝের স্তর টিউনিকা মিডিয়া (Tunica media); এবং

গ) এপ্রোথেলিয়ামে গঠিত অন্তঃস্তর টিউনিকা ইন্টিমা (Tunica intima)। ধমনী প্রাচীর বেশ পুরু, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক।

ধমনী ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৈশিকজালিকা-য় সমাপ্ত হয়। এভাবে, ধমনী হৃদপিণ্ড থেকে শুরু হয় এবং কৈশিকজালিকায় শেষ হয়।

২) শিরা (Vein) ঃ যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত কার্বন-ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃদপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে, তাকে শিরা বলে। (এক্ষেত্রে পালমোনারী শিরা ব্যতিক্রম। এটি ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডে নিয়ে আসে)। শিরাপ্রাচীর ধমনীর অনুরূপ ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা ও নরম কিন্তু স্থিতিস্থাপক নয়। এদের লুমেন বড়। ধমনী প্রান্তের কৈশিকজালিকাগুলি ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা ও পরে বড় শিরা গঠন করে। এভাবে শিরা কৈশিকজালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃদপিণ্ডে শেষ হয়।

৩) কৈশিকজালিকা (Capillary) ঃ শুধুমাত্র একস্তর বিশিষ্ট এপ্থোথেলিয়ামে গঠিত সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রক্তবাহিকা যা প্রশাখা-ধমনী ও শিরার সংযোগস্থলে জালিকাকারে বিন্যস্ত, তাদের কৈশিক জালিকা বলে। কৈশিক জালিকার রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপক ক্রিয়ায় খাদ্যসার, শ্বসনবায়ু, রেচন দ্রব্য ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।

ধমনী ও শিরার মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ধমনী	শিরা
১) উৎপত্তি ও সমাপ্তি	হৃদপিণ্ডে উৎপন্ন হয়ে দেহের কৈশিক নালীতে সমাপ্ত হয়।	কৈশিকনালী থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃদপিণ্ডে সমাপ্ত হয়।
২) রক্ত প্রবাহের দিক	হৃদপিণ্ড থেকে দেহের দিকে পরিবহন করে।	দেহ থেকে হৃদপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে।
৩) অন্যান্য রক্তের প্রকৃতি	পালমোনারী ধমনী ছাড়া সকলেই O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহণ করে।	পালমোনারী শিরা ছাড়া সকলেই O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।
৪) প্রাচীর	বেশ পুরু ও স্থিতিস্থাপক।	কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক।
৫) লুমেন (গহবর)	লুমেন ছোট।	লুমেন বেশ বড়।
৬) কপাটিকা	কপাটিকা থাকে না।	সেমিলুনার কপাটিকার মতো কপাটিকা থাকে।
৭) অবস্থান	প্রধানত দেহের গভীর অংশে বিস্তৃত থাকে।	দেহের পরিধি অংশে বিস্তৃত থাকে।
৮. রক্ত চাপ	উচ্চ চাপে রক্ত পরিবহন করে।	কম চাপে রক্ত পরিবহন করে।

মানুষের ধমনীতন্ত্র (Arterial system)

মানব দেহের সকল ধমনী মিলে যে তন্ত্রের সৃষ্টি করে তাকে ধমনীতন্ত্র বলে। অসংখ্য শাখা-প্রশাখাসহ এটি একটি জটিল তন্ত্র। নিচে মানুষের প্রধান কয়েকটি ধমনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

মানুষের ধমনীতন্ত্রকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা- পালামোনারী ধমনীতন্ত্র ও সিস্টেমিক ধমনীতন্ত্র।

পালমোনারী ধমনী তন্ত্র (Pulmonary arterial system)

হৃদপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে উৎপন্ন হয়ে ধমনীতন্ত্রের যে অংশ O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিশোধন করার উদশ্যে ফুসফুস দুইটিতে পরিবহণ করে, তাকে পালমোনারী (ফুসফুসীয়) ধমনীতন্ত্র বলে। ডান নিলয় থেকে পালমোনারী আর্চ উৎপন্ন হয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয় এবং একটি করে শাখা বাম ও ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে। পালমোনারী ধমনীর প্রবেশ মুখে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে। প্রতিটি ফুসফুসের গহ্বরের মধ্যে পালমোনারী ধমনীগুলো প্রথমে বণ্ড সংখ্যক শাখা ধমনীতে এবং পরে অসংখ্য কৈশিক নালীতে বিভক্ত হয়। এসব প্রক্রিয়ায় এলভিওলাসের বাতাসের অক্সিজেন কৈশিক নালীর রক্তে এবং রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এলভিওলাসের গহবরে প্রবেশ করে।

সিস্টেমিক ধমনীতন্ত্র (Systemic arterial system)

বাম নিলয়ের সম্মুখ প্রান্ত থেকে এওর্টা (Aorta) সৃষ্টি হয়ে সিস্টেমিক ধমনীতন্ত্রের সূচনা করে। উৎপত্তির পর এওর্টা সামান্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বাম ব্রঙ্কাসকে ঘিরে এওর্টিক আর্চ গঠন করে। এরপর এওর্টিক আর্চ বেঁকে যায় এবং পশ্চাৎমুখী হয়ে ডর্সাল এওর্টা (Aorsal aorta) গঠন করে।

করোনারী ধমনী (Coronary artery)

নিলয় থেকে এওর্টা সৃষ্টির পরপরই করোনারী ধমনী উৎপত্তি লাভ করে।

করোনারী ধমনীর কাজ

- করোনারী ধমনী হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে।

এওর্টিক আর্চ ও ডর্সাল এওর্টা থেকে সৃষ্ট ধমনীগুলিই সারা দেহে রক্ত সরবরাহ করে। নিচে এদের শাখা ধমনীগুলো বর্ণনা করা হলো :

এওর্টিক আর্চ (Aortic arch) ঃ এওর্টিক আর্চ থেকে তিনটি বড় ধমনীর সৃষ্টি হয়, যথা- ব্রাকিওসেফালিক কাণ্ড (Brachiocephalic trunk), বাম অভিন্ন ক্যারোটিভ ধমনী (Left common carotid artery) এবং বাম সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনী (Left subclavian artery)।

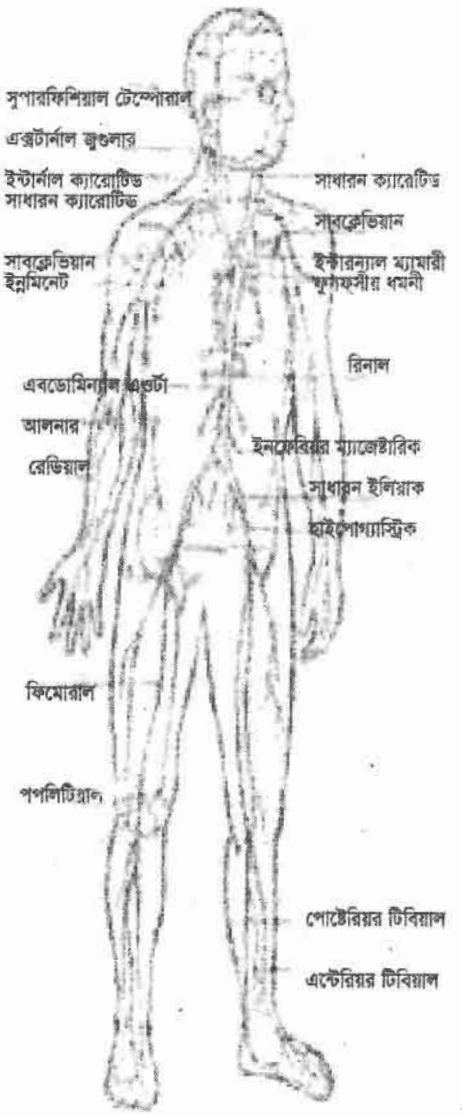

মানুষের ধমনীতন্ত্র

ব্রাকিওসেফালিক কাণ্ড (Brachiocephalic trunk) ঃ এটি খাট ও মোটা ধমনী। এটি ডান অভিন্ন ক্যারোটিড ধমনী এবং ডান সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনীতে বিভক্ত।

২) অভিন্ন ক্যারোটিড ধমনী ঃ ঘাড়ের প্রতিপাশ থেকে উপরে উঠে অন্তঃ ও বহিঃক্যারোটিড ধমনীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়।

ক) অন্তঃক্যারোটিড ধমনী ঃ করোটি গহবরে প্রবেশ করে সম্মুখ সেরেব্রাল ও মধ্য সেরেব্রাল ধমনীতে বিভক্ত হয়ে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে। অফথ্যালমিক ধমনী নামে আরেকটি শাখা অক্ষিকোটরে প্রবেশ করে অক্ষিগোলক, ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি এবং কপালের পেশী ও ত্বকে শাখা প্রেরন করে।

খ) বহিঃক্যারোটি ধমনী থেকে নিম্নোক্ত শাখাগুলি বের হয়।

i) **সুপিরিয়র থাইরয়েড ধমনী ঃ** থাইরয়েড গ্রন্থি ও ল্যারিংক্সে রক্ত বহন করে।

ii) **লিঙ্গুয়াল ধমনী ঃ** জিহবা ও সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থিতে রক্ত বহন করে।

iii) **ফেসিয়াল ধমনী ঃ** মুখমণ্ডল, চোখ, সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি এবং মুখমণ্ডলের ত্বক ও পেশীতে রক্ত বহন করে।

iv) **অক্সিপিটাল ধমনী ঃ** অক্সিপিটাল অঞ্চলের ত্বক ও পেশীতে রক্ত বহন করে।

v) **ফ্যারিঞ্জিয়াল ধমনী ঃ** গলবিলে রক্ত বহন করে।

উপরোক্ত শাখাগুলি প্রেরণের পর বহিঃক্যারোটিড ধমনী অন্তঃম্যাক্সিলারি ও সুপারফিসিয়াল টেমপোরাল ধমনীতে বিভক্ত হয়।

অন্তঃম্যাক্সিলারি ধমনী ঃ দুই চোয়ালে, দাঁত, চর্বনপেশী, নাসাপ্রাচীর, তালু ও ড্যুরা ম্যাটারে রক্ত সরবরাহ করে।

সুপারফিসিয়াল টেমপোরাল ধমনী ঃ টেমপোরাল অঞ্চলে রক্ত বহন করে।

৩) সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনী ঃ দেহের প্রতিপাশে ফুসফুসের চূড়ার উপর দিয়ে অতিক্রম করে। এর শাখাসমূহ নিম্নরূপ :

ক) **অন্তঃম্যামারি ধমনী ঃ** স্তনগ্রন্থি, সম্মুখ বক্ষীয় প্রাচীর ও পেরিকার্ডিয়ামে রক্ত বহন করে।

খ) **থাইরোসার্ভিকাল কাণ্ড ঃ** থাইরয়েড গ্রন্থি, ল্যারিংক্স ও ঘাড়ের পেশীতে রক্ত বহন করে।

গ) **কোস্টোসার্ভিকাল ধমনী ঃ** ঘাড়ের পেশী ও দুই উর্ধ্ব ইন্টারকোস্টাল পেশীতে রক্ত বহন করে।

ঘ) **অনুপ্রস্থ সার্ভিকাল ধমনী ঃ** অক্ষিপুটের পেশীতে রক্ত বহন করে।

ঙ) **ভার্টিব্রালল ধমনী ঃ** সুষুম্না কাণ্ড, সেরেবেলাম ও সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারে রক্ত বহন করে।

ডিসেণ্ডিং এওর্টা ঃ ডিসেণ্ডিং এওর্টা থেকে সৃষ্ট প্রধান ধমনীগুলি হচ্ছে-

i) **সিলিয়াক ধমনী ঃ** পাকস্থলী ও যকৃতে রক্ত সরবরাহ করে।

ii) **ফ্রেনিক ধমনী ঃ** ডায়াফ্রামে রক্ত সরবরাহ করে।

iii) **বৃক্কীয় ধমনী ঃ** বৃক্কে রক্ত সরবরাহ করে।

iv) **মেসেন্টেরিক ধমনী ঃ** অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করে।

v) **জনন ধমনী ঃ** প্রজনন অঙ্গ বা গোনাডে (Gonad) রক্ত সরবরাহ করে।

vi) **বাম ও ডান সাধারণ ইলিয়াক ধমনী ঃ** ধমনী দুটি ক্ষুদ্রতম শাখায় বিভক্ত হয়ে পেলভিস অঞ্চল, উরু, পা ইত্যাদি অংশে রক্ত সরবরাহ করে।

মানুষের শিরাতন্ত্র (Venous system) ঃ

সিস্টেমিক সংবহনের শিরা মিলিত হয়ে দুইটি বড় শিরা গঠন করে; যথা- সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা। তাই এদের দুইটি তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যথা-

ক) সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং

খ) ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা।

পোর্টাল শিরাটি ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে পৃথক বিবেচনা করা হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত শিরাবাহিত হয়ে হৃদপিণ্ডে পৌছায়।

ক) সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা ঃ

সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা সম্মুখ মেডিয়াস্টিনামে অবস্থিত এবং ডান অলিন্দে রক্ত পৌছায়। এ দুটি (ডান ও বাম) ব্রাকিওসেফালিক শিরায় গঠিত। এজাইগাস শিরা নামে বিজোড় শিরাটি সুপিরিয়র ভেনাক্যাভায় রক্ত পৌছে দেয়। প্রতিটি ব্রাকিওসেফালিক শিরা একটি অন্তঃজুগুলার শিরা এবং একটি সাবক্ল্যাভিয়ান শিরার মিলনে গঠিত হয়।

অন্তঃজুগুলার শিরা গলায় প্রতিপাশে উপরে উঠে নিজ নিজ অংশের মাথা (মস্তিষ্কসহ), মুখমণ্ডল ও গ্রীবা থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা বাণ্ড, বক্ষ-অস্থিচক্র ও গ্রীবার অংশবিশেষ থেকে রক্ত গ্রহণ করে।

বাণ্ডর গভীর শিরাগুলি জোড়। এদের নাম এ অংশে ধমনীগুলির অনুরূপ। উপরোক্ত শিরাগুলির মধ্যে তিনটির নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১) সেফালিক শিরা ঃ হাতের পৃষ্ঠদেশ থেকে উঠে সম্মুখ বাণ্ড ও উর্ধ্ববাণ্ডর মধ্যরেখা বরাবর অগ্রসর হয় এবং ব্রাকিয়াল শিরায় রক্ত পৌছায়।

২) মিডিয়ান কিউবিটাল শিরা ঃ এটি উল্লেখিত দুটি শিরাকে যুক্ত করে।

সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা সম্মুখ জুগুলার ও বহিঃজুগুলার নামে দুইটি বড় শিরা থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। এজাইগাস শিরাটি পশ্চাৎ মিডিয়াস্টিনামে মেরুদণ্ডের ডান পাশে অবস্থিত। এতে মেরুদণ্ডের বাম দিকে প্রসারিত হেমি–এজাইগাস শিরা গৃহীত হয়। দুটি শিরা বক্ষীয় গহবরের প্রাচীর ও অঙ্গাদি থেকে রক্ত সংগ্রহ করে।

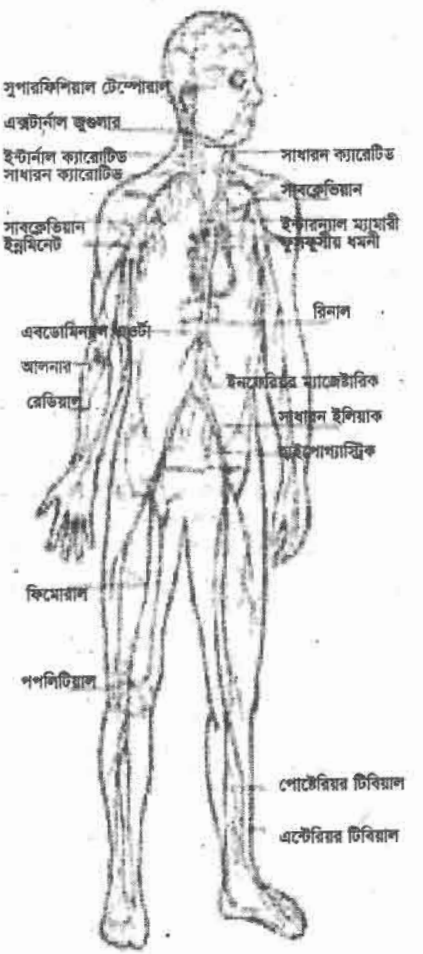

মানুষের ধমনীতন্ত্র

এভাবে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা দেহের উর্দ্ধাংশ অর্থাৎ মাথা, মুখমণ্ডল, গলা, উর্দ্ধপ্রান্ত, প্রাচীর ও বক্ষীয় অঙ্গাদি থেকে রক্ত সংগ্রহ করে হৃদপিণ্ডে বহন করে। এক্ষেত্রে হৃদপিণ্ডের শিরাগুলি ব্যতিক্রমী। এ শিরাগুলি করোনারি সাইনাস নামে একটি অভিন্ন বাহিকা তৈরি করে স্বাধীনভাবে ডান অলিন্দে রক্ত বহন করে।

খ) ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ঃ

ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা উদরীয় গহবরে এওর্টার ডান পাশে অবস্থিত। এইটি ডায়াফ্রামের একটি ছিদ্রপথে বক্ষীয় গহবরে প্রবেশ করে এবং রক্তকে ডান অলিন্দে বহন করে।

ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দুইটি (ডান ও বাম) অভিন্ন ইলিয়াক শিরায় গঠিত। প্রতিটি অভিন্ন ইলিয়াক শিরা, অন্তঃ ও বহিঃইলিয়াক শিরায় গঠিত।

প্রতিটি অন্তঃইলিয়াক শিরা পেলভিসের অর্ধাংশ ও প্রাচীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করে।

বহিঃইলিয়াক শিরা ঃ সম্পূর্ণ পা থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। পায়ের গভীরে শিরাগুলি অনুরূপ নামের ধমনীগুলির পাশাপাশি প্রসারিত। পায়ের উপরিগত শিরা হচ্ছে স্যাফেনা ম্যাগনা ও স্যাফেনা পার্ভা।

স্যাফেনা ম্যাগনা ঃ পদতলের পৃষ্ঠদেশ থেকে উঠে গোড়ালি ও উরুর মধ্যরেখা বরাবর প্রসারিত হয়ে ফিমেরাল শিরায় উন্মুক্ত হয়।

স্যাফেনা পার্ভা ঃ গোড়ালির পশ্চাৎদেশে অবস্থিত এবং পপলিটিয়াল শিরায় উন্মুক্ত।

উদরীয় গহবরে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা লাম্বার, অন্তঃস্পার্মাটিক, রেনাল, সুপ্রারেনাল ও হেপাটিক শিরা দিয়ে যুক্ত।

এভাবে, ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দেহের নিম্নাংশ থেকে শিরা- রক্ত বহন করে হৃদপিণ্ডে পৌছে দেঁয়।

পোর্টাল শিরাতন্ত্র ঃ মানুষের শুধু হেপাটিক পোর্টাল শিরাতন্ত্র উপস্থিত, রেনাল পোর্টাল শিরাতন্ত্র থাকে না। প্লীহা থেকে স্প্লিনিক শিরায়, পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ থেকে অর্থাৎ পাকস্থলী থেকে গ্যাস্ট্রিক শিরায়, অন্ত্র থেকে আন্ত্রিক শিরায়, অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় শিরায় এবং সিকাম, কোলন, মলাশয় থেকে মেসেনটেরিক শিরায় রক্ত সংগৃহীত হয়ে হেপাটিক পোর্টাল শিরা (Hepatic portal vein) গঠিত হয়। এ শাখা কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যকৃতে প্রবেশ করে এবং কৈশিকজালকে পরিণত হয়।

পালমোনারী ধমনী ও পালমোনারী শিরায় পার্থক্য

বিষয়	পালমোনারী ধমনী	পালমোনারী শিরা
১) উৎপত্তি	১) হৃদপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে সৃষ্টি হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়।	১) ফুসফুস থেকে সৃষ্টি হয়ে বাম অলিন্দে পৌঁছায়।
২) প্রাচীর	২) পুরু ও স্থিতিস্থাপক।	২) পাতলা ও অস্থিতিস্থাপক।
৩) হৃদপিণ্ডের সংযোগস্থলে কপাটিকা	৩) থাকে।	৩) থাকে না।
৪) রক্তচাপ	৪) বেশি।	৪) কম।
৫) কাজ	৫) দেহ থেকে সংগৃহীত CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত অক্সিজেনময় হওয়ার জন্য ফুসফুসে বহন করে।	৫) ফুসফুস থেকে অক্সিজেনময় রক্ত দেহে সরবরাহের জন্য হৃদপিণ্ডে বহন করে।

হৃদপিণ্ড (Heart)

হৃদপিণ্ড হলো হৃদপেশী দিয়ে তৈরি ত্রিকোণাকার ভেতরে ফাঁপা প্রকোষ্ঠযুক্ত পাম্পের মতো যন্ত্র যা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত করে। রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতর দিয়ে সঞ্চালন করে হৃদপিণ্ড মানবদেহে পাম্প যন্ত্র হিসাবে কাজ করে।

একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃদপিণ্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি নিলয় থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়িন লিটার রক্ত বের করে দেয়। একটি হৃদপিণ্ডের ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম; স্ত্রীলোকের হৃদপিণ্ডের ওজন পুরুষের হৃদপিণ্ডের ওজনের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম হয়।

হৃদপিণ্ডের অবস্থান ঃ হৃদপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপর এবং দুই ফুসফুসের মাঝ বরাবর বামদিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থান করে। এর গোড়া (Base) চওড়া ও উপরের দিকে থাকে এবং সুঁচালো শীর্ষদেশ (Apex) নিচের দিকে পঞ্চম পাঁজরের ফাঁকে (5th inter costel space), বুকের বাঁ দিকে (Nipple) এর ১/২ ইঞ্চি নিচে ও পিছনে থাকে। এটি স্টারনাম (Starnum) ও রিবগুলির (Ribs) পেছনে অবস্থিত।

হৃদপিণ্ডের গঠন

হৃদপিণ্ডের লেয়ার (Layer) ৩টি। বাইরে পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium), মাঝে মাইওকার্ডিয়াম (Myocardium) এবং ভিতরে এণ্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)। হৃদপিণ্ড একটি দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা ঝিল্লিতে আবৃত। এর বাইরের স্তর প্যারাইটাল (Parietal) এবং ভিতরেরটি ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম (Visceral pericardium), দুই স্তরের মাঝখানে অবস্থিত তরল পদার্থ হৃদপিণ্ডের সংকোচন সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রনে সাহায্য করে। মানুষের হৃদপিণ্ড বক্ষ মধ্যচ্ছদার উপরে ও দুই ফুসফুসের মাঝ বরাবর বামদিকে বাঁকা হয়ে অবস্থিত। এটি দেখতে লালচে রংয়ের ও ত্রিকোণাকার। এর গোড়াটি চওড়া উপরের দিকে থাকে। এর বাইরের স্তর প্যারাইটাল এবং ভেতরেরটি ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম। দুই স্তরের মাঝখানে অবস্থিত তরল পদার্থ হৃদপিণ্ডের সংকোচন সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। হৃদপিণ্ড হৃদপেশিতে গঠিত। মানুষের হৃদপিণ্ড সম্পূর্নভাবে চারটে প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের দুটিকে ডান ও বাম অলিন্দ (Right & left ventricle) এবং নিচের দুটিকে ডান ও বাম নিলয়ের প্রাচীর থেকে প্রায় তিন গুণ পুরু থাকে। এর কারণ হচ্ছে ডান নিলয় কেবল ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালিত করে কিন্তু বাম নিলয়ের সংকোচনে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। অলিন্দ ও নিলয় উভয়ে লম্বালম্বিভাবে যে পর্দা (Septum) দিয়ে বিভক্ত থাকে তাদের যথাক্রমে -

ক) অলিন্দ পর্দা (Inter-atrial septum) এবং

খ) আন্তঃনিলয় পর্দা (Inter-ventricular septum) বলে।

মানুষের হৃদপিন্ড

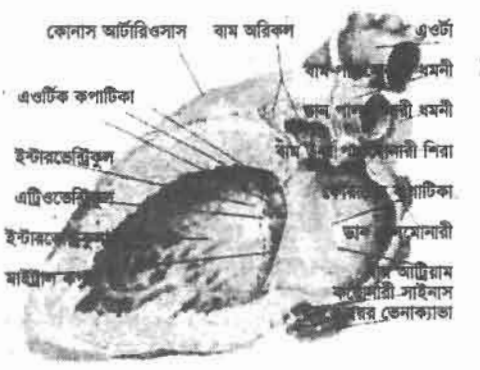

হৃদপিন্ডের লম্বচ্ছেদ

ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগকারী ছিদ্র ট্রাইকাস্পিড কপাটিকায় (Tricuspid valve) সংরক্ষিত থাকে। বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথের কপাটিকা বাইকাস্পিড কপাটিকা (Bicuspid valve) নামে পরিচিত। এ উভয় ধরনের কপাটিকা নিলয় প্রাচীরের মাংসল অভিক্ষেপ রূপী প্যাপিলারী পেশি (Papilary muscle) করডি টেণ্ডিনি (Cordae tendinae) নামক তন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে উদ্ভূত পালমোনারী ধমনীর ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় থেকে সৃষ্ট অ্যাওর্টার মুখের কপাটিকা দুইটি অর্ধচন্দ্রাকার (Semilunar) । এরা রক্তকে পেছনদিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। অলিন্দে আগত শিরাগুলির প্রবেশ পথ কপাটিকাবিহীন। হৃদপিণ্ড- প্রাচির তিনটি পৃথক স্তরে গঠিত, যথা - বাইরে এপিকার্ডিয়াম (Epicardium), মাঝে মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium) এবং ভেতরের এণ্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)। এপিকার্ডিয়ামে প্রায়ই চর্বি লেগে থাকে। মায়োকার্ডিয়াম হৃদপিণ্ডের সংকোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

হৃদপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলো এণ্ডোকার্ডিয়ামে গঠিত। এ স্তর কপাটিগুলোকেও বেষ্টন করে রাখে এবং প্রধান রক্তবাহিকাগুলোর অন্তঃস্থ স্তরের সাথে অবিচ্ছিন্ন।

হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন

হৃদপিণ্ডের সংকোচন প্রসারনের ফলে রক্ত দেহের ভেতরে গতিশীল থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার হৃদস্পন্দন ঘটে। হৃদপিণ্ডের এ সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদস্পন্দন হয়ে থাকে। হৃদপিণ্ডের এ সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (Systole) ও ডায়স্টোল (Diastole) বলে। হৃদপিণ্ডের মধ্যে নিম্নে বর্নিত উপায়ে রক্ত সংবহিত হয় :

১। শরীরের উর্ধ্বভাগ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং নিম্ন ভাগ থেকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে।

২। ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত দুইটি পালমোনারী শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে পৌছায়।

৩। ডান অলিন্দেও সংকোচনের সময় নিলয় প্রসারিত থাকে। তাই অলিন্দের মধ্যে চাপ বেশি থাকে এবং নিলয়ের মধ্যে চাপ কম থাকে। এ চাপ পার্থক্যের জন্য ডান অলিন্দ– নিলয় ছিদ্র পথে অবস্থিত ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা খুলে যায় এবং CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এ সময় ভেনাক্যাভা দুইটির কপাটিকা বন্ধ থাকে।

৪। ডান অলিন্দ সংকোচনের সময়ই বাম অলিন্দের ও সংকোচন ঘটে এবং একই ভাবে বাম অলিন্দ–নিলয় ছিদ্রপথে অবস্থিত বাইকাস্পিড কপাটিকা খুলে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এ সময় পালমোনারী শিরা দুটির কপাটিকা বন্ধ থাকে।

৫। অলিন্দ খালি হেয়ে গেলে এর সংকোচন শেষ হয়ে প্রসারণ শুরু হয় এবং সংগে সঙ্গে রক্তে পূর্ণ

চিত্র ঃ হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন

নিলয়ের সংকোচন ঘটে, ফলে নিলয়ের মধ্যে চাপ বাড়ে এবং বাইকাস্পিড ও ট্রাইকাস্পিড কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাওর্টা ও পালমোনারী ধমনীতে অবস্থিত সেমিলুনার (অর্ধচন্দ্রাকার) কপাটিকা খুলে যায়।

৬। ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিশোধনের জন্য পালমোনারী ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রেরিত হয়।

৭। বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রেরিত হয়।

৮। অ্যাওর্টা থেকে ধমনী, শাখা-ধমনী ও কৈশিক জালিকার মাধ্যমে রক্ত সারা দেহে সংবহিত হয়।

এভাবে হৃদপিণ্ডের ভেতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে রক্তসংবহন অব্যাহত থাকে এবং প্রত্যেক স্পন্দনের সময় চক্রাকারে এ ঘটানার পুনরাবৃত্তি ঘটে। হৃদপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

চিত্র-২৬ : রক্তের প্রবাহ পথ

হৃদচক্র বা কার্ডিয়াক সাইকেল (Cardiac cycle)

হৃদপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে (Per beat) কতকগুলো পরিবর্তন সূচিত হয়। পরবর্তী স্পন্দনেও এ পরিবর্তনগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে। হৃদপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে হৃদপিণ্ডের পরিবর্তনগুলোর যে চক্রাকার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে কার্ডিয়াক সাইকেল বা হৃদচক্র বলে।

স্বাভাবিকভাবে হৃদস্পন্দনের হার যেহেতু মিনিটে ৭০-৮০ (গড়ে ৭৫) বার সেহেতু হৃদচক্রের স্থিতিকাল ০.৮ সেকেণ্ড।

হৃদচক্র চলাকালীন হৃদপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সংবহন প্রণালি

স্বাভাবিক অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের হৃদপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭৫ বার স্পন্দিত হয়। প্রতি স্পন্দনে হৃদপিণ্ড একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত হয়। হৃদপিণ্ডের সংকোচনকে সিস্টোল এবং প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। হৃদচক্র চলাকালীন কিভাবে হৃদপিণ্ডে রক্ত সংবহন হয় তা নিচের চারটি ঘটনাবলির মাধমে ব্যাখ্যা করা যায়।

১। **অলিন্দের ডায়াস্টোল** (Atrial diastole)

ক) এ সময় অলিন্দ দুইটি প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে।

খ) ট্রাইকাস্পিড এবং বাইকাস্পিড কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) অলিন্দ মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে দেহে বিভিন্ন অংশ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং ইনফিরিয়র ভোনাক্যাভা দিয়ে ডান অলিন্দে এবং

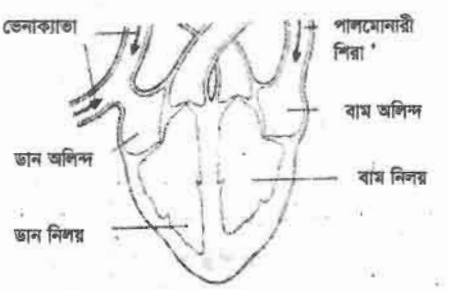

অলিন্দের ডায়াস্টোল

পালমোনারী শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। এ সময় হৃদপিণ্ডের পেশি থেকেও CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অলিন্দে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৭ সেকেণ্ড। অলিন্দ দুইটি রক্তপূর্ণ হলে অলিন্দের সিস্টোল হয়।

২) **অলিন্দের সিস্টোল** (Atrial systole)

ক) এ সময় অলিন্দ দুটি সংকুচিত হয়।

খ) ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসটিড কপাটিকা উন্মুক্ত থাকে এবং সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) অলিন্দ মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.১ সেকেণ্ড।

৩) **নিলয়ের সিস্টোল** (Verticulur systole)

ক) নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়।

খ) ট্রাইকাস্পিড ও বাইকাস্পিড কপাটিকা বন্ধ এবং সেমিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে।

গ) নিলয় মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং নিলয় থেকে রক্ত নিলয়ের বাইরে নির্গত হয়। ডান নিলয় থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পাল্মোনারী ধমনীতে এবং বাম নিলয় থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৩ সেকেণ্ড।

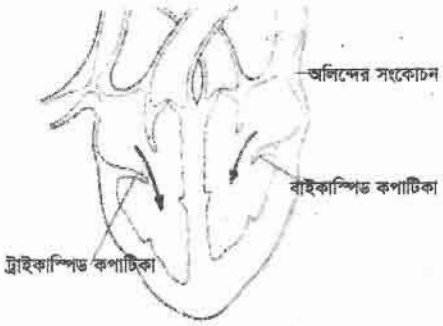

অলিন্দের সিস্টোল

৪) **নিলয়ের ডায়াস্টোল** (Ventricular diastole)

ক) এ সময় নিলয় দুটি শিথিল অবস্থায় থাকে।

খ) বাইকাস্পিড ও ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা উন্মুক্ত হয় এবং সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ থাকে।

গ) নিলয় মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায় ফলে অলিন্দ দুটি থেকে রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে। ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে এবং বাম নিলয়ে O_2 রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এ অবস্থার সময়কাল ০.৫ সেকেণ্ড।

নিলয়ের সিস্টোল

রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার (Blood pressure)

প্রবহমন রক্ত নালীগাত্রে যে পার্শ্বচাপ (Lateral pressure) প্রয়োগ করে, তাকে রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ বলতে সাধারণত প্রবহমান রক্ত ধমনীর প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপের সৃষ্টি করে তাকে বোঝানো হয়। হৃদপিণ্ডের প্রকৃতপক্ষে নিলয়ের সিস্টোল অবস্থায় ধমনীর প্রাচীরে রক্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক হয়। একে সিস্টোলিক চাপ (Systolic pressure) বলে। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সিস্টোলিক চাপ প্রায় ১২০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান। অপরদিকে হৃদপিণ্ডের নিলয়ের ডায়াস্টোল অবস্থায় রক্তচাপ সর্বনিম্ন মাত্রায় পৌঁছে। একে ডায়াস্টেলিক চাপ (Diastolic pressure) বলে। সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ডায়াস্টোলিক চাপ প্রায় ৮০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান। সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপের অন্তরফলকে পালস প্রেসার বা স্পন্দন

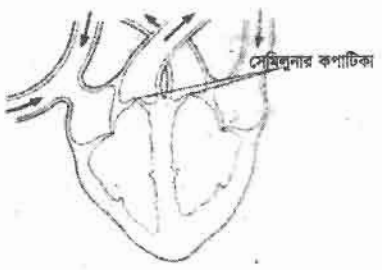

নিলয়ের ডায়াস্টোল

চাপ বলে। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এর মান হলো প্রায় ৪০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান। স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরোক্ষ পদ্ধতিতে মানুষের রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন (Hypertension)

উচ্চ রক্ত চাপকে ডাক্তারী ভাষায় হাইপারটেনশন বলে। শরীর ও মনের স্বাভাবিক অবস্থার রক্তচাপ বয়সের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপরে সময় সময় যদি অবস্থান করতে থাকে তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। কোনো ব্যক্তির রক্তচাপ যদি সিস্টোলিক সব সময় ১৬০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ বা তার বেশি এবং ডায়াস্টোলিক সব সময় ৯৫ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ বা তার বেশি থাকে তবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়। উত্তেজনা, চিন্তা, বিষণ্নতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্ত চাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং এ অবস্থায় কোনো ওষুধেরও প্রয়োজন হয় না।

হাইপারটেনশন এর কারণ ও জটিলতা

হাইপারটেনশন হওয়ার প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। তবে অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, পরিবারের অন্য রক্ত সম্পর্কের মধ্যে এ রোগ থাকা, ডায়াবেটিস, পাতে লবণ খাওয়া, অস্থির চিত্ত ও মানসিক চাপগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ রোগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। হাইপারটেনশন রোগীদের যে সব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে–স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক ও ফেইলিউর, বৃক্কের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত প্রভৃতি।

উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধের উপায়

১) শরীরের ওজন সীমার মধ্যে রাখতে হবে।

২) হাটা, খেলাধুলা বা শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস করতে হবে।

৩) শরীরে যেন অতিরিক্ত মেদ না জমে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৪) পাতে লবণ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

৫) ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬) দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মন হালকা রাখতে হবে।

৭) পরিমিত পরিমাণ ঘুমাতে হবে।

মানব দেহের রক্ত সংবহন পদ্ধতি

মানবদেহে রক্ত বাহিকাগুলো দুই ধরনের রক্তসংবহন চক্র গঠন করে, যথা:- সিস্টেমিক চক্র ও পালমোনারী চক্র। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

১) সিস্টেমিক সংবহন চক্র (Systemic cirulation)

যে সংবহনে রক্ত বাম নিলয় থেকে বিভিন্ন রক্ত বাহিকার মাধ্যমে অঙ্গাগুলোতে পৌঁছায় এবং অঙ্গাগুলো থেকে ডান অলিন্দে ফিরে আসে, তাকে সিস্টেমিক (Systemic cirulation) বা তন্ত্রীয় সংবহন বলে। সিস্টেসিক সংবহন সমগ্র দেহের জন্য অক্সিজেন, খাদ্যসার এবং বর্জ্য পদার্থ বহন করে। সব সিস্টেসিক ধমনীর উদ্ভব হয় অ্যাওর্টা থেকে; আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম নিলয় থেকে। সুতরাং হৃদপিন্ডের সংকোচনের ফলে বাম নিলয় থেকে রক্ত প্রথমত অ্যাওর্টার ভেতর দিয়ে ধমনীতে প্রবেশ করে। পরে দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গের ধমনিকা ও জালিকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রক্ত পুনরায় সংগৃহীত হয়ে উপশিরার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রক্ত পরে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে হৃদপিন্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে।

২) পালমোনারী সংবহন চক্র (Pulmonary cirulation)

যে সংবহনে রক্ত হৃদপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অলিন্দে ফিরে আসে, তাকে পালমোনারী বা ফুসফুসীয় সংবহন (Pulmonary cirulation) বলে। সিস্টেমিক সংবহনের মাধ্যমে রক্ত ডান অলিন্দে পৌঁছার পর সেখান থেকে ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা অতিক্রম করে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। ডান নিলয়ে প্রবেশের পরপরই হৃদপিণ্ডের সংকোচনের ফলে পালমোনারী ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসের বিনিময় ঘটে। রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড অপসারিত হয় এবং সেই সঙ্গে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত বহন করলেও পালমোনারী ধমনী এর ব্যতিক্রম। এ ধমনী হৃদপিণ্ড থেকে ফুসফুসে

অক্সিজেনবিহীন রক্ত বহন করে। রক্ত ফুসফুসের ভেতর দিয়ে অতিক্রমের সময় অসংখ্য সূক্ষ্ম জালিকা এলভিওলাইরের নিবিড় সংস্পর্শে আসে। ব্যাপনের মাধ্যমে রক্তে গ্যাসের আদান-প্রদান হয়। নতুন ভাবে অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে রক্ত পালমোনারী শিরায় সংগৃহীত হয়ে তার ভেতর দিয়ে বাম অলিন্দে গমন করে। বাম অলিন্দ থেকে বাকাস্পিড কপাটিকার ভেতর দিয়ে রক্ত বাম নিলয়ে গমন করে। সব শিরা অক্সিজেনবিহীন রক্ত বহন করলেও একমাত্র পালমোনারী শিরা অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত বহন করে। এ ভাবে ডান নিলয় থেকে রক্ত ফুসফুসে এবং সেখান থেকে বাম অলিন্দে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে সংবহনের যে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা সম্পন্ন হয়, তাকে পালমোনারী সংবহন বলে। পালমোনারী সংবহন শেষে হৃদপিণ্ডে আনীত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় সিস্টেমিক সংবহনের মাধ্যমে সারা দেহে প্রেরিত হয়।

পোর্টালতন্ত্র (Portal system)

সিস্টেমিক ও পালমোনারী এ দুইটি সম্পুর্ন সংবহন চক্র ছাড়াও অনেক মেরুদন্ডী প্রানীতে রক্ত চলার পথে কিছুটা পার্শ্বপথ অনুসরণ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গো কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃদপিন্ডের দিকে অগ্রসর হবার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গো প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় জালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে পোর্টাল তন্ত্র বলে। মেরুদন্ডী প্রাণীতে সাধারণত হেপাটিক (Hepatic portal system) এবং রেনাল (Renal portal system) এই দুই ধরনের পোর্টালতন্ত্র দেখা যায়। তবে রেনাল পোর্টালতন্ত্র মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রানীতে অনুপস্থিত।

হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র

পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র ও প্লীহা থেকে কৈশিক

জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত হেপাটিক পোর্টাল শিরার (Hepatic portal vein) ভেতর দিয়ে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হয়। যকৃতে পৌঁছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়। এসব কৈশিকজালিকা পরে একত্রীকৃত হয়ে হেপাটিক শিরা (Hepatic vein) গঠন করে এবং এর মাধ্যমে রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় বাহিত হয়। সেখান থেকে রক্ত হৃদপিণ্ডে পৌঁছায়।

মানুষের রক্ত সংবহনের চিত্র

করোনারি রক্ত সংবহন (Coronary circulation)

দেহে রক্ত সংবহনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে আমৃত্যু যে অঙ্গটি রক্তের মাধ্যমে সমগ্র দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে, সেটি হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ডের নিজের জন্যও পুষ্টি এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণ হয় করোনারি সংবহনের মাধ্যমে। হৃদপিণ্ডের হৃদপেশিতে রক্ত সঞ্চালনকারী সংবহনকে করোনারি রক্ত সংবহন বলে।

বিপাকীয় দ্রব্যাদি ও হরমোন পরিবহনে রক্তের ভূমিকা

দেহে রক্ত অন্যতম পরিবহন মাধ্যম। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন কোষ–কলায় পৌঁছে এবং সেখানে উদ্ভূত নানান বিপাকীয় পদার্থ রেচনের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গে বাহিত হয়। নিচে অক্সিজেন, কার্বন- ডাই-অক্সাইড, বিপাকীয় দ্রব্য ও হরমোন পরিবহনে রক্তের ভূমিকা আলোচিত হলো:

১) অক্সিজেন পরিবহনে রক্তের ভূমিকা

মানুষের ফুসফুসে প্রবাহিত শিরার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম, মাত্র ১৫%। কিন্তু ফুসফুসের এলভিওলাইয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে, ফলে সেখানে বেশি চাপের সৃষ্টি হয় এবং অক্সিজেন ফুসফুস থেকে ধমনীর রক্তে প্রবেশ করে। তখন ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২০%। অক্সিজেন রক্তে প্রবেশের পর লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিনের সাথে শিথিল ও অস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়। ২০% অক্সিজেনের মধ্যে মাত্র ০.০৬% অক্সিজেন ভৌত দ্রবণরূপে এবং বাকি অংশ অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসেবে রক্তে বাহিত হয়। অক্সিজেন এভাবে পরিবাহিত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গের কৈশিকনালীতে পৌঁছালে বিপরীত ঘটনা ঘটে। সেখানে কলা-কোষের চেয়ে কৈশিকজালিকায় অক্সিজেনের চাপ বেশি থাকে। চাপ পার্থক্যের জন্য অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন মুক্ত হয়ে কলা-কোষে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় মোট অক্সিজেনের ২০% মাত্র এক–চতুর্থাংশ মুক্ত হয়ে কলা-কোষে প্রবেশের সুযোগ পায়, বাকি অক্সিজেন (অর্থাৎ বাঁকী ১৫%) শিরা জালকের রক্তের সাথে পরিবাহিত হয়ে শিরার মাধ্যমে পুনারায় ফুসফুসের জালকে ফিরে যায়।

২) কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহনে রক্তের ভূমিকা

দেহের কলা-কোষে বিপাকীয় কাজে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলা-কোষ থেকে শিরা জালকের রক্তে প্রবেশ করে। রক্তরসের পানিতে অক্সিজেনের চেয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও রক্তের নির্দিষ্ট ক্ষারীয় প্রকৃতি pH 7.4 বজায় রাখার জন্য কলা-কোষে সৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্র ৫-১০% রক্তেরসের পানিতে দ্রবীভূত কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে রক্তে পরিবাহিত হয়। কার্বনিক

অ্যাসিড পরে বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন H^+ ও বাইকার্বনেট আয়ন HCO_3 উৎপন্ন করে। কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ৪০-৪৫% লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে মিশে কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন রূপে রক্তে পরিবাহিত হয়। বাকি ৫০% কার্বন-ডাই-অক্সাইড লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত পানির সাথে মিশে কার্বনিক অ্যাসিডরূপে পরিবাহিত হয়। কার্বনিক অ্যাসিড বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন ও বাইকার্বনেট আয়ন সৃষ্টি করে। উৎপন্ন হাইড্রোজেন হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশের সাথে যুক্ত হয়, ফলে রক্তের ক্ষারধর্ম অক্ষুন্ন থাকে। অন্যদিকে বাইকার্বনেট আয়ন লোহিত রক্তকণিকা থেকে রক্তরসে চলে আসে। উল্লেখিত উপায়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শিরার রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের অ্যালভিওলাইতে প্রবেশ করে।

৩) বিপাকীয় দ্রব্যাদি পরিবহনে রক্তের ভূমিকা

রক্তের প্রায় ৫৫% রক্তরস। রক্তরসের ৯১-৯২% পানি, বাকি ৮-৯% অজৈব লবণ ও জৈব পদার্থ। অধিকাংশ জৈব ও অজৈব পদার্থ রক্তরসের পানিতে দ্রবীভূত হয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পরিবাহিত হয়। কারণ পানি অন্যতম উৎকৃষ্ট দ্রাবক। এতে ব্যপন প্রক্রিয়ায় অনুপ্রবেশিত গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লিসারল ও ভিটামিন, নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি বিভিন্ন আয়ন রক্তরসের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় এবং বড় শৃংঙ্খলের ফ্যাটি এসিড ভাসমান ক্ষুদ্র দানারূপে পরিবাহিত হয়।

৪) হরমোন পরিবহণে রক্তের ভূমিকা ঃ

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে হরমোন ক্ষরিত হয় এবং উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী জায়গায় পৌঁছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। হরমোন সরাসরি রক্তে ক্ষরিত ও পরিবাহিত হয়। অধিকাংশ হরমোন প্লাজমা-প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে এবং কিছু হরমোন রক্তরসের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় পরিবাহিত হয়। এভাবে রক্ত দেহের প্রত্যেক কোষে বাঁচার জন্য রসদ পৌঁছে দেয় এবং সেখান থেকে বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থ অপসারণের উৎকৃষ্ট তরল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

এক বিন্দু রক্তের গতিপথ

১) হাত থেকে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত এক বিন্দু রক্তের গতিপথ ঃ শিরাতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে হৃদপিণ্ডে বহন করে। হাতের ভেতর অসংখ্য কৈশিকনালিকা মিলিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা গঠন করে। এ শিরাগুলি মিলিত হয়ে সেফালিক শিরা ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা হয়ে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। নির্দিষ্ট সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে রক্ত ট্রাইকাস্পিড় কপাটিকায় রক্ষিত ডান অলিন্দ নিলয় ছিদ্রপথে হৃদপিণ্ডের ডান নিলয়ে এসে জমা হয় এবং নিলয় সংকোচনের পূর্ব পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে।

২) হৃদপিণ্ড থেকে পা পর্যন্ত এক বিন্দু রক্তের গতিপথ ঃ হৃদপিণ্ডের নিলয়ের সংকোচনের ফলে O_2 যুক্ত রক্ত নিলয় থেকে বিভিন্ন অংশে সংবাহিত হয়। একটি নির্দিষ্ট রক্তফোটার প্রতি লক্ষ রাখলে দেখা যাবে যে নিলয় সংকুচিত হলে সেমিলুনার কপাটিকা অতিক্রম করে এওর্টার মধ্যে দিয়ে এওটির্ক আর্চে রক্ত প্রবেশ করে। এখান থেকে রক্তফোটা ডিসেণ্ডিং এওর্টায় বাহিত হয়। ডিসেণ্ডিং এওর্টা থেকে রক্তফোটা ডান বা বাম আন্তঃইলিয়াক ধমনী হয়ে বহিঃইলিয়াক ধমনীতে (বাম/ডান) প্রবেশ করে। এখান থেকে রক্তফোটা পপলিটিয়াল ধমনী হয়ে টিবিয়াল ধমনীর (সম্মুখ ও পশ্চাৎ) মাধ্যমে পায়ের নির্দিষ্ট স্থানে পৌছায়। নিচের চিত্রে রক্তের গতিপথ দেখানো হয়েছে ঃ

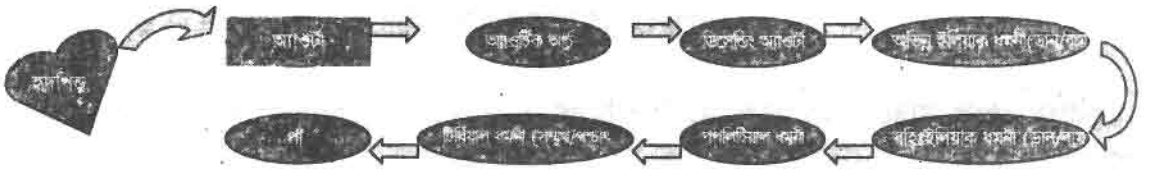

হৃদপিন্ড থেকে পা পর্যন্ত রক্তের গতিপথ

৩) পা থেকে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত এক বিন্দু রক্তের গতিপথ ঃ পায়ের অংশ থেকে সংশ্লিষ্ট শিরা উৎপন্ন হয়ে রক্ত সংগ্রহ করে (যেমন- স্যাফেনা পার্ভা গোড়ালির পশ্চাৎ দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে পপলিটিয়াল শিরায় উন্মুক্ত হয়; স্যাফেনা ম্যাগনা পদতলের পৃষ্ঠদেশ থেকে সৃষ্টি হয় এবং গোড়ালি ও উরুর মাঝরেখা বরাবর প্রসারিত হয়ে ফিমোরাল শিরায় উন্মুক্ত) এবং বহিঃইলিয়াক শিরায় বহন করে। সংগৃহীত নির্দিষ্ট রক্তফোটা বহিঃইলিয়াক শিরা থেকে ডান বা বাম অভিন্ন ইলিয়াক শিরা হয়ে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় প্রবেশ করে। রক্তফোটা ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার মাধ্যমে ডান অলিন্দ এসে পৌছায় ট্রাইকাস্পিড কপাটিকায় রক্ষিত ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে।

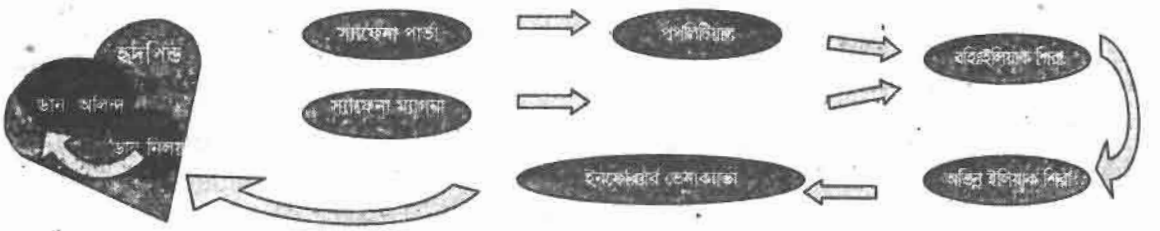

পা থেকে হৃদপিন্ড পর্যন্ত রক্তের

৪) ভিলাস (বগুবচনে ভিলাই) থেকে ফুসফুস পর্যন্ত এক বিন্দু রক্তের গতিপথ ঃ অন্ত্র-প্রাচীরের মিউকোসা স্তরের কোষীয় অভিক্ষেপেগুলির প্রতিটিকে ভিলাস বলে। প্রতিটি ভিলাস কৈশিকজালক-সমৃদ্ধ। কৈশিকজালক থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরা উৎপন্ন হয়। একটি নির্দিষ্ট রক্তফোটার প্রতি লক্ষ রাখলে দেখা যাবে যে এটি ভিলাস থেকে প্রথমে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে পৌছায়। পরে ডান/বাম- হেপাটিক শিরার মাধ্যমে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় বাহিত হয়ে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। এখান থেকে রক্তফোটা ট্রাইকস্পিড করাটিকায় রক্ত ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে ডান নিলয়ে গমন করে। নিলয় সংকুচিত হলে রক্তের ফোটাটি O_2 যুক্ত হওয়ার জন্য পালমোনারী ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে পৌছায়। নিচের চিত্রে রক্তের গতিপথ দেখানো হয়েছে:

ভিলাস থেকে ফুসফুস পর্যন্ত রক্তের

৫) ফুসফুস থেকে মস্তিষ্কে এক বিন্দু রক্তের গতিপথ ঃ ফুসফুসে এলভিওলাস প্রাচীর ঘেঁসে অবস্থিত কৈশিকজালিকা থেকে পালমোনারী শিরা উৎপন্ন হয়। অলিন্দ সংকুচিত হলে রক্তবিন্দু বাইকাস্পিড কপাটিকায় রক্ষিত বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্রপথে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। এর পর নিলয় সংকুচিত হয়, ফলে রক্তবিন্দুটি বাম নিলয় থেকে এওর্টার মাধ্যমে এওর্টিক আর্চে প্রবেশ করে। এখান থেকে রক্তবিন্দু দুটি পথের যে কোনো একটিতে মস্তিষ্কে পৌছাতে পারে।

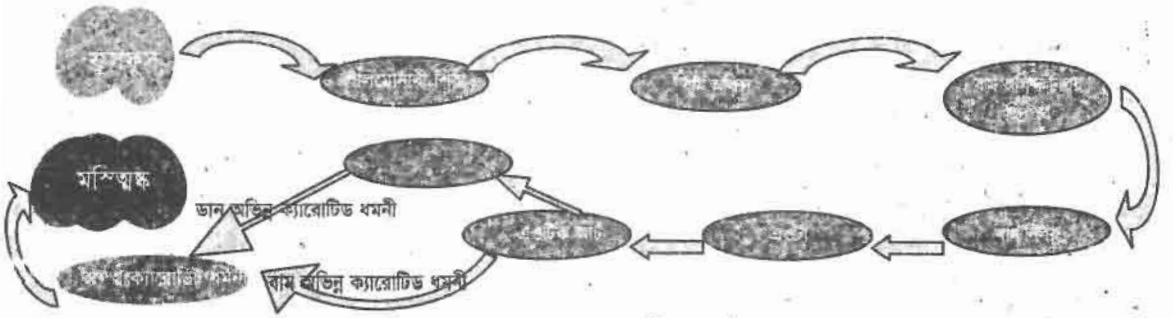

ফুসফুস থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত রক্তের গতিপথ

ক) এওর্টিক আর্চ থেকে সৃষ্ট ব্রাকিওসেফালিক ধমনী হয়ে ডান অভিন্ন ক্যারোটিড ধমনীতে প্রবেশ করে এবং এখান থেকে অন্তঃক্যারোটিড ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছায়।

খ) এওর্টিক আর্চ থেকে সৃষ্ট বাম অভিন্ন ক্যারোটিক ধমনী হয়ে অন্তঃক্যারোটিড ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছায়।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রক্ত কাকে বলে?
২। রক্তের উপাদান কি কি?
৩। রক্ত কণিকা কাকে বলে?
৪। রক্তরস বলতে কি বোঝ?
৫। রক্তরসের উপাদান কি কি?
৬। রক্তের সাধারণ কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৭। লোহিত কণিকা কাকে বলে?
৮। লোহিত কণিকার কাজ কি কি?
৯। শ্বেতকণিকা কাকে বলে?
১০। শ্বেতকণিকার কাজ কি কি?
১১। অণুচক্রিকা বলতে কী বোঝ?
১২। রক্ত জমাট বাঁধা বলতে কী বোঝ?
১৩। মানুষের ব্লাড গ্রুপ কয়টি?
১৪। Rh ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝ?
১৫। ধমনী কাকে বলে?
১৬। হৃদপিণ্ড কাকে বলে?
১৭। মানুষের হৃদপিণ্ডে কয়টি প্রকোষ্ঠ আছে? কি কি?
১৮। অলিন্দ ও নিলয় বলতে কি বোঝ?
১৯। সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা বলতে কি বোঝ?
২০। রক্তবাহিকা কাকে বলে?
২১। কৈশিক জালিকা কাকে বলে?
২২। রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার বলতে কি বোঝ?
২৩। উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধের উপায় কি?
২৪। পালমোনারী রক্ত সংবহন বলতে কি বোঝ?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। এরিথ্রোসাইট, লিউকোসাইট ও থ্রম্বোসাইটের মধ্যে পার্থক্য কী?
২। এন্টিজেন ও এন্টিবডি কী ? ব্লাড গ্রুপের জিনোটাইপ, এন্টিজেন ও এন্টিবডির মধ্যে পার্থক্য কর।
৩। সর্বজনীন রক্তদাতা ও গ্রহীতা কাকে বলে? এদের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৪। ধমনী ও শিরা কাকে বলে? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।
৫। মানুষের ধমনীতন্ত্র কাকে বলে? চিত্রসহ বর্ণনা কর।
৬। মানুষের শিরাতন্ত্র কাকে বলে? চিত্রসহ বর্ণনা কর।
৭। চিত্রসহ হৃদপিণ্ডের গঠন বর্ণনা কর।
৮। হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে কী ভাবে রক্তসংবহন হয়? চিত্রসহ বর্ণনা কর।
৯। হৃদচক্র কাকে বলে? চিত্রসহ বর্ণনা কর।
১০। সিস্টোল ও ডায়াস্টোল বলতে কি বোঝ? চিত্রসহ বর্ণনা কর?
১১। অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহনে রক্তের ভূমিকা বর্ণনা কর।
১২। বিপাকীয় দ্রব্যাদি ও হরমোন পরিবহনে রক্তের ভূমিকা বর্ণনা কর।
১৩। হৃদপিণ্ড থেকে পা পর্যন্ত এক বিন্দু রক্তের গতিপথ চিত্রসহ বর্ণনা কর?
১৪। পালমোনারী রক্তসংবহন চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লসিকা ও লসিকাতন্ত্র

(Lymph & Lymphatic system)

দেহের সমস্ত কলা (Tissue) রক্তপূর্ণ কৈশিকজালিকায় বেষ্টিত থাকে। রক্তের কিছু উপাদন কৈশিকজালিকার প্রাচীর ভেদ করে কোষের চারপাশে অবস্থান করে। এ উপাদানগুলোকে সম্মিলিতভাবে কলারস বলা হয়। কলারস এক ধরনের বদ্ধ নালী দিয়ে গৃহীত ও পরিবাহিত হয়ে পুনরায় রক্তে ফিরে আসে। এসব নালীকে লসিকা নালী বলে। লসিকাতন্ত্র লসিকানালী নিয়ে গঠিত।

লসিকা (Lymph)

লসিকা এক ধরনের পরিবর্তিত ঈষৎ ক্ষারধর্মী স্বচ্ছ কলারস যা লসিকা বাহকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং দেহের প্রতিটি কোষকে সিক্ত রাখে।

লসিকার উপাদান : লসিকা সামান্য ক্ষারধর্মী হলদে তরল পদার্থ। তৈলাক্ত পদার্থ বা স্নেহদ্রব্য লসিকাতে প্রবেশ করলে এর রং দুধের মতো সাদা দেখায়। লসিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.১৫১। এর উপদানগুলো হচ্ছে:

ক) **কোষ ঃ** লোহিত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা অনুপস্থিত কিন্তু শ্বেত রক্তকণিকার (Lymphocyte) সংখ্যা প্রচুর।

খ) **কোষবিহীন পদার্থ ঃ** লসিকায় ৯৮% পানি ও ৯% কঠিন পদার্থ থাকে। কঠিন পদার্থের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন, তৈলাক্ত বা স্নেহ পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট, নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ, ফসফরাস, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কিছু এনজাইম ও অ্যান্টিবডি।

মানুষের লসিকাতন্ত্র

লসিকা নালী (Lymph vessels)

লসিকা জালিকা থেকে কতগুলো নালী একত্রে মিলিত হয়ে লসিকা নালী গঠন করে। লসিকানালী দুই ধরনের হয় যথা -

১) **অন্তর্মুখী লসিকা নালী ঃ** যে লসিকা নালী লসিকাকে লসিকা গ্রন্থির দিকে বহন করে, তাকে অর্ন্তমুখী লসিকা নালী বলে।

২) **বহর্মুখী লসিকা নালী ঃ** যে লসিকা লসিকা গ্রন্থি থেকে লসিকা বহন করে, তাকে বহির্মুখী লসিকা নালী বলে।

মানবদেহের সমস্ত লসিকা নালী দুটি প্রধান লসিকা নালীতে মিলিত হয়, যথা ঃ ১) ডান লসিকা নালী এবং ২) বক্ষ লসিকানালী।

১) **ডান লসিকা নালী ঃ** এ নালীটি মাথা ও গলার ডানপাশে, ডান হাত, ডান ফুসফুস, হৃদপিণ্ডের ডান পাশ এবং যকৃতের ডান পাশ থেকে লসিকা বহন করে। এটি

ডান সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা এবং ডান অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে মিলিত হয়।

২) **বক্ষ লসিকা নালী ঃ** দেহের নিচের অংশ ও প্রতঙ্গের কিছু অংশে অবস্থিত লসিকা নালী নিয়ে এ নালী গঠিত হয়। এটি বাম সাবক্ল্যাভিয়ান ও বাম অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে উন্মুক্ত হয়। নালীটির নিচের দিকের স্ফীত অংশকে সিস্টার্না কাইলি (Cysterna chyli) বলে। সাধারণত পেশি সঞ্চালন, শ্বাসকাজ ও ধমনীর কাঁপনে দেহে লসিকা প্রবাহিত হয়। অন্ত্রের ভিলাইয়ে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লসিকা নালীকে ল্যাকটিয়াল (Lacteals) বলে।

লসিকা গ্রন্থি (Lymph gland)**/ লসিকা পর্ব** (Lymph node)

লসিকা নালীতে বেশ কাছাকাছি অবস্থিত গোল বা ডিম্বাকার ফোলা অংশগুলোকে লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব বলে। যান্ত্রিক ছাকনি হিসেবে কাজ করে বিভিন্ন জীবাণু ও ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে এগুলো দেহকে রক্ষা করে। ঘাড়ে, বগলে ও কুঁচকিতে লসিকাগ্রন্থি বেশি থাকে।

লসিকার সংবহন

লসিকা নালীর মাধ্যমে লসিকার ধীর সংবহন ঘটে। লসিকা নালীতে অবস্থানকারী অসংখ্য কপাটিকা লসিকা প্রবাহকে একমুখী করে রাখে, ফলে লসিকা কলা থেকে হৃদপিণ্ডের দিকে ধাবিত হয়। বক্ষ লসিকা নালীতে লসিকা প্রবাহ মিনিটে ১-১.৫ মিলিমিটার। লসিকানালী থেকে প্রতিদিন প্রায় ১,২০০-২,২৮০ মিলিমিটার লসিকা নির্গত হয়। খাদ্য গ্রহণের পর লসিকা প্রবাহ বেড়ে যায়।

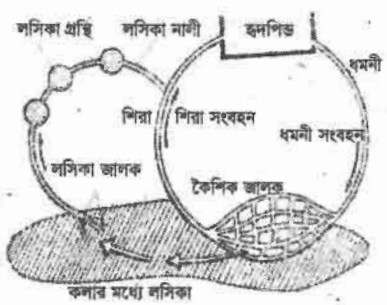

লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র

লসিকার কাজ

- **প্রোটিন পরিবহন ঃ** কলার ফাঁকা জায়গা থেকে অধিকাংশ প্রোটিন লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।
- **তৈলাক্ত বা স্নেহ পদার্থ পরিবহন ঃ** যে সব স্নেহকলা কৈশিকানালীর বাধা অতিক্রমে অক্ষম সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
- **পুষ্টি সাধন ঃ** দেহের যে সব কলা-কোষে রক্ত পৌছাতে পারে না সেখানে লসিকা অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে।
- **প্রতিরক্ষা ঃ** লসিকায় অবস্থিত লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট দেহের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে।
- **প্রতিরোধ ঃ** শ্বেতকণিকা বা লিম্ফোসাইট থেকে উৎপন্ন এন্টিবডি দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- **দেহরসের পুনর্বণ্টন ঃ** লসিকা রক্ত সংবহনের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তরল পদার্থের পরিবহনে অংশ নেয়।
- **শোষণ ঃ** তৈলাক্ত বা স্নেহ পদার্থ অন্ত্র থেকে শোষিত হয়ে লসিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।

প্লাজমা, সিরাম ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	প্লাজমা	সিরাম	লসিকা
১) প্রকৃতি	এটি রক্তের জলীয় অংশ।	রক্ত জমাট বাঁধার পর জমাট পদার্থ নিঃসৃত জলীয় অংশ।	রক্তজালক থেকে নিঃসৃত জলীয় অংশ।
২) রক্তকণিকা	এর মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা থাকে।	এতে রক্তকণিকা থাকে না।	প্রধানত লিম্ফোসাইট, শ্বেত রক্তকণিকা।
৩) ফাইব্রিনোজেন	বিপুল পরিমাণ	অনুপস্থিত	সামান্য পরিমাণ
৪) অবস্থান	প্রধানত রক্তবাহে ও হৃদপ্রকোষ্ঠে অবস্থান করে।	সাধারণ অবস্থায় দেহের মধ্যে থাকে না।	প্রধানত আন্তঃকোষীয় স্থানে অবস্থান করে।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। লসিকা বলতে কি বোঝ?
২। লসিকাতন্ত্র কাকে বলে?
৩। লসিকার উপাদান কী কী?
৪। লসিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব কত?
৫। লসিকার কাজ কি কি?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। লসিকা নালী কী? মানুষের লসিকাতন্ত্রের বর্ণনা দাও।
২। লসিকা গ্রন্থি কাকে বলে? চিত্রসহ লসিকার সংবহন বর্ণনা কর।
৩। প্লাজমা, লসিকা ও সিরামের পার্থক্য বর্ণনা কর।
৪। টিকা লেখ:- সিস্টার্না কাইলি, ল্যাকটিয়াল, লিম্ফ নোড, কলারস ও লসিকা নালী।
৫। মানবদেহের যে সব কলাকোষে রক্ত পৌঁছাতে পারে না সেখানে অক্সিজেন ও পুষ্টি কি ভাবে পৌঁছে?

সপ্তম অধ্যায়

শ্বসনতন্ত্র

শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

মানবদেহের যে তন্ত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন (O_2) গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ত্যাগ করে দেহে বিপাক (Metabolism) এ সহায়তা করে তাকে শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) বলে। শ্বসনতন্ত্রকে কাজের উপর ভিত্তি করে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ক) পরিবহনকারী অংশ ; খ) শ্বসনকারী অংশ।

ক) পরিবহনকারী অংশ

শ্বসনতন্ত্রের এই অংশটি কতকগুলো বায়ু পরিবহণকারী নালী নিয়ে গঠিত যা দেহের বহিঃপরিবেশ ও ফুসফুসের গ্যাসীয় বিনিময়স্থলের মধ্যে সংযোগ করে। এটি নিম্নবর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত ঃ

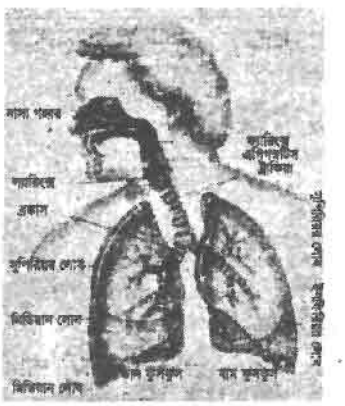

মানুষের শ্বসন তন্ত্র

১) নাক বা নাসিকা (Nose)
২) গলবিল (Pharynx)
৩) ল্যারিংক্স (Larynx)
৪) শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া (Trachea)
৫) ব্রঙ্কাই (Bronchi)

১। **নাসিকা (Nose)** ঃ নাক হচ্ছে অস্থি, তরুণাস্থি, পেশি ও যোজক কলানির্মিত একটি ফাপা অঙ্গ। এর ত্বক অসংখ্য তেল গ্রন্থি ও কিছু লোমবিশিষ্ট। ত্বকটি সম্মুখে নাসাছিদ্র অতিক্রম করে নাকের ভেস্টিব্যুল (Vestibule) এ প্রসারিত। এখানকার এপিথেলিয়াম স্তরীভূত ও আঁইশাকার এবং কতকগুলো শক্ত লোমবাহী।
নাসিকার অন্তঃস্থ গহবরটি নাসা গহবর (Nasal cavity) যা একটি পাতলা ব্যবধায়কে ডান ও বাম অর্ধে বিভক্ত। এর প্রাচীর সিলীয় এপিথেলিয়ামে আবৃত, মিউকাস ঝিল্লি - বেষ্টিত এবং রক্ত বাহিকা ও স্নায়ু প্রান্ত সমৃদ্ধ। নাসা গহবরের উপরের অংশের মিউকাস ঝিল্লি সংবেদী অলফ্যাক্টরী কোষযুক্ত।

নাসিকার কাজ ঃ

- নাসিকা প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশে সাহায্য করে।
- প্রশ্বাস বায়ুতে যে সব ধুলিকণা বা রোগজীবাণু থাকে, লোম ও শ্লেষ্মাঝিল্লি সেগুলোকে আটকে রাখে এবং ছাকনির মতো কাজ করে।
- নাসাপথ অতিক্রমকারী বাতাস কিছুটা গরম ও আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে।

২। **গলবিল** (Pharynx) ঃ নাসাগহবর পিছনদিকে দুটি ছিদ্র পথে নাসাগলবিল (Nasopharynx) এ উন্মুক্ত হয়। এরপর বাতাস মুখগলবিল (Oropharynx) অতিক্রম করে ল্যারিংক্সে প্রবেশ করে।

৩। **স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংক্স** (Larynx) ঃ এটি গলবিলের নিম্নাংশের সামনের দিকে অবস্থিত এবং শ্বাসনালীতে উন্মুক্ত ও ছোট ছোট খণ্ডবিশিষ্ট তরুণাস্থি নির্মিত অংশ। তরুনাস্থিগুলো অস্থি সংযোজক সন্ধি-বন্ধনী ও ঝিল্লিতে আবদ্ধ। উপরিভাগের তরুণস্থির উপরে এপিগ্লটিস (Epiglottis) নামে একটি জিহবাকৃতির ঢাকনা থাকে। ল্যারিংক্সের গহবরে একজোড়া স্থিতিস্থাপক, পর্দার মতো স্বরতন্ত্রী (Vocal cord) থাকে।

ল্যারিংক্সের কাজ

- খাদ্য গ্রাসের সময় এপিগ্লটিস (উপজিহবা) স্বরযন্ত্রকে ঢেকে রাখে, যাতে খাদ্যদ্রব্য ল্যারিংক্সে (স্বরযন্ত্রে) প্রবেশ করতে না পারে।
- স্বরতন্ত্রীর কাঁপনের ফলে স্বরের উৎপত্তি হয়। কথা বলতে বা কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে মুখ স্বরতন্ত্রী একসাথে ব্যবহৃত হয়।

৪। **ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী** (Trachea) : এটি লিগামেন্ট সংযুক্ত কতগুলো অর্ধবৃত্তাকার তরুনাস্থি নির্মিত প্রায় ১২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ২ সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট ফাঁপা নল। এর পশ্চাৎ প্রাচীর নরম এবং যোজক কলার ঝিল্লি নির্মিত ও অন্ননালী সংলগ্ন। ট্রাকিয়ার অন্তর্গাত্র মিউকাস ঝিল্লিতে আবৃত। এতে মসৃণ পেশিতন্তু, সিলিয়া ও মিউকাস-নিঃসারী গ্রন্থি থাকে। শ্বাসনালীর বহিঃপ্রাচীর যোজক-কলার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত।

ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীর কাজ

- শ্বাসনালীর মাধ্যমে বাতাস দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।
- বিরক্তিকর কোনো বস্তু ট্রাকিয়ায় ঢুকে গেলে ঝিল্লির সূক্ষ্ম রোম কাশির উদ্রেক করে তা উপরের দিকে পাঠিয়ে দেয় এবং ট্রাকিয়া পরিষ্কার রাখে।

৫। **ব্রঙ্কাই** (Bronchi) ঃ ট্রাকিয়া বক্ষ গহবরে প্রবেশ করে ৪র্থ বা ৫ম থোরাসিক কশেরুকার লেভেলে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যে দুটি শাখার সৃষ্টি করে, তাদের ব্রঙ্কাই বলে। প্রথম সৃষ্ট এ ডান ও বাম শাখাকে ব্রঙ্কাই (Bronchi) বলে। এরা যথাক্রমে ফুসফুসের ডান ও বাম খণ্ডে প্রবেশ করে অসংখ্য ক্ষুদ্রতর শাখা- প্রশাখা বিস্তার করে। এদের বলে ব্রঙ্কিওল (Bronchiole)।

ব্রঙ্কাইয়ের প্রাচীর ট্রাকিয়ার মতোই। ডান শাখাটি বাম শাখা অপেক্ষা চওড়া কিন্তু খাটো।

খ) শ্বসনকারী অংশ

শ্বসনকারী অংশের অঙ্গসমূহ যা ফুসফুসের ভেতরে থাকে :

১) ব্রঙ্কিওল (Bronchiol)
২) এলভিওলার নালী (Alveolar duct)
৩) এলভিওলাই (Alveoli)

ব্রঙ্কিওল ঃ মানুষের ফুসফুস বক্ষ গহবরে ডায়াফ্রামের উপরে হৃদপিণ্ডের দুইপাশে অবস্থিত হালকা লাল রঙের কোণাকার অঙ্গ। ফুসফুসের অভ্যন্তরে অবস্থিত শাখা নালীগুলোকে ব্রঙ্কিওল বলে। ব্রঙ্কিওলের প্রান্তে ফুসফুসের শ্বসন অঞ্চল অবস্থিত। এটি অসংখ্য এলভিওলার থলি নিয়ে গঠিত। মানবদেহে ডান ও বাম এ দুটি ফুসফুস (Lungs) রয়েছে। এ দুটি আবার খাঁজের সাহায্যে খণ্ডে (Lobe) বিভক্ত। ডান ফুসফুস তিন খণ্ডবিশিষ্ট এবং বাম ফুসফুস দুই খণ্ডবিশিষ্ট।

এলভিওলার নালী ঃ ব্রংকিওলের অতিসূক্ষ্ম ও তরুণাস্থিবিহীন প্রান্তগুলোকে এলভিওলার নালী (Alveolar duct) বলে। প্রতিটি নালী একেকটি এলভিওলার থলিতে (Alveolar sac) উন্মুক্ত হয়।

এলভিওলাই ঃ প্রতিটি এলভিওলার থলি কতকগুলো এলভিওলাই (Alveoli) নিয়ে গঠিত। ফুসফুসের বহির্তল দ্বিস্তরী ভিসেরাল প্লুরা (Visceral pleura) ঝিল্লিতে আবৃত।

এলভিওলাসের গঠন ঃ

ফুসফুসে স্কোয়ামাস এপিথেলীয় কোষে গঠিত ও কৈশিক-জালিকাসমৃদ্ধ প্রকোষ্টের মতো গ্যাসীয় বিনিময় তলকে একবচনে এলভিওলাস এবং বহুবচনে এলভিওলাই বলে। মানুষের ফুসফুসে প্রায় ৭০-৮০ বর্গমিটার আয়তনের

তল জুড়ে ৭০০ মিলিয়ন (৭০ কোটি) এরও বেশি সংখ্যক এলভিওলাই রয়েছে।
প্রত্যেক এলভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, মাত্র ০.১ μm (০.০০০১ মিমি) পুরু। এর বহির্দেশ ঘন কৈশিকজালিকা সমৃদ্ধ (কৈশিক নালিকা গুলি পালমোনারী ধমনী থেকে সৃষ্টি হয়। পরে এগুলি পুনর্মিলিত হয়ে পালমোনারী শিরা গঠন করে)। প্রাচীরটি আর্দ্র স্কোয়ামাস (আঁইশাকার) এপিথেলিয়াম নির্মিত। এতে কোলাজেন ও ইলাস্টিক তন্তুও রয়েছে। ফলে শ্বসনের সময় সংকোচন-প্রসারণ সহজতর হয়।

এভিওলাস-প্রাচীরের কিছু বিশেষ কোষ প্রাচীরের অন্তঃতলে ডিটারজেন্ট (Detergent) -এর মতো রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। এ পদার্থকে সারফেক্ট্যান্ট (Surfactant) বলে।

সারফেক্ট্যান্টের কাজ

- এ পদার্থ এলভিওলাস-প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান (Surface tenstion) কমিয়ে দেয়, ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে।
- এ পদার্থ বাতাস ও অ্যালভিওলাস-প্রাচীর সংলগ্ন তরল পদার্থ O_2 ও CO_2 এর দ্রুত বিনিময়ে সাহায্য করে।
- এ পদার্থ অ্যালভিওলাসে আগত জীবাণুও (ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করে। ২৩ সপ্তাহ সয়স্ক মানবভ্রুণে সর্বপ্রথম সারফেক্ট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয়। এ কারনে ২৪ সপ্তাহের আগে মানবভ্রুণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না। অনেক দেহে তাই এ সময়কাল পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয়।

শ্বসন পদ্ধতি (Respiretion)
শ্বসন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন (O_2) পরিবাহিত হয়ে গ্রহণ করা খাদ্যকে জারিত (Oxydation) করে বিপাকের (Metabolism) জন্য দেহ কোষ নিয়ে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও অন্যান্য পদার্থকে কোষে থেকে পরিবেশে নিয়ে আসে।

শ্বসন দুই পর্যায়ে হয়ে থাকে যথা -

১) বহিঃশ্বসন (Enternal respiration)
২) অন্তঃশ্বসন (Internal respiration)।

বহিঃশ্বসন (External rispration) : এতে অক্সিজেন (O_2) শ্বসিত হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) দেহ থেকে বের করে দেয়। **যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে অর্থাৎ অক্সিজেন ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে বহিঃশ্বসন বলে।** এই বিনিময় ঘটে ফুসফুসের এলভিওলার বাতাস (Alveolar air) ও এলভিওলির প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিক জালিকার রক্তের মধ্যে।

প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাসে O_2 এর চাপ ফুসফুসের রক্তের O_2 এর চাপ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় অক্সিজেন এলভিওলাস থেকে ফুসফুসের কৈশিকনালীর রক্তে প্রবেশ করে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে। কিছু পরিমাণ O_2 রক্তরসেও দ্রবীভূত হয়। একই সাথে ফুসফুসের কৈশিকনালীর রক্তে (CO_2) এর চাপ এলভিওলাসে (CO_2) এর চাপের চেয়ে বেশি হওয়ার ফুসফুসের কৈশিকজালক থেকে (CO_2) এলভিওলাসে প্রবেশ করে।

বহিঃশ্বসন দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা -

ক) প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration or inhalation) এবং
খ) নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ (Expiration or Exhalation)।

নিঃশ্বাস গ্রহণ (Inspiraion) হলো ফুসফুসের বাতাস (Air) গ্রহণ করা। এতে সময় লাগে দুই সেকেণ্ড (2 second); প্রশ্বাস ত্যাগ (Expiration) হলো ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দেয়া এতে সময় লাগে তিন সেকেণ্ড (3 second)।

শ্বাসক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো ঃ

- অক্সিজেন সরবরাহ করা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করা।
- অ্যামোনিয়া, কিটোন বডি, অপ্রয়োজনীয় তেল, পানি, অ্যালকোহল প্রভৃতি বের করে দেওয়া।
- রক্তের পানি ও অন্যান্য অংশের সমতা রক্ষা করা।
- শরীরের তাপের সমতা রক্ষা করা।

প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। শ্বাসকার্যের কোন বিরাম নেই। ঘুমের সময় কিছু কম থাকে, পরিশ্রম বা ব্যায়ামের সময় তা বেড়ে যায়। প্রতি মিনিটে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষ ১২-১৮ বার এবং নবজাত শিশু ৪০ বার শ্বাস ক্রিয়া করে থাকে।

প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ ঃ স্নায়ু উদ্দীপনার প্রভাবে ডায়াফামের পেশি (বৃত্তাকার অরীয় পেশিতন্তু) এবং প্রতিজোড়া পর্শুকার মাঝখানে অবস্থিত বহিঃ ও অন্ত ঃ ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচন প্রসারণে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই পর্যায়টি নিম্নোরূপভাবে সম্পন্ন হয় ঃ

ক) বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি সংকুচিত হয় এবং অন্তঃস্থ ইন্টারকোস্টাল শিথিল হয়। ফলে পাঁজর উপরের দিকে উঠে যায় ।

খ) তখন ডায়াফ্রাম-পেশিও সংকুচিত হয়, ফলে ডায়াফ্রাম সমতল হয়ে যায়।

গ) উপরোক্ত দুই কর্মকাণ্ডের ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে যায় (বুক প্রসারিত হয়)। এতে বক্ষগহ্বর ও ফুসফুস অভ্যন্তরীণ চাপ বায়ুমণ্ডলীর চাপের চেয়ে কমে যায়।

ঘ) এ কারণে বাতাস নাসাপথের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং এলভিওলাই ফুলে উঠে। ফুসফুস ও বায়ুমণ্ডলীয় বাতাসের চাপ সমান না হওয়া পর্যন্ত বাতাসের চাপ অব্যাহত থাকে।

নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ ঃ এটি প্রশ্বাসের পরই সংগঠিত একটি নিষ্ক্রিয়া প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলি প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য তা ঘটে।

নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শুকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়, উদরীয় পেশীগুলির চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়, ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং পস্নুরার (Pleura) অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকাপথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

অন্তঃশ্বসন (Internal respiration) ঃ শ্বসনের এই ধাপ কলায় সংঘটিত হয়। অন্তঃশ্বসনে দেহকোষ দ্বারা বিপাকের জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেওয়া হয়। **যে প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত থেকে অক্সিজেন কলা-কোষে প্রবেশ ও কোষমধ্যস্থ খাদ্যের তরল পদার্থ রক্তের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে এবং কোষ থেকে রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিনিময় (Gaseous exchange) হয় তাকে অন্তঃশ্বসন বলে।**

ফুসফুসে গৃহীত অক্সিজেন (O_2) বায়ুথলির চারদিকে অবস্থিত কৈশিকনালীতে প্রবেশ করে লোহিত রক্তকণিকার দেহে প্রবাহিত হয় এবং কলা-কোষে বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন (O_2) মুক্ত হয়। এবং কোষের চারপাশের রসে বাহিত হয়। কোষের শর্করা জাতীয় খাদ্য (গ্লুকোজ) জারিত হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), পানি ও তাপ উৎপন্ন করে। এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) কৈশিকনালীর ভেতরে প্রবেশ করে ফুসফুসে বাহিত হয়।

এলভিওলাস থেকে কোষ পর্যন্ত অক্সিজেন (O_2) -এর গতিপথ

বায়ু থেকে গৃহীত অক্সিজেন O_2 শ্বসনের উদ্দেশ্যে ফুসফুসের এলভিওলাস থেকে দেহের প্রতিটি কোষে পৌছায়। এলভিওলাস থেকে দেহকোষে পৌছানোর এ গতিপথে অক্সিজেনকে (O_2) ৩ ধরনের কোষমাধ্যম অতিক্রম করতে হয়। কোষ-মাধ্যম গুলো হচ্ছে :

১) এলভিওলাসের স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ,
২) কৈশিকজালিকার এণ্ডোথেলিয়াল কোষ এবং
৩) এরিথ্রোসাইট (লোহিত রক্তকণিকা)।

এলভিওলাস-প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা এবং এককোষ স্তরবিশিষ্ট। কৈশিকনালিকার প্রাচীরও অত্যন্ত পাতলা, এককোষ স্তরবিশিষ্ট এবং এলভিওলাস-প্রাচীরের ঘনসংলগ্ন অবস্থানে থাকে (দুই প্রাচীরের মাঝখানে কেবল ০.০০৫ মিলি মিটার ফাঁক থাকে)। কৈশিক নালিকাগুলো এতো সরু যে এরিথ্যোসাইটগুলোকে নালিকাপ্রাচীরের গায়ে লেগে থেকে এক সারি হয়ে ধীর গতিতে অতিক্রম করতে হয়।

এলভিওলার ও কৈশিকনালিকার প্রাচীর পাতলা হওয়ায় এবং দুই প্রাচীরের ব্যবধান কম হওয়ায় সহজে ও দ্রুত অক্সিজেন (O_2) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রথমে এলভিওলাসের অন্তঃতলে অবস্থিত তরল পদার্থ হয়ে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষস্তর ও পরে কৈশিকনালিকার এণ্ডোথেলিয়াল কোষস্তর অতিক্রম করে। এক সেকেণ্ড বা তারও কম সময়ের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। অন্যদিকে এরিথ্রোসাইটগুলি যেহেতু নালিকা প্রাচীরের গায়ে সেঁটে থেকে ধীরে অতিক্রম করে তাই ওই সময়ের ভেতর অক্সিজেন (O_2) এরিথ্রোসাইট প্রাচীরও অতিক্রম করে এবং কণিকার হিমোগ্লোবিনে পৌছে অক্সি-হিমোগ্লোবিন গঠন করে। এইভাবে অক্সিজেন (O_2) অণু দুটি কোষ-মাধ্যম (স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল ও এণ্ডোথেলিয়াল কোষ) অতিক্রম করে তৃতীয় কোষ-মাধ্যমে (এরিথ্রোসাইটে) বাহিত হতে থকে।

এলভিওলাইয়ের কৈশিনোলিকাগুলো মিলিত হয়ে যে পালমোনারী মিলিত হয়ে শিরা গঠন করে তার ভেতর দিয়ে এরিথ্রোসাইটগুলো প্রথম হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দে ও পরে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃদপিণ্ডের সংকোচনে রক্ত দেহের সর্বত্র পরিবাহত হয়; কৈশিকনালিকার মাধ্যমে প্রতিটি কোষের কাছাকাছি পৌছায় এবং অক্সি-হিমোগ্লোবিন ভেঙে অক্সিজেন (O_2) মুক্ত হয়। মুক্ত অক্সিজেন (O_2) এরিথ্রোসাইট প্রাচীর ভেদ করে কলারসে প্রবেশ করে। কলারস থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন (O_2) দেহের কোষঝিল্লি অতিক্রম করে কোষের অভ্যন্তরে প্রবশ করে। এইভাবে ৩ টি কোষ-মাধ্যম অতিক্রম করে অক্সিজেন (O_2) ৪র্থ কোষরূপী দেহের কোষে প্রবেশ করে।

শ্বসনে রাসায়নিক পদ্ধতি

শ্বসনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা

সরল প্রোটিন গ্লোবিন (৯৬%) এবং লৌহ ঘটিত পদার্থ হিম (৪%) -এর সমন্বয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন লাল বর্ণের একটি শ্বাসরঞ্জক (Respiratory pigment)।

শ্বসনের সময় অক্সিজেনের ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রবিষ্ট সমস্ত অক্সিজেনই মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এর এক বড় অংশ লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লেবিন (Oxyhaemoglobin) নামে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ গঠন রক্তরসে (প্লাজমায়) অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। রক্তরসে যত বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হবে তার সাথে সংগতি রেখে অক্সিহিমোগ্লেবিন যৌগ তৈরি হবে। অন্যদিকে অক্সিজেনের পরিমাণ যে হারে কমে যাবে যৌগ সে হারে ভেঙে যাবে এবং অক্সিজেন মুক্ত হয়ে রক্তরসে প্রবেশ করবে।

অপর দিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন নামে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃদপিণ্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে।

দেহে রক্ত পরিবহনের সময়ে বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তরস থেকে স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত কলারসে চলে যায়। ফলে রক্তরসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। হিমোগ্লোবিন তখন তার সাথে যুক্ত অক্সিজেন ছড়াতে শুরু করে এভাবে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসে ও পরে কলারসে চলে যায়।

অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহনের রাসায়নিক পদ্ধতি

শ্বসনের রাসায়নিক পদ্ধতি কলায় সংঘঠিত হয় এবং রক্ত থেকে অক্সিজেন কলাকোষে প্রবেশ ও কোষমধ্যস্থ খাদ্য অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত করে শক্তি উৎপন্ন করে এবং কোষ থেকে রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) পরিত্যাগ করে। শ্বসনের এই সব রাসায়নিক কার্যাবলি কলা-কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয় বলে একে অন্তঃশ্বসন বলা হয়।

অন্তঃস্বশনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা-

১) অক্সিজেন (O_2) পরিবহন,
২) খাদ্যবস্তুর জারণ এবং
৩) কার্বন–ডাই–অক্সাইড (CO_2) পরিবহন।

১) অক্সিজেন পরিবহণ

ধমনী রক্তে অক্সিজেন পরিবহন নিম্নে বর্ণিত ৩ টি পর্যায়ে বিভক্ত :-

ক) ফুসফুস থেকে অক্সিজেন (O_2) এর রক্তে প্রবেশ ঃ ফুসফুসের এলভিওলি ও এদের বেষ্টনকারী কৈশিক জালিকায় রক্তের চাপ পার্থক্যের জন্য অক্সিজেন (O_2) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে।

খ) ধমনী রক্তে অক্সিজেন (O_2) পরিবহন ঃ ফুসফুস থেকে অক্সিজেন (O_2) রক্তে প্রবেশের পর ধমনীর রক্তে অক্সিজেন দুইভাবে পরিবাহিত হয়, যথা ঃ– ভৌত দ্রবণরূপে এবং রাসায়নিক যৌগরূপে। স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন (০.৩ মিলি লিটার অক্সিজেন ঃ ১০০ মিলি লিটার রক্ত) দ্রবীভূত হয়ে ভৌত দ্রবণরূপে কলা–কোষে বাহিত হয়। অধিকাংশ অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের লৌহ অংশের সাথে শিথিল ও অস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগরূপে রক্তে বাহিত হয় (১৯ মিলি লিটার অক্সিজেন ঃ ১০০ মিলি লিটার

রক্ত)। এক অণু হিমোগ্লোবিনের সাথে ৪ অণু অক্সিজেন নিম্নোক্তভাবে যুক্ত হতে পারে (এক গ্রাম হিমোগ্লোবিনে ১.৩৪ মিলি লিটার অক্সিজেন বাহিত হয়)।

$$Hb_4 + 4O_2 \longrightarrow Hb_4O_8$$

হিমোগ্লোবি অক্সিজেন অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ

গ) রক্ত থেকে অক্সিজেন এর কলা-কোষে প্রবেশ ঃ ধমনীরক্তে ও কলারসে অক্সিজেন (O_2) এর চাপ পার্থক্যের জন্য অক্সিজেন (O_2) হিমোগ্লোবিন থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রথমে কলারস এবং পরে প্লাজমা মেমব্রেন অতিক্রম করে কলা-কোষে প্রবেশ করে।

২) খাদ্যবস্তুর জারণ

এ পর্যায়ে কলা-কোষের গ্লাইকোজেন বা গ্লুকোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট শ্বাস-উৎচেসকের উপস্থিতিতে অক্সিজেন (O_2) দিয়ে জারিত হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), পানি (H_2O) ও তাপশক্তি উৎপন্ন করে।

জারণ প্রক্রিয়া আবার দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, যথা- গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্র।

অবাত জারণ প্রক্রিয়া গ্লাইকোজেন বা গ্লুকোজের পাইরুভিক অ্যাসিড বা ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরকে **গ্লাইকোলাইসিস** বলে। এটি পেশি ও অন্যান্য কলার সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। পর পর কয়েকটি ধাপে নির্দিষ্ট এনজাইমের সাহায্যে এক অণু গ্লুকোজ থেকে ২ অণু পাইরুভিক অ্যাসিড ও ATP উৎপন্ন হয়, পরে তা ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে অক্সিজেনের উপস্থিতে পাইরুভিক অ্যাসিড বায়ব বিপাকের মাধ্যমে বিভিন্ন কলা-কোষে মাইটোকণ্ড্রিয়ার ভেতর জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও ATP (Adenosine-tri-phosphate) শক্তি উৎপন্ন করে।

প্রতিবারের জারণ প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ থেকে মোট ৩৮ টি ATP অণু পাওয়া যায়।

৩) কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহন

কলাকোষ থেকে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) শিরারক্তের মাধমে ফুসফুসে পৌছায়। কলাকোষ থেকে ফুসফুসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর পরিবহনকে নিম্নবর্ণিত চার ভাগে ভাগ করা যায় -

ক) কলাকোষ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর শিরারক্তে প্রবেশ ঃ কোষীর শ্বসনের ফলে (খাদ্যবস্তুর জারণের ফলে) উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) চাপ পার্থক্যের দরুন ব্যাপিত হয়ে ক্রমান্বয়ে কলাকোষ ও কলারস হয়ে কৈশিক জালিকার রক্তে প্রবেশ করে।

খ) শিরারক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর পরিবহন ঃ শিরারক্তের রক্তরস ও লোহিত কণিকায় কার্বন–ডাই–অক্সাইড দুভাবে পরিবাহিত হয়। যথা ঃ– ভৌত দ্রবণরূপে ও রাসায়নিক যৌগরূপে।

i) রক্তরসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর পরিবহন ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভৌত দ্রবণরুপে রক্তরসে প্রবেশের পর রক্তরসের পানির সংঙ্গে বিক্রিয়া শেষে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে বাহিত হয়।

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$$

কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানি কার্বনিক অ্যাসিড

কার্বন-ডাই-অক্সাইড রাসায়নিক যৌগরুপে রক্তরসে প্রবেশ করে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ উৎপন্ন করে। নিচে তা বর্ণনা করা হলো ঃ

প্রোটিন-কার্বামিনো যৌগরূপে ঃ রক্তরসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর একাংশ সরাসরি প্লাজমাপ্রোটিনের এমাইনো গ্রুপের সংগে যুক্ত হয়ে প্রোটিন-কার্বামিনো যৌগ গঠন করে বাহিত হয়।

$$CO_2 + Pr.NH_2 \longrightarrow Pr.NHCOO^- + H^+$$

কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্লাজমাপ্রোটিন এমাইনো প্রোটিন কার্বামিনো হাইড্রোজেন

সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট রূপে ঃ ক্লোরাইড শিফ্টের মাধ্যমে লোহিত রক্তকণিকা থেকে বাই-কার্বনেট (HCO_3^-) রক্তরসে প্রবেশ করে এবং সোডিয়াম (Na^+) -এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট উৎপাদন করে।

$$Na^+ + HCO_3^- \longrightarrow NaHCO_3$$

সোডিয়াম বাই-কার্বনেট সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট

*ক্লোরাইড শিফ্ট (Chloride shift) ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড যখন কলাকোষ থেকে রক্তে প্রবেশ করে, তখন সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এর কেবল ক্লোরাইড আয়ন রক্তরস থেকে লোহিত কণিকার মধ্যে ঢুকে যায় আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড যখন রক্ত থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে, তখন ক্লোরাইড আয়ন লোহিত কণিকা থেকে রক্তরসে ফিরে আসে এবং সোডিয়াম আয়নের সংগে আবার যুক্ত হয়। ক্লোরাইড আয়নের এই পর্যায়ক্রমিক স্থানান্তরকে ক্লোরাইড শিফ্ট বলে।

ii) **লোহিত রক্ত কণিকায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) পরিবহন ঃ** কার্বন–ডাই–অক্সাইড স্বাভাবিক অবস্থায় ভৌত দ্রবণরূপে লোহিত রক্ত কণিকার তরল পদার্থে কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে পানির সংগে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিডরূপে বাহিত হয়।

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক এনহাইড্রেজ}} H_2CO_3$$

কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানি কার্বনিক এসিড

কার্বন-ডাই-অক্সাইড লোহিত রক্তকণিকায় রাসায়নিক যৌগরূপে প্রবেশ করে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। নিচে তা বর্ণনা করা হলো ঃ

কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন যৌগরূপে ঃ লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবিষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একাংশ হিমোগ্লোবিনের এমাইনো গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে বাহিত হয়।

$$CO_2 + Hb.NH_2 \longrightarrow Hb.NHCOOH$$

কার্বন-ডাই-অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের এমাইনো কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন

পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট যৌগরূপে ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে তার পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে কার্বনিক অ্যাসিড গঠন করে তা হিমোগ্লোবিন-পটাসিয়াম যৌগের সংগে যুক্ত হয়ে পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট যৌগ গঠন করে বাহিত হয়।

$$H_2CO_3 + KHb_4 \longrightarrow KHCO_3 + HHb_4$$

কার্বনিক অ্যাসিড হিমোগোবিন-পটাশিয়াম পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট

লোহিত রক্তকণিকার ক্লোরাইড শিফ্‌ট ঃ রক্তরস থেকে ক্লোরাইড লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে এবং বাই-কার্বনেট মুক্ত হয়ে রক্তরসে চলে যায়। এই সময় লোহিত রক্তকণিকায় অভিস্রবণ চাপও বৃদ্ধি পায়।

$$KHCO_3 + Cl^- \longrightarrow KCl + HCO_3^-$$

পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট ক্লোরাইড পটাসিয়াম ক্লোরাইড বাই-কার্বনেট

মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) উৎপাদন ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড উপরোক্তভাবে গঠিত বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের আকারে রক্তবাহিত হয়ে ফুসফুসে এসে বিশ্লিষ্ট হলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) মুক্ত হয়ে।

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ফুসফুসে প্রবেশ ও ত্যাগ ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত এলভিওলাইয়ের সংস্পর্শে এসে বিপরীত বিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এলভিওলিতে প্রবেশ করে এর পর নাসাপথে বেরিয়ে যায়।

অন্তঃশ্বসন ও বহিঃশ্বসনের মধ্যে পার্থক্য

অন্তঃশ্বসন	বহিঃশ্বসন
১। অন্তঃশ্বসন একটি জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া	১। বহিঃশ্বসন একটি ভৌত প্রক্রিয়া
২। এই প্রক্রিয়া সজীব কোষের অভ্যন্তরে সম্পন্ন হয়।	২। এই প্রক্রিয়া কোষের বাইরে সম্পন্ন হয়।
৩। এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।	৩। এই প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হয় না।
৪। এই প্রক্রিয়ায় এনজাইমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।	৪। এই প্রক্রিয়ায় এনজাইমের কোনো ভূমিকা নেই।
৫। এই প্রক্রিয়া গাইকোলাইসিস ও ক্রেবস্ চক্র নামক দুটি পর্যায়ে বিভক্তি।	৫। এই প্রক্রিয়া শ্বাস– গ্রহণ ও শ্বাস–ত্যাগ নামক দুটি পর্যায়ে বিভক্ত।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শ্বসন বলতে কি বোঝ?

২। শ্বসনের পর্যায় কয়টি? কি কি?

৩। শ্বসনতন্ত্রকে কাজের উপর ভিত্তি করে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?

৪। শ্বসনতন্ত্রের পরিবহনকারী অংশ কি কি অঙ্গ নিয়ে গঠিত?

৫। শ্বসনতন্ত্রের শ্বসনকারী অংশের অঙ্গগুলির নাম লেখ।

৬। বহিঃশ্বসন বলতে কি বোঝ?

৭। বহিঃশ্বসনের ভাগ কয়টি ও কি কি?

৮। নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস বলতে কি বোঝ?

৯। অন্তঃশ্বসন কাকে বলে?

১০। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ প্রতি মিনিটে কত বার শ্বাস ক্রিয়া করে ?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। শ্বসনতন্ত্রের পরিবহনকারী অঙ্গগুলোর বিবরণ দাও।

২। শ্বসনতন্ত্রের শ্বসনকারী অংশের অঙ্গগুলোর বর্ণনা দাও।

৩। শ্বাসক্রিয়ার উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর।

৪। বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের মধ্যে পার্থক্য কি?

৫। মানবদেহে কিভাবে বহিঃশ্বসন সম্পন্ন হয় বর্ণনা কর।

৬। মানবদেহে অন্তঃশ্বসনের গতিপথ বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

পরিপাকতন্ত্র

পরিপাকতন্ত্র (Digestive system)

পরিপাকতন্ত্র হলো যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। **'মানবদেহের যে সকল অঙ্গের মাধ্যমে জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভেঙে দ্রবণীয় সরল, তরল এবং দেহকোষের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে তাদেরকে একত্রে পরিপাকতন্ত্র (Digestive system) বলে'**।

পরিপাকতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা:-

১) পরিপাক নালী (Alimentary tract)
২) সংশ্লিষ্ট পরিপাক অঙ্গ (Accessories of digestive organ)

পরিপাক নালীর অংশগুলো হলো ঃ

১) মুখ (Mouth)
২) মুখ বিবর (Mouth/Oral cavity)
৩) গলবিল (Pharynx)
৪) অন্ন নালী (Oesophagus)
৫) পাকস্থলী (Stomach)
৬) ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine)
৭) বৃহদান্ত্র (Large intestine)

সংশ্লিষ্ট পরিপাক অঙ্গগুলো হলো–

১) দাঁত (Teeth)
২) লালাগ্রন্থি (Salivary gland)
৩) যকৃত (Liver)
৪) অগ্নাশয় (Pancreas)।

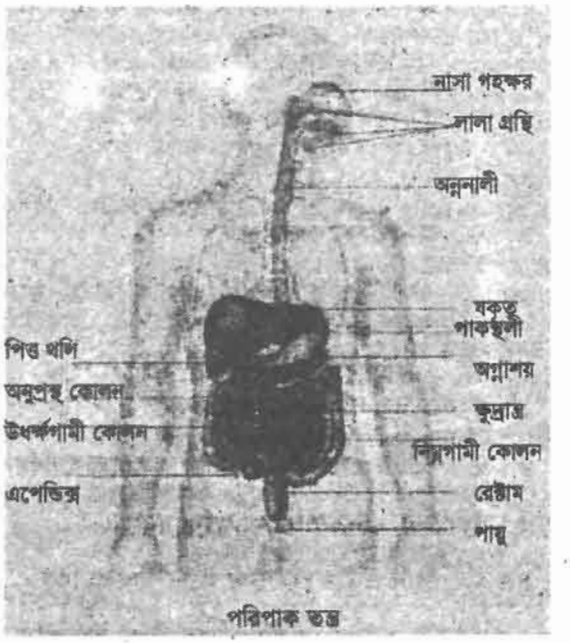

পরিপাক তন্ত্র

পরিপাক নালী (Digestive tract) ঃ

মানুষের পরিপাক নালী মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত ৮-১০ মিটার লম্বা। পরিপাক নালী নিম্নে বর্নিত অংশসমুহে বিভক্ত ঃ

১) মুখ : পরিপাক নালীর শুরু মুখ থেকে। এটি নাসা ছিদ্রের নিচে অবস্থিত এক আড়াআড়ি ছিদ্র যা একটি করে উপরের ও নিচের ঠাঁটে বেষ্টিত থাকে। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু পরিপাক নালীতে প্রবেশ করে।

২) মুখবিবর : মুখ পরবর্তী গহবরটি মুখবিবর। একে ঘিরে এবং এর ভেতরে কয়েকটি অঙ্গ অবস্থিত। এসব অঙ্গের মধ্যে গাল, দাঁত, মাড়ি, জিহক্ষা ও তালু প্রধান। মুখ বিবরের উর্ধ্ব প্রাচীর তালুর অস্থি ও পেশি দিয়ে, সামনের প্রাচীর ঠোঁটের পেশি দিয়ে এবং পাশের প্রাচীর গালের পেশি নিয়ে গঠিত। তালুর অগ্রভাগ অস্থি নির্মিত ও শক্ত, পশ্চাৎভাগ পেশল ও নরম। কোমল তালুর পেছনের প্রান্তের মধ্যভাগ থেকে একটি পেশল আলজিহবা মুখবিবরে ঝুলে থাকে। মানুষের মুখবিবরে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি থাকে, যথা :-নিচের চোয়ালের পাশে অবস্থিত সাবম্যাক্সিলারী (Submaxillary) জিহবার নিচে অবস্থিত সাবলিংগুয়াল (Sublingual) এবং কানের নিচে প্যারাটিড (Parotid) গ্রন্থি। মানুষের উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল দন্তযুক্ত।

দন্ত সংকেত ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক চোয়ালের দন্ত কোটরে ১৬ টি দাঁত থাকে। চোয়ালের কেন্দ্রে ৪টি ইনসিসর (Incisors) বা কর্তন, তাদের দুপাশে ১টি করে ক্যানাইন (Canine) বা ছেদন, ক্যানাইনের পাশে দুইটি করে প্রিমোলার (Premolar) বা অগ্রপেষণ এবং চোয়ালের দুই প্রান্তে রয়েছে ৩টি করে মোলার (Molar) বা পেশন দাঁত। একটি সরল রেখার উপর ও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর লিখে ঐ ধরনের দাঁত প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কয়টি আছে তালেখা হয়। এর পর প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশের মোট দাঁতের সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুন করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ সংকেত অনুযায়ী মানুষের দন্ত সংকেত নিম্ন রুপ :

$$\frac{I_2\ C_1\ P_2\ M_3}{I_2\ C_1\ P_2\ M_3} = \frac{8X2}{8X2} = 16 + 16 = 32$$

নিম্নে চোয়ালের অস্থির সাথে জিহ্বা যুক্ত থাকে। এর পৃষ্ঠতলে থাকে ফ্লাস্ক আকৃতির স্বাদকোরক (Taste buds)।

দাঁতের কাজ

ক) খাদ্যদ্রব্যকে কাটা, ছেঁড়া ও পেষণে দাঁত অংশ নেয়।

খ) জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করে; খাদ্য পেষণের সময় লালারস মিশ্রিত করে; এবং গিলবার জন্য পেছনে ঠেলে দেয়।

গ) লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালার মিউসিন খাদ্যকে পিচ্ছিল করে। টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

৩) **গলবিল ঃ** মুখ বিহবরের ঠিক পেছনে প্রায় ১০ সেন্টমিটার দীর্ঘ ও চওড়া ফানেলাকার অংশকে গলবিল বলে।
গলবিলের কাজ : গলবিল খাবারকে মুখবিহবর থেকে অন্ননালীতে পৌঁছে দেয়।

৪) **অন্ননালী ঃ** গলবিলের ঠিক পেছন থেকে প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার অন্ননালী সৃষ্টি হয়ে শ্বাসনালীর পেছন দিক ও বক্ষ - গহবরের মধ্য দিয়ে উদরে অবস্থিত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

৫) **পাকস্থলী** (Stomach) ঃ এটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ।

পাকস্থলীকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

ক) একটি বড় অংশ নাম কার্ডিয়াক (Cardiac part)

খ) অপরটি ছোট অংশ নাম পাইলোরিক (Pyloric part)।

কার্ডিয়াক অংশ আবার ২টি ভাগে বিভক্ত, যথা–

ক) ফানডাস (Fundus),

খ) বডি (Body)।

পাইলোরিক অংশ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা–

ক) পাইলোরিক এনট্রাম (Pyloric antram),

খ) পাইলোরিক ক্যানেল (Pyloric canel)।

সেই সঙ্গে পাকস্থলীর আছে–

ক) দুটি মুখ (Opening),

খ) দুটি কিনারা (Curvature),

গ) দুটি তল (Surface)।

পাকস্থলী

মুখ (Opening) দুইটি হচ্ছে :–
১) কার্ডিয়াক মুখ (Cardiac opening),
২) পাইলোরিক মুখ (Pyloric opening)।

কিনারা (Curvature) দুইটি হচ্ছে–
১) ডান অবতল কিনারা (Lesser curvanture),
২) বাম উত্তল কিনারা (Greater Curvature)।

তল (Surface) দুটি হচ্ছে–
১) সম্মুখ উপরি তল (Antero superior surface),
২) পিছন নিম্ন তল (Postero inferior surface)।

কার্ডিয়াক ছিদ্র (Cardiac opening) পাকস্থলির উপরের প্রান্তে অবস্থিত। এর মাধ্যমে (Oesophagus) এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা হয়। এই অংশে একটি বৃত্তাকার পেশিবলয় আছে তাকে কার্ডিয়াক স্ফিংক্টার (Cardiac sphincter) বলে। পাইলোরিক ছিদ্র (Pyloric opening) পাকস্থলির নিচের প্রান্তে অবস্থিত। এর মাধ্যমে ডিওডেনাম (Deodenum) -এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা হয়। এই অংশে একটি বৃত্তাকার পেশিবলয় আছে তাকে পাইলোরিক স্ফিংক্টার (Pyloric sphincter) বলে।

পাকস্থলীর প্রত্যেক অংশের মিউকোসা স্তরে রয়েছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি। পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের প্রায় ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি) গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে গ্রন্থিগুলো গ্যাস্ট্রিক রস (Gastric juice) ক্ষরণ করে। প্রতিদিন প্রায় দুই লিটার গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয়।

পাকস্থলীর কাজ

- এটি খাদ্য সাময়িকভাবে জমা রাখে।
- HCl খাদ্যবাহিত ব্যাকটেরিয়া বা বিজাতীয় পদার্থকে বিনষ্ট করে জীবণুনাশক হিসেবে কাজ করে।
- মিউসিন HCl এর ক্ষতিকর ভূমিকা থেকে পাকস্থলী প্রাচীরকে রক্ষা করে।
- গ্যাস্ট্রিক রসের উৎসেচকগুলো HCl এর উপস্থিতিতে আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাক শুরু করে।

৬। **ক্ষুদ্রান্ত্র ঃ** এটি পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পর থেকে শুরু করে ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা অংশ। ক্ষুদ্রান্ত্র ৩ অংশে বিভক্ত, যথা:- ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম।

ডিওডেনাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ যা দেখতে U-আকৃতির ও ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। জেজুনাম মধ্যাংশ, লম্বায় প্রায় আড়াই মিটার। শেষ অংশটি ইলিয়াম যা ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন-পঞ্চামাংশ গঠন করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজ

- পাকস্থলী থেকে প্রাপ্ত কাইম (Chyme) -এর অগ্রসর ঘটায়।
- এর নিজস্ব ও সংশ্লিষ্ট পৌষ্টিক গ্রন্থি-নিঃসৃত রসের সহায়তায় পরিপাক অক্ষুন্ন রাখে।
- পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্ত বাহিকায় ও লসিকা বাহিকায় শোষণ করে।

৭। **বৃহদান্ত্র ঃ** এটি ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ২ মিটার লম্বা অংশ। এর ৩টি অংশ, যথা:- সিকাম, কোলন ও মলাশয়।

সিকাম বৃহদান্ত্রের প্রথম অংশ, দেখতে বদ্ধ থলির মতো, লম্বায় ৬ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় ৭.৫ সেন্টিমিটার। এর বদ্ধ অংশটি নিম্নমুখী ও খোলা অংশ উর্ধ্বমুখী হয়ে কোলনের সাথে যুক্ত।

সিকামের বহির্বৃদ্ধিরূপে উত্থিত ও বদ্ধভাবে সমাপ্ত অ্যাপেণ্ডিক্স (Appendix) এর সংযোগস্থল একটি মিউকাসঝিল্লি নির্মিত কপাটিকায় রক্ষিত।

সিকামের পরের ১৫-১৯ সেন্টিমিটার লম্বা অংশই কোলন। এর যে অংশ উপরের দিকে উঠেছে তা ঊর্ধ্বগামী কোলন (Ascendeng Colon), বাম দিকে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত অংশটি অনুপ্রস্থ কোলন (Transverse Colon) এবং এর পরবর্তী যে অংশ বাম পাশ ঘেঁষে নিচের দিকে নেমেছে, তা নিম্নগামী কোলন (Descending Colon) পরবর্তী অংশ ফাঁসের মতো সিগময়েড কোলন (Sigmoid Colon) মলাশয়ে প্রবেশ করেছে। মলাশয় বৃহদান্ত্রের শেষ প্রান্তে শ্রোণীদেশে অবস্থিত অনেকটা থলির মতো অংশ। এর অন্তঃপ্রাচীরের মিউকোসা ৪-১০ টি অনুলম্ব ও ২-৩ টি অনুপ্রস্থ ভাঁজ সৃষ্টি করে। অনুলম্ব ভাঁজগুলোর মাঝে অবতল মলাশয়িক সাইনাস (Rectal sinus) থাকে। মলাশয়ের নিম্নাংশ স্ফীত হয়ে মলাশয়িক অ্যাম্পুলা (Rectal ampulla) গঠন করে।

বৃহদান্ত্র (Large intestine)

বৃহদান্ত্রের কাজ

- বৃহদান্ত্রে মল তৈরি হয়, পানি শোষিত হয় এবং খাদ্যাংশের গাঁজন ও পচন ঘটে।

৮। **পায়ু ঃ** মলাশয় পায়ু ছিদ্র পথে বাইরে উন্মুক্ত। পায়ু দুইটি স্ফিংক্টারে আবদ্ধ - একটি বহিঃস্থ অন্যটি অন্তঃস্থ। অন্তঃস্থটি মসৃণ পেশিতে গঠিত এবং অনৈচ্ছিকভাবে সংকুচিত হয়, কিন্তু বহিঃস্থটি চিহ্নিত পেশিতে গঠিত এবং জ্ঞাতসারে নিয়ন্ত্রিত হয়।

পায়ুর কাজ

- স্নায়ু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে উন্মুক্ত ও বন্ধ হয়ে মলত্যাগে অংশ নেয়।

পরিপাক গ্রন্থি (Digestive glands)

যে সব গ্রন্থির নিঃসরণ খাদ্য পরিপাকে সহায়ক সেগুলোকে পরিপাকগ্রন্থি বলে। মানবদেহে কয়েকটি পরিপাকগ্রন্থি সুস্পষ্ট গঠন ও অবস্থান নিয়ে থাকলেও কিছু গ্রন্থি পরিপাকনালীর নানা অংশে বিক্ষিপ্ত থাকে। নির্দিষ্ট গঠন ও অবস্থানের গ্রন্থি হচ্ছে লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় ও যকৃত। পাকস্থলী ও অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে যে সব গ্রন্থি থাকে সেগুলো কলানির্মিত নয়, এগুলো এককোষী গ্রন্থিকোষ।

নিচে মানুষের পরিপাকগ্রন্থির অবস্থান, গঠন ও কাজের বর্ণনা দেয়া হলো।

১। **লালা গ্রন্থি** (Salivary glands) ঃ মানুষের খাদ্যদ্রব্য লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালার সাথে মিশ্রিত হয়ে পাকস্থলীতে যায়। লালা গ্রন্থির সেরাস কোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইম ও মিউকাস কোষ থেকে নিঃসৃত মিউকাস খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সাহায্য করে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে লালা গ্রন্থির গুরুত্ব অপরিসীম।

অবস্থান ঃ মুখের দুই পাশে ৩ জোড়া লালাগ্রন্থি আছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১) দুপাশে কানের নিচে প্যারোটিড গ্রন্থি,

২) নিচের চোয়ালের ভেতর দিকে সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি (Submaxillary glands) বা সাবম্যাণ্ডিবুলার গ্রন্থি (Submandibular glands) এবং

৩) জিহ্বার তলায় সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual glands)।

গঠন ঃ লালগ্রন্থিগুলো এপিথেলিয়ামে আবৃত ও রস রক্ষণকারী গোল বা ডিম্বাকার থলি নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক থলির কেন্দ্রে একটি করে নালিকা থাকে। নালিকাগুলো একীভূত হয়ে ক্রমে গ্রন্থির মূল নালীতে মিলিত হয়। মূল নালীটি পরে মুখবিহবরে প্রবেশ করে। গ্রন্থির কোষগুলো দুই রকম ঃ-

ক) সেরাস কোষ এবং খ) মিউকাস কোষ ।

লালা গ্রন্থির কাজ

- লালগ্রন্থির সেরাস কোষ থেকে এনজাইম এবং মিউকাস কোষ থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয়।
- লালগ্রন্থির পরিপাক সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে টায়ালিনের মাধ্যমে সিদ্ধ শ্বেতসারকে ভেঙে আইসোমলটোজ ও দ্বিশর্করা মলটোজে এবং মলটেজ এনজাইম দিয়ে মলটোজকে গ্লুকোজে পরিণত করা।
- লালরসের অপরিপাকীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্যকে পিচ্ছিল করে তা চিবাতে ও গিলতে সুবিধা করে দেয়া এবং খাদ্যবস্তু দ্রবীভূত করে স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করা।

২। **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas) ঃ অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি। তাই এটা অন্তঃক্ষরা এবং বহিঃক্ষরা উভয় গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন হরমোন এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন এনজাইম নিঃসৃত হয়। সুতরাং অগ্ন্যাশয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

অবস্থান ঃ অগ্ন্যাশয় পাকস্থলীর নিচে অবস্থিত এবং উদর গহ্বরের ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুণ্ডলীর ফাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত।

গঠন ঃ অগ্ন্যাশয় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা, ৩ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২ সেন্টিমিটার পুরু এবং ওজন প্রায় ৯০ গ্রাম। এর চওড়া যে দিকটি ডিওডেনামের কুণ্ডলীর ফাঁকে থাকে তার নাম মাথা; যে অংশ সংকীর্ণ হয়ে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি লেজ; এবং মাথা ও লেজের মাঝের অংশটি দেহ। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে দুটি নালী বের হয়।

যথা– প্রধান অগ্ন্যাশয় নালী ও অতিরিক্ত অগ্ন্যাশয় নালী। প্রধান অগ্ন্যাশয় নালী ডিওডেনামের কাছে এসে অভিন্ন পিওনালীর সাথে মিলিত হয়ে ভ্যাটার এর অ্যাম্পুলার মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিকোষগুলো ছোট ছোট নালিকার প্রান্তে আঙ্গুরের গোছার মতো সাজানো। এগুলোর বাইরে ক্ষুদ্র বণ্ডভুজাকার কোষ একত্রিত হয়ে একেকটি আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস তৈরি করে। এগুলো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে।

অগ্ন্যাশয়ের কাজ

- অগ্ন্যাশয় অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে।
- বহিঃক্ষরা গ্রন্থি রূপে এটি অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ করে; তাতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের জন্য বিভিন্ন এনজাইম থাকে। তা ছাড়াও এই রস অম্ল-ক্ষারের সমতা, পানিসমতা, দেহতাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।
- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স থেকে ইনসুলিন, গ্লুকাগন, গ্যাস্ট্রিন ও সোমাটোস্ট্যাটিন হরমোন ক্ষরণ করে। দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণে এসব হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। **যকৃত** (Liver) ঃ মানুষের খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের জন্য পিত্তের ভূমিকা অপরিসীম। যকৃত পিত্ত ক্ষরণ করে পিত্তাশয়ে জমা রাখে। তা ছাড়া আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন প্রভৃতি খাদ্য বিপাকে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

অবস্থান ঃ যকৃত উদর গহ্বরের উপরিভাগে ডানদিকে ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে ডিওডেনাম ও ডান বৃক্কের উপরদিকে পাকস্থলীর ডান পাশে অবস্থিত।

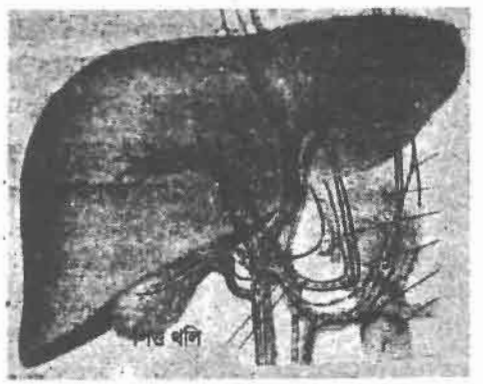

যকৃত (Liver)

গঠন ঃ যকৃত দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মানুষের যকৃতের ওজন প্রায় ১.৬ কেজি এবং মহিলাদের যকৃতের ওজন প্রায় ১.৩ কেজি। ডান ও বাম উপখণ্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। ডান উপখণ্ডটি আবার ২টি উপখণ্ড - কোয়াড্রেট ও কডেট নামে পরিচিত। খণ্ডগুলি স্থিতিস্থাপক তন্তুসমৃদ্ধ ক্যাপসুলে আবৃত। ডান উপখণ্ডটি সবচেয়ে বড়। যকৃতের নিচ তলে পিত্তথলি (Gall bladder) সংলগ্ন থাকে। প্রত্যেকটি খণ্ড বণ্ডভুজাকার কোষে গঠিত। এ কোষগুলো একেকটি ক্ষুদ্র অনুখণ্ড নির্মাণ করে। প্রত্যেক অনুখণ্ডের কেন্দ্রে থাকে কেন্দ্রীয় শিরা। যকৃত কোষগুলো চাকার স্পোকের মতো বিন্যাস্ত। এদের গা বেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাইনুসয়েড ও পিওনালিকা প্রসারিত হয়। পিওনালিকাগুলো পিওনালীতে গিয়ে শেষ হয়।

যকৃত থেকে আসা ডান ও বাম নালী মিলে একটি যকৃত নালী গঠন করে। এটি পিওনালীর সাথে মিলিত হয়ে অভিন্ন পিওনালী তৈরি করে যা ভ্যাটার এর অ্যাম্পুলা নামে নালীর মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

যকৃতের কাজ

- যকৃত পিও (Bile) ক্ষরণ করে পিত্তাশয়ে জমা রাখে এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের শোষণে সাহায্য করে।
- তা ছাড়া শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতি খাদ্যকে পরিপাকের পর রক্তস্রোতে পাঠাতে সাহায্য করে।

৪। **পাকস্থলীর গ্রন্থি** (Gastric glands) ঃ পাকস্থলীর অন্তঃপ্রাচীরের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য গ্রন্থিকোষ পরিপাকে সাহায্য করে। গ্রন্থিগুলোর মধ্যে কার্ডিয়াক গ্রন্থি, জি-কোষ, মিউকাস কোষ, পেপটিক কোষ, প্যারাইটাল কোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব কোষ থেকে গ্যাস্ট্রিক রস নামে বর্ণহীন ও তীব্র অম্লধর্মী তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণের সময় প্রায় ১,৫০০ থেকে ২,৫০০ মিলিলিটার গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরিত হয়। এই ক্ষরণ খাদ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়। গ্যাস্ট্রিক রসে আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম থাকে।

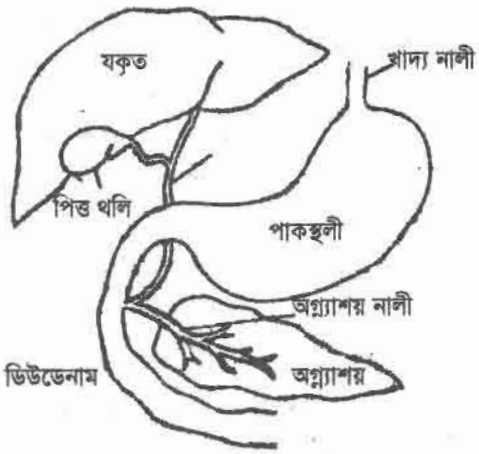

পরিপাক নালীর সাথে পরিপাক গ্রন্থিগুলোর সম্পর্ক

৫। **আন্ত্রিক গ্রন্থি** (Intestinal glands) ঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের বিভিন্ন অংশে পরিপাকীয় গ্রন্থিকোষ অবস্থিত যার নিঃসরণে আন্ত্রিক রসের সৃষ্টি হয়েছে। অন্ত্রের গ্রন্থিকোষগুলো হচ্ছে স্তম্ভাকার ব্রাশ কোষ, এদের ফাঁকে ফাঁকে পানপাত্রের মতো গবলেট কোষ, সরু নলাকার লিবারকুহন এর গ্রন্থি, এগুলোর গভীরে থাকে প্যানেথ কোষ ও আরজেন্টফিন কোষ এবং নলকার শাখান্বিত ব্রুনার-এর গ্রন্থি। আন্ত্রিক রসের এনজাইম স্টার্চ, ডেক্সট্রিন, প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

খাদ্য পরিপাক প্রণালি

অধিকাংশ খাদ্য মুখবিবরে বৃহৎ অণু হিসেবে গৃহীত হয়। খাদ্যবস্তুর এইসব বৃহত্তর ও জটিল অণু ক্ষুদ্রতম অণুতে বিশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মানবদেহের কোনো কাজে আসে না। তাই পরিপাক অপরিহার্য।

যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত অদ্রবণীয় বৃহত্তর জটিল খাদ্যের অণুগুলো হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সহায়তায় সরল, দ্রবণীয় ও ক্ষুদ্রতর খাদ্যের অণুতে পরিণত হয়ে দেহে শোষণ ও আত্ম করণের উপযোগী হয়ে উঠে, তাকে পরিপাক (Digestion) বলে।

মানবদেহে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতির নিচে বর্ণনা করা হলো :

শর্করা (Carbohydrate) জাতীয় খাদ্য পরিপাক :

যে সব শর্করা জাতীয় খাদ্য মুখবিবরে গৃহীত হয় এদের মধ্যে নিম্নোক্তগুলো প্রধান :

১)	যৌগ কার্বোহাইড্রেট	:	ভাত, আলু, রুটি
২)	ল্যাকটোজ	:	দুধ
৩)	মলটোজ	:	বার্লি
৪)	সুক্রোজ	:	ইক্ষু
৫)	গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ (একক কার্বোহাইড্রেড)	:	বিভিন্ন মিষ্টি ফলমূল

সকল কার্বোহাইড্রেটই একক কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হয়ে দেহে শোষিত হয়।

শর্করা পরিপাকে সাহায্যকারী এনজাইম ঃ যে সব এনজাইম শর্করা পরিপাকে অংশগ্রহন করে নিচে এদের নাম দেয়া হলো ঃ

১)	লালা রসে	:	টায়ালিন ও মলটেজ
২)	পাকস্থলী রসে	:	শর্করা পরিপাককারী এনজাইম নেই
৩)	অগ্ন্যাশয় রসে	:	এমাইলেজ ও মলটেজ
৪)	আন্ত্রিক রসে	:	এমাইলেজ, মলটেজ, সুক্রোজ, ল্যাকটেজ, আইসোমলটেজ প্রভৃতি।

শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতি

পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতির বর্ণনা নিচে দেয়া হলো:

১) **মুখবিবরে পরিপাক ঃ** খাদ্য চিবানোর সময় লালাগ্রন্থি নিঃসৃত লালারস খাদ্যবস্তুর সাথে মিশে খাদ্যকে নরম করে। লালারসে টায়ালিন ও মলটেজ নামে দুটি শর্করা আদ্রবিশ্লেষী এনজাইম পাওয়া যায়।

টায়ালিন এনজাইম স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও ডেক্সট্রিন অণুতে আদ্রবিশ্লিষ্ট করে প্রথমে দ্রবণীয় স্টার্চে এবং পরে ক্ষুদ্রতর ডেক্সট্রিন অণুতে পরিণত করে। অবশেষে স্টার্চের এমাইলেজ অংশ থেকে মলটোজ ও মলটোট্রায়োজ এবং এমাইলোপেকটিন অংশ থেকে মলটোজ, মলটোট্রায়োজ ও আইসোমলটোজ উৎপন্ন হয়। টায়ালিনের কাজ মুখবিবরে আরম্ভ হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া প্রধানত পাকস্থলীতে সংঘটিত হয়।

সামান্য পরিমাণ মলটেজ এনজাইম দ্বিশর্করা মলটোজের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে গ্লুকোজে পরিণত করে।

২) পাকস্থলীতে পরিপাক ঃ পাকস্থলীর পাচকরসে কার্বোহাইড্রেট পরিপাকাকারী এনজাইম নেই। তবে পাকস্থলী-নিঃসৃত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিছু সুক্রোজকে আদ্রবিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজে পরিণত করে।

৩) ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে এলে তা অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের ক্রিয়ায় পরিপাক হতে থাকে।

অগ্ন্যাশয় রসের ক্রিয়া : অগ্ন্যাশয় রসের পরিপাকীয় কাজগুলো এনজাইমের সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে সম্পন্ন হয় :

১। **অগ্ন্যাশয়িক এমাইলেজ ক্লোরাইড** আয়ন সামান্য ক্ষারধর্মী পরিবেশে (P^H 7.1) স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও ডেক্সট্রিনকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মলটোজ, মলটোট্রায়োজ ও লিমিট ডেক্সট্রিন নামে ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন অণু উৎপন্ন করে।

২। মলটেজ এনজাইম মলটোজের উপর কাজ করে গ্লুকোজে পরিণত করে।

আন্ত্রিক রসের এনজাইমের ক্রিয়া ঃ আন্ত্রিক রসে নানা ধরনের কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইম থাকে। এদের কাজ হচ্ছে-

১। **আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ ঃ** স্টার্চ, ডেক্সটিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশিস্নষ্ট করে মলটোজ, মলটোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন উৎপন্ন করে।

২। **আইসোমলটোজ ঃ** আইসোমলটোজকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মলটোজ ও গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

৩। **মলটেজ ঃ** মলটোজকে ভেঙে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

৪। **সুক্রেজ ঃ** সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অন্য ফ্রুক্টোজে পরিণত করে।

৫। **ল্যাক্টেজ ঃ** দুধের ল্যাক্টেজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।

এভাবে প্রস্তুত মনোস্যাকারাইড ও খাদ্যের বিভিন্ন মনোস্যাকারইড এরপর শোষিত হয়। সাধারনত সেলুলোজ ছাড়া অন্যান্য কার্বেহাইড্রেটের পরিপাক ক্ষুদ্রান্ত্রেই সমাপ্ত হয়।

৪) বৃহদান্ত্রে পরিপাক ঃ সিকাম ও কোলনের ভেতর ব্যাকটেরিয়া ও এককোষী প্রাণির কর্মকাণ্ডে উদ্ভিদ তন্তুর সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ প্রভৃতি দুস্পাচ্য পলিস্যাকারাইড ভেঙে অ্যাসেটিক, প্রোপায়েনিক ও বিউটিরিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ফ্যাটি অ্যাসিড অণু উৎপন্ন হয়।

শর্করা পরিপাকের রূপরেখা

পরিপাককারী অংশ	*এনজাইম*	*প্রভাবিত খাদ্য*	*উৎপন্ন পদার্থ*
মুখবিবর (লালারস)	টায়ালিন	শ্বেতসার (সিদ্ধ)	আইসোমলটোজ, মলটোজ, মলটোট্রায়োজ
	মলটেজ	মলটোজ	গকোজ
পাকস্থলী (পাচকরস)	হাইড্রোক্লোরিড অ্যাসিড (এনজাইম নেই)	সুক্রোজ	গুকোজ ও ফ্রুক্টোজ
ক্ষুদ্রান্ত্র (অগ্ন্যাশয় রস)	অগ্ন্যাশয়িক এমাইলেজ	স্টার্চ, গাইকোজেন, ডেক্সট্রিন	মলটোজ, মলটোট্রায়োজ ও লিমিট ডেক্সট্রিন
	মলটেজ	মলটোজ	গুকোজ
ক্ষুদ্রান্ত্র (আন্ত্রিকরস)	আন্ত্রিক এমাইলেজ	স্টার্স ও ডেক্সট্রিন	মলটোজ, মলটোট্রায়োজ ও ডেক্সট্রিন
	আইসোমলটেজ	আইসোমলটেজ	মলটোজ ও গুকোজ
	মলটোট্রায়েজ	মলটোট্রায়েজ	গুকোজ
	মলটেজ	মলটোজ	গুকোজ
	সুক্রেজ	সুক্রোজ	গুকোজ ও ফ্রুক্টোজ
	ল্যাকটেজ	ল্যাকটোজ	গুকোজ ও গ্যালাকটোজ
বৃহদান্ত্র (সিকাম ও কোলন)	ব্যাকটেরিয়া ও এককোষী প্রাণীর গাঁজন প্রক্রিয়া	উদ্ভিদ সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজ	প্রোপায়োনিক, এসেটিক ও বিউটিরিক এসিড।

আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে সব আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে তার মধ্যে দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ও ডাল উল্লেখযোগ্য।

আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্যকারী এনজাইম

১) **পাকস্থলী রস বা পাচকরস :** নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন ও জিলেটিনেজ।

২) **অগ্ন্যাশয় রস :** নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন, কার্বক্সিপেপটাইডেজ-এ এবং বি, ইলাস্টেজ, কোলাজিনেজ প্রভৃতি।

৩) **আন্ত্রিক রস :** অ্যামাইনো পেপটাইডেজ, ট্রাইপেপটাইডেজ, পলিপেপটাইডেজ প্রভৃতি।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতি

আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পাকস্থলীতে শুরু হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়। মুখবিহবরের লালারসে আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাককারী এনজাইম না থাকায় মুখবিবরে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক ঘটে না, বরং খাদ্য চিবানোর সময় লালারস মিশে খাদ্যকে পিচ্ছিল ও নরম করে।

১) পাকস্থলীতে পরিপাক

ক) পাকস্থলীতে প্রধান আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাককারী এনজাইম নিষ্ক্রিয়া পেপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। পাকস্থলীর মধ্যে তা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় পেপসিন এ পরিণত হয় এবং অম্ল পরিবেশে সব ধরনের সুপাচ্য আমিষ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে পেপটোনে রূপান্তরিত করে। পেপটোন ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

(খ) জিলেটিনেজ জিলেটিন নামক প্রোটিনকে আংশিক পরিপাক করে পেপটোন ও পলিপেপটাইড উৎপন্ন করে।

২) ক্ষদ্রান্ত্রে পরিপাক

অধিকাংশ প্রোটিন পাকস্থলীতে সক্রিয় পেপসিনের প্রভাবে পেপটোনে পরিণত ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে এবং অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের সাহায্যে সম্পূর্ণ পাচিত হয়।

অগ্ন্যাশয়িক এনজাইম দিয়ে পরিপাক ঃ ট্রিপসিন নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরুপে নিঃসৃত হয় এবং আন্ত্রিক রসের এন্টারোকাইনেজ এনজাইম দিয়ে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়ে সক্রিয় ট্রিপসিন এ পরিণত হয়।

ক্ষারধর্মী পরিবেশে ট্রিপসিন প্রোটিন, প্রোটিওজ ও পেপটোনের উপর কাজ করে এদের ডাইপেপটাইড ও পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

ট্রিপসিন নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেন, প্রো-ইলাস্টেজ ও প্রো-কার্বক্সিপেপটাইড ও পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

ট্রিপসিন নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেন, প্রো-ইলাস্টেজ ও প্রো-কার্বক্সিপেপটাইডেজকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে সক্রিয় কাইমোট্রিপসিন, ইলাস্টেজ ও কার্বক্সিপেপটাইডেজ-এ পরিণত করে। এদের কাজ নিম্নরূপ ঃ

- **কাইমোট্রিপসিন** দুধের প্রোটিন কেসিনকে প্যারাকেসিন ও ছানার পানির প্রোটিনে পরিণত করে দুগ্ধ জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
- **কার্বক্সিপেপটাইডেজ** পেপটাইড অণুকে ক্ষুদ্রতর পেপটাইড এ পরিণত করে।
- **ইলাস্টেজ**-এর প্রভাবে যোজককলার প্রোটিন ইলাস্টিন ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।
- **কোলাজিনেজ**- এর প্রভাবে যোজককলার প্রোটিন কোলাজেন ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

আন্ত্রিকরসের এনজাইম দিয়ে পরিপাক ঃ আন্ত্রিকরসে এমিনোপেপাইডেজ, ট্রাইপেপটাইডেজ, পেপটাইডেজ ও ডাইপেপটাইডেজ প্রভৃতি প্রোটিন-পরিপাককারী এনজাইম থাকে।
এদের কাজ নিম্নরূপ

- এমিনোট্রিপসিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড মুক্ত করে।
- পেপটাইডেজ পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড মুক্ত করে।
- ট্রাইপেপটাইডেজ ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে ডাইপেপটাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে।
- ডাইপেপটাইডেজ ডাইপেপটাইডকে ভেঙে দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের রূপরেখা

পরিপাককারী অংশ	এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্য	উৎপন্ন পদার্থ
পাকস্থলী (পাচকরস)	পেপসিন (সক্রিয় হওয়ার পর)	দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস	পেপটোন
	জিলেটিনেজ	জিলেটিন	পেপটোন ও পলিপেপটাইড
অগ্ন্যাশয় (অগ্ন্যাশয়রস)	ট্রিপসিন (সক্রিয় হওয়ার পর)	পেপটোন	পলিপেপটাইড
	কার্বক্সিপেপটাইডেজ–এ এবং বি (সক্রিয় হওয়ার পর)	মুক্ত কার্বক্সিলযুক্ত পরিপেপটাইড	অ্যামাইনো অ্যাসিড
	ইলাস্টেজ	ইলাস্টিন	ক্ষুদ্র পেপটাইড + এমিনো এসিড
	কোলাজিনেজ	কোলাজেন	ক্ষুদ্র পেপটাইড + এমিনো এসিড
ক্ষুদ্রান্ত্র (আন্ত্রিক রস)	কাইমোট্রিপসিন (সক্রিয় হওয়ার পর)	দুধের কেসিন	প্যারাকেসিন
	এমাইনোট্রিপসিন (সক্রিয় হওয়ার পর)	পেপটাইড	অ্যামাইনো অ্যাসিড
	পেপটাইডেজ	পলিপেপটাইড	এমিনো এসিড
	ট্রাইপেপটাইডেজ	ট্রাইপেপটাইড	ডাইপেপটাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড
	ডাইপেপটাইডেজ	ডাইপেপটাইড	অ্যামাইনো অ্যাসিড

স্নেহ জাতীয় (Lipid) খাদ্যের পরিপাক

গৃহীত স্নেহ জাতীয় খাবার ট্রাইগ্লিসরাইডের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। এক তৃতীয়াংশ গিস্লারাইড এস্টারেজ বর্গীয় লাইপেজ এনজাইমগুলো ক্রিয়ার সম্পূর্ণ আর্দ্রবিশ্লিস্ট হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। বাকি ট্রাইগ্লিসারাইড প্রধানত মনোগ্লিসারাইড পর্যন্ত আংশিক পরিপাকের পরই অন্ত্র থেকে শোষিত হয়। সামান্য পরিমাণ স্নেহ জাতীয় পদার্থ পরিপাক না হয়ে অপরিবর্তিত অবস্থায়ই শোষিত হয়।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে সব স্নেহ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে তার ভেতর রয়েছে প্রশমিত স্নেহ জাতীয় দ্রব্য যেমন তেল, ঘি, মাখন, কোরেস্টেরল, ফসফোলিপিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্যকারী এনজাইম

যে সব এনজাইম স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় সেগুলোর নাম ও উৎস নিচে দেয়া হলো

১) পাকস্থলী রসে বা পাচক রসে ঃ পাকস্থলীয় লাইপেজ বা ট্রাইবিউটারেজ

২) অগ্ন্যাশয় রসে ঃ অগ্ন্যাশয় লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ ও কোলেস্টেরল এস্টারেজ।

৩) আন্ত্রিক রসে ঃ আন্ত্রিক লাইপেজ, মনোগ্লিসারিডেজ, লেসিথিনেজ প্রভৃতি।

পরিপাক পদ্ধতি

লিপিড খাদ্যেও পরিপাক পাকস্থলীতে আমরক্ষ হযে ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষ হয়। মুখবিহবরের লালারসে লিপিড পরিপাককারী এনজাইম না থাকায় মুখবিবহের লিপিড খাদ্যেও কোনো পরিপাক ঘটে না, বরং খাদ্য চিবানোর সময় লালারস মিশে খাদ্যকে পিচ্ছিল ও নরম করে।

নিচে পৌষ্টিকতন্ত্রেও বিভিন্ন অংশে লিপিড খাদ্যেও পরিপাক পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১) পাকস্থলীতে পরিপাক

পাকস্থলীতে পিওলবর্ণোর অভাবে এবং অম্লধর্মী পরিবেশের জন্য পাকস্থলীয় পাইপেজ তেমন কাজ করতে পাওে না, তবে শিশুর পাকস্থলীতে পাকস্থলীয় অম্লতা বেশি না হওয়ায় বেশ কাজ করে। লাইপেজ অবদ্রবিতীরপিড কণাকে (যেমন দুধে ভাসমান লিপিড কণা) অবশ্য মনোগ্লিসারাইড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

২) ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক

১) আন্ত্রিকরসের লাইপেজ পিওলবর্ণোর প্রভাবে অবদ্রবিত লিপিডকণাকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন করে। পরে তা গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

২) অগ্ন্যাশয়ের ফসফোলা পেজ ট্রিপসিনের প্রভাবে সক্রিয় হয়ে লেপিসথিন, সেফালিন প্রভৃতিকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট কওে ফ্যাটি অ্যাসিড ও লিপোফসফোলিপিড উৎপন্ন করে।

৩) অসান্যাশয়রসের কোরেস্টেরল এস্টারেজ পিওলবর্ণোর উপস্থিতিতে সক্রিয় হয়ে খাদ্যেও কোরেস্টেরল এস্টারগুলোকে ভেঙে মুক্ত কোলেস্টেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

৪) আন্ত্রিক রসের লেসিথিনেজ এনজাইম লেসিথিনকে ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, ফসফরিক অ্যাসিড ও কোলিনে পরিণত করে।

৫) মনোগ্লিসারিডেজ কোষের ভেতরে মনোগ্লিসারাইডকে ফ্যাড অ্যাসিডও গ্লিসারলে পরিণত করে।

লিপিড খাদ্য পরিপাকের রূপরেখা

পরিপাককারী অংশ	*এনজাইম*	*প্রভাবিত খাদ্য*	*উৎপন্ন পদার্থ*
পাকস্থলী (পাচকরস)	পাকস্থলীয় লাইপেজ (স্ট্রাইবিউটারেজ)	প্রশমিত স্নেহ জাতীয় খাদ্য (দুধ, মাখন ও ডিমের কুসুমস্থিত বস্তু)	মনোগিসারাইড, ফ্যাটি এসিড ও গিসারল
অগ্ন্যাশয় (অগ্ন্যাশয়রস	ফসফোলাইপেজ	ট্রাইগিসারাইড (প্রশমিত)	মনোগিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড
	কোরেস্টেরস এস্টারেজ	কোলেস্টেরল এস্টার	মুক্ত কোলেস্টেরল ও ফ্যাটি এসিড
ক্ষুদ্রান্ত্র (আন্ত্রিকরস)	আন্ত্রিক লাইপেজ	ট্রাইগিরসারাইড	মনোগিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড
	লেসিথিনেজ	লেসিথিন	গিসারল, ফসফোরিক এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কোলিন
	এনোগিসারিডেজ	মনোগিসারাইড	ফ্যাটি এসিড ও গিসারল

খাদ্যবস্তুর শোষণ

পরিপাকের পর খাদ্যবস্তু যে প্রক্রিয়ায় রক্ত প্রবাহে প্রবেশ কওে তাকে খাদ্যের শোষণ (absorption) বলে। নিচে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, ভিটামিন, লবণ ও পানির শোষণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

শর্করা ঃ গ্লকোজ ও গ্যালাকটোজ সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে অন্ত্রের এপিথেলিয়াম এবং অঃপর রক্তের কৈশিক জালকে প্রবেশ করে।

আমিষ ঃ অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেপটাইড অণু (ডাইপেপটাইড, ট্রাইপেপটাইড) সক্রিয় পরিবহনের মাধ্যমে কোষে গৃহীত হয়। এ পেপটাইড অণুগুলো অন্তঃকোষী পরিপাকের মাধ্যমে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। সেখান থেকে রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে স্থানান্তরিত হয়।

লিপিড ঃ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল ভিলাসের ল্যাকটিয়েল তথা লসিকাতন্ত্রেও মাধ্যমে শিরাতন্ত্রেও রক্ত প্রবাহে স্থানান্তরিত হয়।

ভিটামিন ঃ লিপিডদ্রাব্য ভিটামিন A,D,E ও স্নেহ খাদ্যের সাথে যুক্ত হয়ে লসিকায় বাহিত হয়, কিন্তু পানিদ্রাব্য ভিটামিন, যেমন B-কমপ্লেক্স ও C পোর্টালতন্ত্রে প্রবেশ করে।

লবণ ঃ অধিকাংশ অজৈব লবণই ক্ষুদ্রান্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত শোষিত হয়।

পানি ঃ পানি শোষিত হয় প্রধানত ক্ষুদ্রান্ত্রে। সামান্য পানি পাকস্থলী ও বৃহদান্ত্রে শোষিত হয়। কোনো কোনো ভৌত রাসায়নিক বল (যেমন অভিস্রবণ চাপ) পানি শোষণে সাহায্য করে। শোষণ প্রক্রিয়া সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুভাবেই হয়। পানির শোষণমাত্রা লবণের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে।

আত্তীকরণ

শোষিত খাদ্যবস্তু প্রোটোপ্লাজমে রূপান্তরের পদ্ধতিকে আত্তীকরণ বলে। এটি উপচিতির এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ। কোষের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের সহযোগিতায় সরল খাদ্য জটিল উপাদানে পরিণত হয়। যেমন-অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লকোজ, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল রক্তে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব স্থানের প্রোটোপ্লাজমের ক্ষয়পূরণ হয়ে কলা তথা দেহের বৃদ্ধি সাধিত হয়। যে সব এনজাইমের প্রভাব জটিল খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় সে সব এনজাইমের আবার বিপরীত ক্রিয়ার মাধ্যমে উপরোল্লিখিত বস্তু সংশ্লেষণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মানুষের লালাগ্রন্থিসমূহের নাম লেখ।

২। পরিপাকতন্ত্র কাকে বলে?

৩। খাদ্য কয় প্রকার ও কি কি?

৪। আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তাকারী এনজাইমের নাম লেখ।

৫। পরিপাক নালী বলতে কি বোঝ?

৬। পাকস্থলীর কাজগুলো বর্ণনা কর।

৭। যকৃতের অংশগুলোর নাম উল্লেখ কর?

৮। অগ্ন্যাশয় কি? এটা কোথায় অবস্থিত?

৯। ক্ষুদ্রান্তের কাজগুলি বর্ণনা কর?

১০। আন্ত্রিকরসের এনজাইমগুলির কাজ কি?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

২। মানুষের পরিপাক গ্রন্থিসমূহের বিবরণ দাও এবং এদের কাজগুলো বর্ণনা কর।

৩। যকৃতের গঠন ও কাজ উল্লেখ কর।

৪। খাদ্য পরিপাকে পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রসের ভূমিকা উল্লেখ কর।

৫। আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের রূপরেখা বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

রেচনতন্ত্র

রেচনতন্ত্র (Urinary system)

মানবদেহে রেচন পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট তন্ত্র আছে তাহলো রেচনতন্ত্র। রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে ৮০ ভাগ রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বাকি ২০ ভাগ বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গের মাধমে নিষ্কাশিত হয়, যেমন ত্বকের ঘাম গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ ও সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া; ত্বকের তৈল গ্রন্থি থেকে অল্প পরিমাণ কোলেস্টেরল, ফ্যাটি অ্যাসিড, হাইড্রোকার্বন; ফুসফুস থেকে কার্বন–ডাই–অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প; অন্ত্র থেকে কিছু লৌহ ও ক্যালসিয়াম ঘটিত লবণ।

রেচন তন্ত্রের অঙ্গসমূহ হলো ঃ-

১। বৃক্ক (Kidney) - ২টি, ডান ও বাম।
২। মূত্রবাহী নালী (Ureter) - ২টি, ডান ও বাম।
৩। মূত্রথলি (Urinery bladder) - ১টি।
৪। মূত্রনালী (Urethra) - ১টি।

১। **বৃক্ক** (Kidney) ঃ মানুষের উদর গহবরের পেছন অংশে, মেরুদণ্ডের দুইপাশে বক্ষপিঞ্জরের নিচে ও পৃষ্ঠপ্রাচীর সংলগ্ন হয়ে দুটি বৃক্ক যুক্ত থাকে। সাধারণত বাম বৃক্কটি ডান বৃক্কের চেয়ে সামান্য উপরে থাকে। প্রতিটি বৃক্ক নিরেট, চাপা দেখতে অনেকটা শিমের বীজের মত এবং লালচে রঙের। একটি পরিণত বৃক্কের দৈর্ঘ্য : ১০ থেকে ১২ সেন্টিমিটার, প্রস্থ : ৫ থেকে ৬ সেন্টিমিটার এবং স্থূলত্ব : ৩ সেন্টিমিটার। প্রত্যেকটির ওজন :

পুরুষের ১৫০ থেকে ১৭০ গ্রাম এবং স্ত্রীলোকের ১৩০ থেকে ১৫০ গ্রাম। বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল ও ভেতরের দিক অবতল। অবতল অংশের ভাজকে হাইলাম (Hilum) বলে এর ভেতর দিয়ে মূত্রবাহী নালী (Ureter) ও রেনাল শিরা (Renal vein) বহির্গত হয় এবং রেনাল ধমনী (Renal artery) ও রেনাল স্নায়ু (Renal nerve) বৃক্কে প্রবেশ করে। সমগ্র বৃক্ক ক্যাপসুল (Capsule) নামক তন্তুময় যোজক কলার সুদৃঢ় আবরনে বেষ্টিত।

বৃক্ক (Kidney)

বৃক্কের অন্তর্গঠন ঃ বৃক্কের একটি লম্বচ্ছেদ খালি চোখে দেখলে দুটি সুস্পষ্ট অঞ্চল দেখা যায় ঃ

ক) ক্যাপসুল সংলগ্ন কর্টেক্স (Cortex) এবং খ) অন্তঃস্থ মেডুলা (Medulla)।

বৃক্কের গঠন ও কাজের একককে নেফ্রন বলে। প্রতিটি বৃক্কে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন নেফ্রন থাকে। কর্টেক্সে নেফ্রনের রেনাল কণিকা (Renal corpuscles), প্রক্সিমাল নালিকা (Proximal convoluted tubules), ডিস্টাল নালিকা (Distal convoluted tubules)

বৃক্কের লম্বচ্ছেদ

এবং সংশ্লিষ্ট রক্তবাহিকা অবস্থান করে। নেফ্রনের লুপ অব হেনলি, সংগ্রাহী নালিকা ও রক্তবাহিকাগুলো মেডুলা অংশে অবস্থিত এবং এসব অংশ সম্মিলিতভাবে কতকগুলো রেনাল পিরামিড (Renal pyramids) গঠন করে। মেডুলাতে ১০টি পর্যন্ত পিরামিড থাকতে পারে। প্রত্যেক পিরামিডের চূড়াকে প্যাপিলা (Papilla) বলে। পেলভিস হচ্ছে মূত্রবাহী নালীর উৎপত্তিস্থল যা দেখতে ফানেলের মতো চওড়া। সমস্ত পিরামিড পেলভিসে উন্মুক্ত হয়।

বৃক্কের কাজ ঃ

- রক্ত থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য অপসারণ করা।
- রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা।
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
- দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
- ভিটামিন-ডি ও লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশ নেয়া।
- দেহে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদির পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ করা।

২। **মূত্রবাহী নালী** (Ureter) ঃ প্রত্যেক বৃক্কের ভেতর থেকে মূত্রবাহী নালী নামে একটি লম্বা নালী বেরিয়ে তির্যকভাবে মূত্রথলির পেছনদিকে প্রবেশ করে। এই নালী প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ৩ মিলিমিটার ব্যাস। মূত্রবাহী নালীর মাধ্যমে মূত্র বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে এসে জমা হয়। মূত্রবাহী নালী যেখানে মূত্রথলিতে প্রবেশ করে সেখানে একটি পেশীময় কপাটিকা থাকে যা মূত্রবাহী নালী থেকে মূত্রের গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

মূত্রবাহী নালীর কাজ

- মূত্রকে বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে বহন করে।

৩। **মূত্রথলি** (Urinery blader) ঃ দেহের শ্রোণী-গহবরে (Pelvic cavity) মূত্রথলি অবস্থিত। স্থিতিস্থাপক ও পেশিবণ্ডল মূত্রথলি মূত্রভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। মূত্রশূন্য অবস্থায় মূত্রথলি চতুর্তল (Tetrahedal shape) এবং মূত্রপূর্ণ অবস্থায় ডিম্বাকৃতি (Ovoid shape) আকার ধারণ করে। এর মূত্রধারণ ক্ষমতা সীমিত এবং প্রায় ৪৫০ মিলিলিটার মূত্র ধারণে সক্ষম। এর বেশি হলেই যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জাগে। মূত্র নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণের জন্য মূত্রথলীতে যে স্ফিংক্টার থাকে তাকে অন্তঃমূত্রনালী স্ফিংক্টার (Internal urethral sphincter) বলে। এই স্ফিংক্টার অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা তৈরি বলে এর নিয়ন্ত্রণ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।

মূত্রথলির কাজ

- সাময়িকভাবে মূত্র ধারণ করে।
- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূত্র নিষ্কাশনে অংশ নেয়।

৪। **মূত্রনালী** (Urethra) ঃ মূত্রথলির নিচের দিকে অবস্থিত একটি বড় ছিদ্র থেকে মূত্রনালী নামে একটি সরু নালিকা বের হয়। পুরুষের এটি ১৮ থেকে ২০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং শিশ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অগ্রভাগের এক ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। স্ত্রীলোকের এটি লম্বায় ৩.৫ থেকে ৪ সেন্টিমিটার এবং আলাদাভাবে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। উৎপত্তিস্থল দুটি স্ফিংক্টার পেশিতে বেষ্টিত থাকে। এই স্ফিংক্টার ঐচ্ছিক পেশি দ্বারা তৈরি বলে এর নিয়ন্ত্রণ মানুষের ইচ্ছাধীন। এর একটি পেশি স্বনিয়ন্ত্রিত হয়ে মূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে।

মূত্রনালীর কাজ

- মূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে।
- মূত্রথলি থেকে বাইরে মূত্র নিষ্কাশন করে।
- পুরুষের ক্ষেত্রে এ পথে বীর্যও স্খলিত হয়।

বৃক্কের সুক্ষ গঠন

নেফ্রন ঃ বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক একককে নেফ্রন বলে। মানুষের প্রত্যেক বৃক্কে ১০ লক্ষ থেকে ১৩ লক্ষ নেফ্রন রয়েছে। প্রতিটি নেফ্রন প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা। এ হিসেবে প্রত্যেক বৃক্কে নেফ্রনের নালিকাগুলো সম্মিলিতভাবে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার বা প্রায় ২২.৫০ মাইল এরও বেশি লম্বা হবে। এর ফলে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছে। বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত থেকে ১২৫ ঘন সেন্টিমিটার তরল পদার্থ পরিশ্রুত হয়। প্রায় ৯৯% পানিই আবার রক্তে ফিরে যায়, সাধারণত প্রতি মিনিটে কেবল ১ ঘন সেন্টিমিটার মূত্র সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক নেফ্রনকে ২টি প্রধান অংশে ভাগ করা হয় ঃ (ক) রেনাল করপাসল এবং (খ) রেনাল টিউব্যুল।

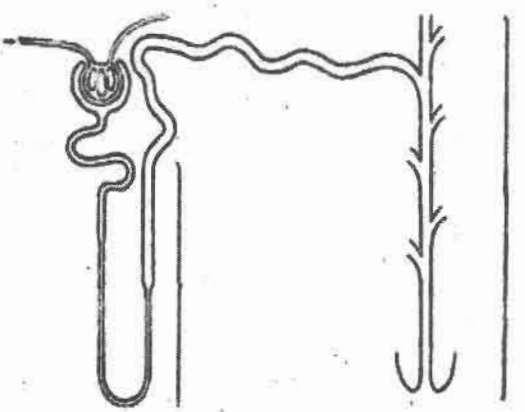

ক) রেনাল করপাসল (Renal corpuscle) ঃ নেফ্রনের অগ্রপ্রান্তকে রেনাল কর্টেক্সে অবস্থিত এবং রেনাল ক্যাপসুল (Renal Capsul) বা বোম্যানস ক্যাপস্যুল ও গ্লোমেরুলাস (Glomerulus) নিয়ে গঠিত।

রেনাল ক্যাপসুল ঃ রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলার কৈশিক জালিকাগুচ্ছকে ঘিরে অবস্থিত ও আইশাকার এপিথেলিয়ামে গঠিত দ্বিস্তরী পেয়ালার মতো প্রসারিত অংশকে রেনাল ক্যাপস্যুল বলে। এর পেপ্লামেরুলাস সংলগ্ন স্তরকে ভিসেরাল স্তর, বহিঃপ্রাচীরকে প্যারাইটাল স্তর, এবং দুইস্তরের মাঝখানে সংকীর্ণ গহবরকে ক্যাপসুলার স্পেস বলে।

গ্লোমেরুলাস ঃ রেনাল ক্যাপস্যুলে প্রায় সম্পূর্ণ আবদ্ধ এবং রেনাল এফারেন্ট (অন্তর্গামী) আর্টারিওল থেকে সৃষ্ট একগুচ্ছ কৈশিকজালিকাকে গ্লোমেরুলাস বলে। একটি গ্লোমেরুলাসে প্রায় ৫০টি কৈশিকজালিকা থাকে। জালিকাগুলোর এণ্ডোথেলিয়াম অত্যন্ত পাতলা এবং অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। জালিকার সমস্ত এপিথেলিয়াল কোষ একটি ভিত্তিঝিল্লির উপর অবস্থিত। কৈশিকজালিকা ও ইফারেন্ট এর্টারিওলের ব্যাস এফারেন্ট আর্টারিওল অপেক্ষা কম। কৈশিকজালিকাগুলো পুনরায় মিলিত হয়ে রেনাল ইফারেন্ট (বহির্গামী) আর্টারিওল সৃষ্টি করে রেনাল ক্যাপস্যুল থেকে বেরিয়ে আসে।

খ) রেনাল টিউব্যুল (Renal tubule) ঃ রেনাল টিউব্যুল নালিকা রেনাল ক্যাপস্যুলের অঙ্কীয়দেশ থেকে সংগ্রাহী নালী পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলি প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা, ২০ থেকে ৬০ মাইক্রন চওড়া। দুই বৃক্কের মোট প্রায় ২৪ লক্ষ রেনাল টিউব্যুল এর সম্মিলিত দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৭২ কিলোমিটার বা ৪৫ মাইল। প্রতিটি রেনাল টিউব্যুল ৪টি অংশে বিভক্ত ঃ

১) প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা,
২) লুপ অব হেনলি,
৩) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা এবং
৪) সংগ্রাহী নালী।

১) প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা (Rroximal convoluted tubule) ঃ এটি নেফ্রণের প্রথম এবং দীর্ঘতম ১৪ মিলিমিটার ও প্রশস্ততম ৬০ মিলিমিটার অংশ। এর প্রাচীর এক স্তর বিশিষ্ট ঘনতলীয় কোষে গঠিত। নালিকা গহবর সংলগ্ন কোষপ্রান্ত অসংখ্য মাইক্রোভিলাই যুক্ত এ প্রান্তকে ব্রাশ বর্ডার বলে, অন্য প্রান্তটি ভিত্তিঝিল্লির উপর স্থাপিত এবং ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে কতগুলো চ্যানেল সৃষ্টি করে।

২) লুপ অব হেনলি (Loop of henle) ঃ প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার শেষপ্রান্ত সোজা ও নিম্নগামী হয়ে মেডুলায় ঢুকে যে, U-অক্ষরের মত লুপ তৈরি করে অবশেষে প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকায় যুক্ত হয় তাকে লুপ অব হেনলি বলে। এটি সুস্পষ্ট ৩টি অংশে বিভক্ত, যথা ঃ- আইশাকার কোষে নির্মিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নিম্নগামী বাণ্ড (Descending limb); আইশাকার কোষে নির্মিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট এবং উর্ধ্বগামী বাণ্ডর নিম্ন অর্ধাংশ গঠনকারী পাতলা উর্ধ্বগামী বাণ্ড (Thin ascending limb); এবং ঘনতলীয় কোষে নির্মিত স্থূল প্রাচীরবিশিষ্ট এবং উর্ধ্বগামী বাণ্ডর উপরের অর্ধাংশ গঠনকারী স্থূল উর্ধ্বগামী বাহু (Thick ascending limb)।

৩) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা (Distal convoluted tubule) ঃ লুপ অব হেনলির স্থূল উর্ধ্বগামী অঞ্চলের পরবর্তী যে নালিকা অংশটি কর্টেক্সে অবস্থিত ও কম প্যাঁচানো, তাকে ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা বলে। এর একটি অংশ রেনাল এফারেন্ট আর্টারিওল সংলগ্ন থাকে। এখানে উভয়ের কোষগুলো নিবিড় ও ক্ষরণকারী কোষে পরিবর্তিত হয়ে জাক্সটাগ্লোমেরুলার কমপ্লেক্স (Juxtaglomerular complex) গঠন করে।

৪) সংগ্রাহী নালী (Collecting Duct) ঃ এটি ডিস্টাল প্যাঁচানো নালির পরবর্তী এবং নেফ্রনের সর্বশেষ অংশ। এর কিছু অংশ কর্টেক্সে, বাকি অংশ মেডুলায় অবস্থিত। নালীটি সোজা এবং এর প্রাচীর একস্তরীয় ঘনতলাকার কোষে গঠিত। কয়েকটি সংগ্রহি নালী মেডুলার গভীরে পস্পর একীভূত হয়ে স্তম্ভাকার কোষ- নির্মিত বেলিনির নালী (Duct of Bellini) গঠন করে। প্রতিটি বেলিনির নালী পিরামিডে প্যাপিলার ছিদ্রপথে পেলভিসে উন্মুক্ত হয়।

নেফ্রনের কাজ ঃ

নেফ্রন অতি পরিস্রাবণ, পুনঃশোষণ, টিউব্যুলার ক্ষরণ ও বিভিন্ন যৌগের সৃষ্টি করে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পন্ন করে ঃ

- রক্তে ও দেহের পানিসাম্য বজায় রাখে।
- প্লাজমার বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা সঠিক রাখে।
- দেহে P^H এর মাত্রা সঠিক রাখে।

বৃক্কে রক্ত সরবরাহ ঃ

প্রতিটি বৃক্কে একটি করে রেনাল ধমনীর মাধ্যমে রক্ত সংবহিত হয়। প্রতিটি ধমনী অসংখ্য রেনাল এফারেন্ট আর্টারিওল এ বিভক্ত হয়। প্রতিটি এফারেন্ট আর্টারিওল নেফ্রণের রেনাল ক্যাপস্যুলে প্রবেশ করে একগুচ্ছ কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়ে একটি গ্লোমেরুলাস গঠন করে। গ্লোমেরলাস থেকে রেনাস

ইফারেন্ট আর্টারিওল সৃষ্টি হয় এবং রেনাল ক্যাপস্যুল থেকে বেরিয়ে রেনাল টিউব্যুলের (প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা, লুব অব হেনলি, ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা) চারপাশ ঘিরে একটি বিস্তৃত কৈশিকজালকের সৃষ্টি করে। এ কৈশিকজালকের নাম পেরিটিউব্যুলার নেটওয়ার্ক অব ক্যাপিলারিস (Peritubular network of capilllaries) -এ কৈশিকজালক থেকে ভেনিউল (Venule) এর সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বৃক্কের সমস্ত নেফ্রনের ভেনিউল মিলিত হয়ে একেকটি (দুই বৃক্কে ২টি) শিরা গঠন করে। প্রতিটি রেনাল শিরা পোস্টক্যাভালো এ উন্মুক্ত হয়ে।

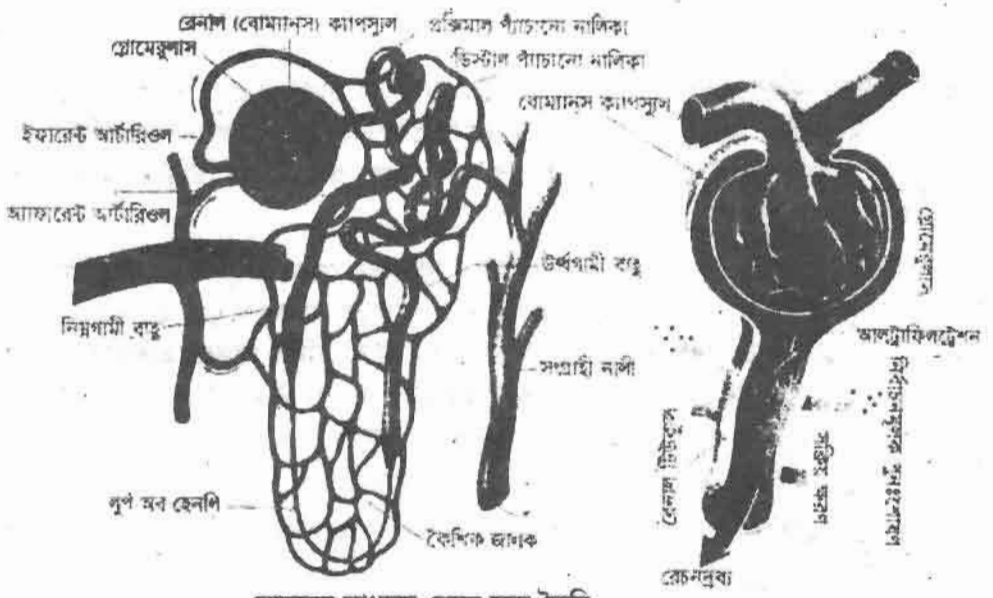

নেফ্রনের মাধ্যমে রেচন দ্রব্য তৈরি

নেফ্রনের প্রকারভেদ ঃ বৃক্কে অবস্থানের ভিত্তিতে নেফ্রন প্রধানত দুধরনের :

১। **কর্টিকাল নেফ্রন** (Cortical nepron) ঃ বৃক্কের কর্টেক্স অংশে অবস্থিত নেফ্রণগুলোকে কর্টিকাল নেফ্রন বলে। এদের লুপ অব হেনলি তুলনামূলকভাবে খাটো থাকে। মানব বৃক্কে ৯০% নেফ্রন এ ধরনের।

২। **জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন** (Juxtamedullary nephron) ঃ যেসব নেফ্রনের গ্লোমেরুলি অন্তঃকর্টেক্সে, মেডুলা সংলগ্ন হয়ে অবস্থিত এবং লুপ অব হেনলি রেনাল পিরামিডের প্রায় প্যাপিলা পর্যন্ত লম্বা, সেসব নেফ্রনকে জাক্সটামেডুলারি নেফ্রণ বলে। মানব বৃক্কে ১০% নেফ্রন এ ধরনের।

রেচন পদার্থ

মানবদেহে বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থই হলো রেচন পদার্থ। নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থের উৎসসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

ইউরিয়া ঃ ইউরিয়াই মানবদেহে প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ। এটি প্রধানত যকৃতে এবং সামান্য পরিমাণ মস্তিষ্কে ও বৃক্কে ডি-এমাইনেজ এনজাইমের সহায়তায় অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডি-এমিনেশন প্রক্রিয়ায় অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় এবং রক্ত-সংবহনের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে।

ইউরিক অ্যাসিড ঃ মানবদেহে পিউরিন বিপাকের শেষ পরিণতি হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড উৎপাদন। দেহজাত ও গৃহীত খাদ্য - দুই ধরনের পিউরিন জাতীয় পদার্থ থেকেই ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ে বৃক্কে পৌঁছে।

ক্রিয়েটিনিন ঃ কলা-প্রোটিনের ভাঙনের ফলে এই জটিল নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থের উৎপত্তি হয়।

মূত্র সৃষ্টি (Formation of Urine) ঃ
যেহেতু রক্তরস থেকে মূত্র সৃষ্টি হয় এবং রক্তরস ও মূত্রের উপাদানের মধ্যে পার্থক্য অনেক, তাই সহজেই ধারণা করা যায় মূত্র সৃষ্টির প্রাক্কালে রক্তরসে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ৩টি ধাপে মানুষের মূত্র সৃষ্টি হয়। যথা -

১) অতিপরিস্রাবন (Ultrafitration);
২) নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ (Selective reabsorption); এবং
৩) সক্রিয় ক্ষরণ (Active secretion)।

১) **অতিপরিস্রাবণ** (Ultrafitration) ঃ বৃক্কের রেনাল ক্যাপস্যুল অতিপরিস্রাবকরূপে কাজ করে এবং গ্লোমেরুলাসের কাছে অবস্থান করে। গ্লোমেরুলাস রক্তের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে রক্তের প্রোটিন ও রক্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কৈশিক জালিকার এণ্ডোথেলিয়াম, ভিত্তিঝিল্লি এবং রেনাল ক্যাপস্যুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে ক্যাপস্যুলের স্পেসে জমা হয়। এই পরিস্রুত তরলকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট (Glomerular filtrate) বলে। যে চাপের মাধ্যমে রক্তের দ্রাব্যবস্তু পরিস্রুত হয়, তাকে কার্যকরী পরিস্রাবণ চাপ (Effective Filteration pressure) বলে।

২) **নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ** (Selective reabsorption) ঃ গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট নেফ্রনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন দ্রব্য নেফ্রন-প্রাচীরের কোষে শোষিত হয়ে নেফ্রন সংলগ্ন কৈশিক জালিকায় প্রবেশের প্রক্রিয়াকে নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলে। প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার কোষেই অধিকাংশ পুনঃশোষণ সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ফিলট্রেট থেকে প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম ও সমস্ত গ্লুকোজ, ৬৫% পানি, ৫০% ইউরিয়া, এমিনো এসিড, ভিটামিন এবং ক্লোরাইড আয়ন এখানে শোষিত হয়। মানবদেহে প্রতি মিনিটে ১২৫ ঘন সেন্টিমিটার গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ১২৪ ঘন সেন্টিমিটার পুনঃশোষিত হয়। এর মধ্যে ৮০% পুনঃশোষিত হয় প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকায় এবং বাকি ২০% লুপ লব হেনলি, ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা ও সংগ্রাহী নালীতে শোষিত হয়।

৩) **সক্রিয় ক্ষরণ** (Active secretion) ঃ প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকায় কৈশিক জালিকা থেকে কিছু অবাঞ্ছিত বস্তু যেমন ঃ- ক্রিয়েটিনিন ও সামান্য ইউরিয়ার সক্রিয় ক্ষরণ সংঘটিত হয়। এই সব পদার্থ নালিকার চারপাশের কলারস থেকে নালিকার ভেতরে ফিলট্রেট হয় এবং পরিশেষে মূত্রের সাথে অপসারিত হয়। ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় হাইড্রোজেন, পটাসিয়াম ও অ্যামোনিয়াম আয়ন ক্ষরিত হয়। এখানে অবাঞ্ছিত বস্তুর সক্রিয় ক্ষরণও সংঘটিত হয়।

উপরের বর্ণনার প্রেক্ষিতে মূত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো

রেচন পদার্থসহ রক্ত রেনাল ধমনীর মাধ্যমে সংবহিত হয়ে রেনাল এফারেন্ট আর্টারিওল দিয়ে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে। অতিপরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় রক্তের রক্তকণিকা ও প্লাজমার কোলয়েড অংশ ছাড়া বাকি অংশ পরিস্রুত হয়ে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট হিসেবে রেনাল ক্যাপস্যুলের গহ্বরে পতিত হয়। সেখান থেকে পরিস্রুত তরল নেফ্রনের বিভিন্ন নালিকা অংশে বাহিত হয়। এই সময় দেহের প্রয়োজনীয় উপাদান ফিলট্রেট থেকে পুনঃশোষিত হয় এবং কিছু রেচন পদার্থ এতে ক্ষরিত হয়। ক্ষরিত পদার্থসহ ফিলট্রেটের তরল মূত্ররূপে নেফ্রন থেকে পেলভিসে মুক্ত হয়।

মূত্র (Urine) ঃ
নেফ্রনের রেনাল টিউব্যুলের বিভিন্ন অংশ পুনঃশোষণের পর সামান্য হলুদ রঙের, বিশেষ ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত, সামান্য অম্লধর্মী পানিসহ যে অপ্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ মূত্রনালী পথে দেহ থেকে মুক্ত হয় তাকে মূত্র বলে।

মূত্রের পরিমাণ খাদ্যের ধরন, পানি গ্রহণের পরিমাণ, পরিবেশের তাপমাত্রা, দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। খাদ্যে তরল পদার্থের পরিমাণ বেশি হলে মূত্রের পরিমাণও বেড়ে যায় আবার বেশি ঘাম হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায়। যে সব দ্রব্য মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয় তাদেরকে ডাইউরেটিক্স (Diuretics) বলে। যেমন - চা, কফি, পানি, বিভিন্ন ধরনের পানীয় প্রভৃতি।

মূত্রে ইউরোক্রোম (Urochrome) নামক রঞ্জক থাকার জন্য মূত্রে স্বাভাবিক রং হয় খড় বর্ণ।

মূত্রের স্বাভাবিক ধর্মাবলি (Properties of Urine)

ক) পরিমাণ	:	১,০০০ থেকে ১,৫০০ মিলিলিটার প্রতিদিন।
খ) আপেক্ষিক গুরুত্ব	:	১,০২০ থেকে ১,০৩০
গ) pH	:	৪.৫ থেকে ৮ (গড়ে ৬; অম্লিক)
ঘ) গন্ধ	:	অ্যামোনিয়া গ্যাসের গন্ধ
ঙ) বর্ণ	:	খড় বর্ণ

মূত্রের বিভিন্ন উপাদান ও পরিমাণ

উপাদান		শতকরা হার
ক) পানি	:	৯৫%
খ) ইউরিয়া	:	২ %
গ) ইউরিক অ্যাসিড	:	০.০৫%
ঘ) ক্রিয়েটিনিন	:	০.০৭৫%
ঙ) সোডিয়াম	:	০.৩৫%
চ) অ্যামোনিয়াম	:	০.০৪%
ছ) পটাসিয়াম	:	০.১৫%
জ) ম্যাগনেসিয়াম	:	০.০১%
ঝ) ক্লোরাইড	:	০.৬০%
ঞ) ফসফেট	:	০.২৭%
ট) সালফেট	:	০.১৮%
ঠ) অন্যান্য	:	১.২৭৫%

অসমোটিক রেগুলেশনে (Osmotic regulation) **রেচনতন্ত্রের ভূমিকা**

দেহের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য দেহে পরিমিত পানি থাকা অপরিহার্য। প্রধানত মূত্রের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি পানি দেহ থেকে বের হয়ে যায়। পানি যদি এভাবে শুধু বেরিয়েই যায় তাহলে এক সময় ২০ শতাংশ কমে গেলে কোষের ক্ষতি, রক্ত সংবহনে ব্যর্থতা, এসিডোসিস, রক্তে নাইট্রোজেনের আধিক্য ও স্নায়ুতন্ত্রের অবদমনের ফলে মৃত্যু অনিবার্য। তাই মানবদেহের প্রাকৃতিক ও রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে সব সময় পানিসাম্য অক্ষুন্ন থাকে।

দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণে বৃক্ক প্রধান ভূমিকা পালন করে। বৃক্কে নেফ্রনের মাধ্যমে পুনঃশোষণ প্রক্রিয়ায় দেহে পানির সমতা বজায় থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে ১২৫ ঘন সেন্টিমিটার তরল পদার্থ গ্লোমেরুলাসে পরিস্রুত হয়। এর মধ্যে ১২৪ ঘন সেন্টিমিটার তরল পদার্থই পুনঃশোষিত হয় এবং মাত্র ১ ঘন সেন্টিমিটার মূত্র নির্গত হয়। এন্টিডাইয়ুরেটিক হরমোনের (Antidiuretic Hormone = ADH) প্রভাবে এই পুনঃশোষন প্রক্রিয়ার প্রায় ৮০% সম্পন্ন হয় নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকায় এবং বাকি ২০% নেফ্রনের অন্যান্য অংশে।

রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত অসমো রিসেপ্টর (Osmo receptor) কোষগুলো উত্তেজিত হয় এবং ADH উৎপন্ন করে। নিউরোনের এক্সন বেয়ে ADH পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোত ক্ষরিত হয়। ক্ষরিত হরমোন বৃক্কসহ দেহের সব অংশে বাহিত হয়। বৃক্কে নেফ্রনগুলোর সংগ্রাহী নালীর কোষঝিল্লিতে অবস্থিত গ্রাতক অণু ADH গ্রহণ করে, ফলে ঝিল্লির পানিভেদ্যতা বেড়ে যায়। গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে তখন পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বৃক্কের সংগ্রাহী নালীতে পুনঃশোষিত হয়। সংগ্রাহী নালীতে তরল বেশ ঘন হয়ে যায় এবং অল্প পরিমাণ অতি ঘন মূত্র উৎপন্ন হয়।

পক্ষান্তরে, রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে হাইপোথ্যালাসের অসমো রিসেপ্টর কোষগুলো তেমন উত্তেজিত হয় না এবং অতি অল্প পরিমাণ ADH ক্ষরিত হয়। তখন সংগ্রাহী নালীর কোষগুলো প্রায় পানি অভেদ্য হয়ে যায়, ফলে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে পানি পুনঃশোষণ বন্ধ হয়ে যায়। সংগ্রাহী নালীতে তখন ফিলট্রেট অনেক তরল হয়ে যায় এবং বেশি পরিমাণ অতি তরল মূত্র উৎপন্ন হয়। দেহে পানির সমতা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। রেনাল ক্যাপস্যুলে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সবসময় অব্যাহত থাকে।

পানির অভাবে রক্তরসের ঘনত্ব বাড়লে কিংবা পরিমান কমে গেলে এড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত এলডোষ্টেরন হরমোন মূত্রে সোডিয়াম আয়নের রেচন কমিয়ে পরোক্ষভাবে পানির রেচনও হ্রাস করে। এভাবে রেচণতন্ত্র মানবদেহে অসমটিক রেগুলেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাইট্রোজেনজনিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণে রেচতন্ত্রের ভূমিকা

স্বাভাবিক মূত্রে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, এমোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি নাইট্রোজেনজাত পদার্থ থাকে। এগুলো দেহের জন্য বিষাক্ত এবং ক্ষতিকর। সেই জন্য উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলো অপসারণ করা প্রয়োজন। এসব অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে অপসারণে রেচনতন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রেচনতন্ত্রের ভূমিকা

- নেফ্রন হচ্ছে বৃক্কে মূত্র উৎপাদনের একক। প্রত্যেক বৃক্কে অসংখ্য ১৩ লক্ষ নেফ্রন থাকে। নেফ্রনগুলো অবিরাম ও জটিল প্রক্রিয়ায় মূত্র উৎপাদন করে দেহেকে কলুষমুক্ত রাখে ।
- উৎপন্ন মূত্র সংগ্রাহক নালীর মাধ্যমে বৃক্কের পেলভিসে পৌছায়।
- পেলভিস থেকে ফানেল আকৃতির প্রশস্ত অংশ বেয়ে মূত্রবাহী নালীতে প্রবেশ করে।

- মূত্রবাহী নালী হয়ে মূত্রথলিতে সাময়িকভাবে জমা থাকে।
- মূত্রথলী মূত্রে পূর্ণ হলে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জাগে। ফলে মূত্রথলির নিচের দিকে অবস্থিত ছিদ্র খুলে যায় এবং মূত্র প্রবাহিত হয়ে বহিঃমূত্রনালীর স্ফিংক্টার খুলে যায় এবং মূত্র মূত্রনালী পথে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রেচনতন্ত্র কাকে বলে?

২। রেচনতন্ত্র কি কি অঙ্গ নিয়ে গঠিত?

৩। নেফ্রন বলতে কি বোঝ?

৪। বৃক্কের আকার ও অবস্থান লেখ।

৫। মূত্রবাহি নালী বলতে কী বোঝ?

৬। নেফ্রনের অংশগুলো উল্লেখ কর।

৭। নেফ্রনের কাজ কি কি ?

৮। রেচন পদার্থ বলতে কি বোঝ?

৯। রেচন পদার্থের নামগুলি উল্লেখ কর?

খ) রচনামুলক প্রশ্ন

১। বৃক্কের গঠন বর্ণনা কর।

২। বৃক্কের কাজ বর্ণনা কর।

৩। মূত্র কী ? এর ধর্মাবলি লেখ।

৪। রেচনতন্ত্রের ভূমিকা বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

প্রজননতন্ত্র

পুরুষ প্রজনন তন্ত্র (Male reproductive system)

প্রজনন (Reproduction) ঃ যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজের প্রজাতির বিলুপ্তি রোধের উদ্দেশে বংশ রক্ষার প্রয়োজনে একই প্রজাতিভুক্ত বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট অপর সদস্যের সহায়তায় নিজের মত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশু উৎপন্ন করে তাকে প্রজনন বলে।

মানুষের বংশবৃদ্ধি যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় দুটি বিপরীত লিঙ্গের জীব পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেট শুক্রাণু ডিম্বাণু সৃষ্টি ও নিষেকের মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করে সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে তাকে যৌন প্রজনন বলে।

প্রজননতন্ত্র (Reproductive system) ঃ যে সকল অঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের প্রজননে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে একত্রে প্রজননতন্ত্র বলে। মানুষ একলিঙ্গ বিশিষ্ট প্রানি। মানুষের যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে প্রজনন সংঘটিত হয়। মানুষের পুরুষ এবং স্ত্রী জননতন্ত্র পৃথক পৃথক দেহে অবস্থান করে। মানুষের প্রজননতন্ত্র দুই প্রকার যথা :-

১) পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও
২) স্ত্রী প্রজননতন্ত্র।

১) **পুরুষ প্রজননতন্ত্র** ঃ শুক্রাণু উৎপাদন করা, শুক্রাণু জমা রাখা এবং সেগুলোকে দেহ থেকে নিষ্কাশন করার সাথে পুরুষের দেহের যে তন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাকে পুরুষ প্রজননতন্ত্র বলে।
পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের অঙ্গসমূহকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :-

১) মুখ্য প্রজনন অঙ্গ (Primary sex organ) - শুক্রাশয় (Testis)
২) আনুষঙ্গিক অঙ্গ (Accessory sex organ) - স্ক্রোটাম (Scrotum)

ক) স্ক্রোটাম (Scrotum) বা অণ্ডকোষ
খ) এপিডিডাইমিস (Epididymis)
গ) শুক্রনালী বা ভাস-ডিফারেন্স (Vas-deferens)
ঘ) সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle)
ঙ) ক্ষেপন নালী (Ejaculatory duct)
চ) মূত্রনালী (Urethra)
ছ) পুরুষাঙ্গ (Penis)
জ) প্রস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland)
ঝ) বাল্বোইউরেথ্রাল গ্রন্থি (Bulbo-urethral gland)

১। **শুক্রাশয়** (Testes)

অবস্থান ও গঠন ঃ প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা একজোড়া ডিম্বাকার শুক্রাশয় স্ক্রোটাম নামক একটি থলির ভেতর আবদ্ধ এবং শুক্ররজ্জু দিয়ে লাগানো অবস্থায় দুইপায়ের উরুসন্ধিতে উপাঙ্গর মতো ঝুলে থাকে। স্ক্রোটামের ভেতর শুক্রাশয় দুইটি পাশাপাশি অবস্থান করে। বাম দিকের স্ক্রোটাম বড় এবং কিছুটা ঝোলা। শুক্রাশয়ের ওজন ১০ থেকে ১২ গ্রাম। প্রত্যেক শুক্রাশয় ৩টি আবরণীতে আবৃত থাকে। বাইরেরটি টিউনিকা ভেজিনালিস (Tunica vaginalis) মাঝে টিউনিকা এলবুজিনিয়া (Tunica albugenea) নামে একটি স্থূল তন্তুময় ক্যাপসুল এবং এর নিচে রক্ত বাহিকাসমৃদ্ধ টিউনিকা ভাস্কুলোসা টেসটিস (Tunica vasculosa testis) স্তর অবস্থিত।

টিউনিকা এলবুজিনিয়া ও ভাস্কুলোসা উভয় স্তরই কতগুলি অরীয় ব্যবধায়ক পাঠিয়ে শুক্রাশয়কে প্রায়

২৫০টি পিরামিডের মতো খণ্ডে (লোবিউলি টেসটিস) বিভক্ত করে। প্রত্যেক খণ্ডে ১ থেকে ৪টি সূক্ষ্ম ও প্যাঁচানো সেমিনিফেরাস নালিকা (Seminiferous tubules) থাকে সেমিনিফেরাস নালিকা কতগুলো সংগ্রাহক নালিকায় উন্মুক্ত হয়ে যে জালিকার সৃষ্টি করে তাকে রেটি টেসটিস (Rete testis) বলে। রেটি টেসটিস থেকে প্রায় ৪ থেকে ৬ মিলিমিটার লম্বা সংগ্রাহক নালী সৃষ্টি হয়ে প্রত্যেক শুক্রাশয়ের শীর্ষদেশ থেকে শুক্রাশয় ত্যাগ করে এপিডিডাইমিসে মিলিত হয়। সংগ্রাহক নালীগুলিকে ভাসা ইফারেন্সিয়া (Vasa efferentia) বলে।

শুক্রাশয়ের কাজ

- শুক্রাণু উৎপন্ন করা।
- টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন ক্ষরণ করা।

২। **এপিডিডাইমিস** (Epididymis)

অবস্থান ও গঠন ঃ প্রত্যেক শুক্রাশয়ের ভাসা ইফারেন্সিয়া একত্রে মিলিত হয়ে একটি করে ৪ থেকে ৬ মিলিমিটার লম্বা অত্যন্ত প্যাঁচানো এপিডিডাইমিস গঠন করে। এর লেজ অংশটি সোজা হয়ে ভাসা ডিফারেন্সিয়ায় মিলিত হয়।

এপিডিডাইমিসের কাজ

- শুক্রাণু বিভিন্ন নালিকা ঘুরে এপিডিডাইমিসে আসে। এটি শুক্রাণুর ভেতর থেকে তরল ও কঠিন অসার পদার্থ অলাদা করে তাদের নিষেক ক্ষমতা বাড়ায়।
- প্রতিটি এপিডিডাইমিসে শুক্রাণু প্রায় একমাস সঞ্চিত থাকতে পারে।
- পুষ্টি পদার্থ ক্ষরণ করে শুক্রাণুদের সতেজ রাখে।

৩। **ভাস ডিফারেন্স** (Vas deferens)

অবস্থান ও গঠন ঃ প্রতিটি এপিডিডাইমিস একটি করে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার লম্বা বড় গহবর ও মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট ভাস ডিফারেন্স-এ উন্মুক্ত হয়। প্রতিটি ভাস ডিফারেন্সস শ্রোণীগহবরে প্রবেশ করে এবং মূত্রথলির উপর বেঁকে অবস্থান করে। মূত্রনালী অতিক্রম করার পর এম্পুলা (Ampulla) নামক একটি মাকু আকৃতির ফোলা অংশ গঠন করে। এম্পুলা পরে সেমিনাল ভেসিকলে যুক্ত হয়।

ভাস ডিফারেন্স-এর কাজ

- প্রধান কাজ হচ্ছে সঙ্গমের সময় দ্রুত শুক্রানু পরিবহন।
- কিছু সময়ের জন্য শুক্রাণু জমা রাখা।

৪। **সেমিনাল ভেসিকল** (Seminal vesicle)

অবস্থান ও গঠন ঃ সেমিনাল ভেসিকল মূত্রথলির নিম্নপ্রান্ত ও মলাশয়ের মাঝখানে অবস্থিত একজোড়া ছোট, আঙুলের মতো কোঁচকানো থলিকা। প্রত্যেক থলিকা একেকটি প্যাঁচানো নালিকায় গঠিত ও যোজক কলায় আবৃত।

সেমিনাল ভেসিকলের কাজ

- শুক্র (Semen) তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ পিচ্ছিল থকথকে পদার্থ ক্ষরণ করে।
- ক্ষরণের ফ্রুকটোজ সচল শুক্রাণুর শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।
- ক্ষরণের ফ্লেভিন কণিকা অতিবেগুনি রশ্মিতে চকচকে বর্ণ দান করে।

৫। **ক্ষেপন নালী** (Ejaculatory duct)

অবস্থান ও গঠন ঃ প্রতিটি সেমিনাল ভেসিক্‌ল থেকে সৃষ্ট একটি করে খাটো নালী প্রত্যেক ভাস ডিফারেন্সের এম্পুলার সাথে একীভুত হয়ে একটি করে ০.৩ মিলিমিটার ব্যাসের ১৯ মিলিমিটার লম্বা অভিন্ন ক্ষেপন নালী তৈরি করে। এরা দুটি চেরাস্থি পথে মূত্রনালীর (Urethra) প্রস্টেটিক অংশে মুক্ত হয়।

ক্ষেপন নালীর কাজ

- সেমিনাল থলিকার ক্ষরণসহ শুক্রাণুকে মূত্রনালীতে (Urethra) পৌছে দেয়া।

৬। **বহিঃযৌনাঙ্গ** (External genitalia root) ঃ বহিঃযৌনাঙ্গ দুই রকম যথা ঃ- স্ক্রোটাম ও শিশ্ন।

স্ক্রোটাম বা অণ্ডথলি : অণ্ডথলি দুই উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকা ও ত্বকে আবৃত থলি বিশেষ। ত্বকের নিচে পাঁচ ধরনের পেশিস্তর ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত থাকে। সবকটি স্তর মিলিত হয়ে যে ব্যবধায়ক নির্মাণ করে সেটি স্ক্রোটামের গহবরকে দুই ভাগে ভাগ করে। প্রত্যেক ভাগ একটি করে শুক্রাশয় ও তার এপিডিডাইমিস এবং শুক্রাণুর কিছু অংশ ধারণ করে।

বহিঃযৌনাঙ্গের কাজ

- শুক্রাণু উৎপন্নের অনুকূল তাপমাত্রা রক্ষা করে।
- শুক্রাশয়কে চাপজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। চাপের মুখে শুক্রাশয় থলির ভেতর সহজেই পিছনে যেতে পারে ।

৭। **শিশ্ন বা পুরুষাঙ্গ** (Penis) ঃ শিশ্ন হচ্ছে পুরুষের এমন একটি বহিরাঙ্গ যার ভেতর দিয়ে মূত্রনালী অতিক্রম করে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এর ত্বকের নিচে চর্বি নেই কিন্তু পাতলা কলা আছে। তাই শিশ্নের ত্বক এত আলগা। যে অংশ থেকে শিশ্ন উঠেছে তাকে শিশ্নমূল (Root) বলে। সেখানে কয়েক গোছা চুল থাকে। শিশ্নের যে অংশ ঝুলে থাকে, সেটি শিশ্নদেহ। এর ডগায় ব্যাঙের ছাতা আকৃতির লাল মুণ্ডিকে গ্লান্স পেনিস (Glans penis) বলে। এতে সবচেয়ে বেশি স্নায়ুর প্রান্তদেশ উন্মুক্ত। এ মুণ্ডিকে যে চামড়া ঢেকে রাখে তাকে প্রিপিউস (Prepuce) বলে (মুসলমান পুরুষের এ অংশটি মুসলমানির সময় কেটে ফেলা হয়)। শিশ্নদেহ দুইধরনের উত্থানক্ষম (Erectile) কলায় গঠিত।

শিশ্নের কাজ ঃ

- শিশ্ন দৃঢ় ও প্রসারিত হয়ে মূত্রনালীর মাধ্যমে বীর্য স্ত্রী জননতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে।

৮। **জনন গ্রন্থি ঃ** মানুষের জনন নালী সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত দুইটি গ্রন্থি পাওয়া যায়।

ক) **প্রস্টেট গ্রন্থি** (Prostate gland) ঃ

অবস্থান ও গঠন ঃ প্রস্টেট গ্রন্থি শ্রোণীগহবরে মূত্রনালির নিচে অবস্থিত নাশপাতি আকৃতির গ্রন্থি এবং এটি গোড়া ও চূড়ায় বিভক্ত। পেশল ও গ্রন্থিময় কলায় গঠিত। গ্রন্থিময় কলা কতগুলি খণ্ডযুক্ত। খন্ডগুলির নালিকা মূত্রনালীতে উন্মুক্ত হয়। এই গ্রন্থির ক্ষরণ পেশল কলার সংকোচনে মূত্রনালীতে মুক্ত হয়।

প্রস্টেট গ্রন্থির কাজ

- এই গ্রন্থি নিঃসৃত তরল পদার্থ বীর্যরসের পরিমাণ বাড়ায়।
- সম্ভবত শুক্রাণুর পুষ্টি যোগায়।

খ) বাল্বোইউরেথ্রাল বা কাওপার -এর গ্রন্থি (Cowper's gland)

অবস্থান ও গঠন ঃ কাওপার এর গ্রন্থি মূত্রনালীর দুপাশে অবস্থিত দুটি মটর দানার মতো গ্রন্থি যা থেকে নালিকা বেরিয়ে মূত্রনালীতে মিলিত হয়।

কাওপার-এর গ্রন্থির কাজ

- সঙ্গমের সময় মিউকাসের মত পদার্থ ক্ষরণ করে।

শুক্রাণুর গঠন

একটি পরিণত শুক্রাণুকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা-মস্তক, মধ্যখণ্ড এবং লেজ।

মস্তক ঃ এটি মোচাকৃতির এবং শীর্ষদেশ আংশিকভাবে এক্রোসোমাল টুপি দিয়ে আবৃত। এ টুপি গলজি বডি থেকে উদ্ভূত এবং এক ধরনের এনজাইম বহন করে যা নিষেকের সময় ডিম্বঝিল্লি বিদীর্ণ করতে সাহায্য করে। মাথায় যে নিউক্লিয়াসটি থাকে তা DNA সমৃদ্ধ।

মধ্যখণ্ড ঃ এটি মাইপোকণ্ড্রিয়া সমৃদ্ধ অংশ এবং লম্বালম্বি অবস্থিত দুটি সেন্ট্রিওল এর সাহায্যে মাথা থেকে পৃথক।

লেজ ঃ এটি লম্বা এবং একটোমায়োসিনসদৃশ সংকোচনশীল তন্তু নিয়ে গঠিত। জরায়ুর অভ্যন্তরে এর সাহায্যে সাঁতরে শুক্রাণু ডিম্বাণুর দিকে ধাবিত হয়। এ সময় প্রয়োজনীয় শক্তি আসে মাইটোকণ্ড্রিয়াসমৃদ্ধ মধ্যখন্ড থেকে। শুক্রাণু প্রতি সেকেণ্ডে ১ থেকে ৪ মিলিমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে।

বয়ঃপ্রাপ্তিতে হরমোনের ভূমিকা

মাধ্যমিক যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের সক্রিয় পরিস্ফুটনকালকে বয়ঃপ্রাপ্তি বা বয়ঃসন্ধি (Puberty) বলে। সময়টি হচ্ছে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণের মুহূর্ত। এই কালটি পুরুষের ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হয়। এ সময় বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে দৈহিক গঠন ও চরিত্রে নানান বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। বয়ঃসন্ধিকালের এসব বৈশিষ্ট্যকে মাধ্যমিক যৌন বৈশিষ্ট্য (Secondary sex characters) বলে। বীর্যপাত পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্যসূচক। বয়ঃপ্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণে পিটুইটারি গ্রন্থির সন্মুখ অংশ থেকে ক্ষরিত দুধরনের গোনাডোট্রফিক হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শৈশবে এই হরমোনগুলোর ক্ষরণ কম থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষরণের মাত্রা বেড়ে যায়, ফলে জননাঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং মাধ্যমিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এই ভাবে পুরুষের বয়ঃসন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হয়।

পুরুষের বয়ঃপ্রাপ্তিতে হরমোনের ভূমিকা

যে সব হরমোন পুরুষের বয়ঃপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে সেগুলোর বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। **সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির গোনাডোট্রফিক হরমোন** ঃ তিন ধরনের গোনাডোট্রফিক হরমোনের মধ্যে দুটি হরমোন পুরুষের জননাঙ্গ ও আনুষঙ্গিক জননাঙ্গগুলোর পূর্ণতা দানে সাহায্য করে। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) সেমিনিফেরাস নালিকার বৃদ্ধি ও পূর্ণতা ঘটিয়ে শুক্রাণু উৎপাদনে সাহায্য করে। ল্যুটিনাইজিং হরমোন (LH) শুক্রাশয়ের এবং লেডিগ কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে টেস্টোস্টেরন নামক পুরুষ যৌন হরমোন ক্ষরণে অংশ নেয়।

২। **সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির বিপাকীয় হরমোন এবং পশ্চাৎ পিটুইটারি গন্থির ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন** ঃ দৈহিক চরিত্রের পার্তক্য গঠনে সাহায্য করে।

৩। **এড্রেনাল গ্রন্থির এণ্ড্রোজেন হরমোন** ঃ শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় লোম বৃদ্ধি, মানসিক ও যৌন চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

৪। **শুক্রাশয়ের টেস্টোস্টেরন হরমোন** ঃ বয়ঃসন্ধিকালে হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক রিলিজিং ফ্যাক্টর সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থিকে FSH ও LH ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। এ হরমোন দুটি শুক্রাশয়কে

টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণে উদ্বুদ্ধ করে। এ ক্ষরণ বয়ঃসন্ধির মুর্হূতে ক্রমশ বাড়তে শুরু করে এবং বয়ঃসন্ধিকালে সবচেয়ে বেশি ক্ষরিত হয়। টেস্টেস্টেরন আজীবন ক্ষরিত হলেও বৃদ্ধ বয়সে ধীরে ধীরে কমে যায়। টেস্টোস্টেরন প্রাইমারি জননাঙ্গের বৃদ্ধি বিকাশ এবং বিভিন্ন মাধ্যমিক যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Female reproductive system)

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ঃ স্ত্রীদেহে যেসব অঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে ডিম্বাণু (Ova) তৈরিতে এবং পুরুষদেহ হতে আগত শুক্রাণু দ্বারা নিষেকের মাধ্যমে মানব শিশুর জন্ম দেওয়ার সাথে জড়িত থাকে, তাকে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র বলে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের অঙ্গসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা :-

১। মুখ্য প্রজনন অঙ্গ (Primary sex organ) - ডিম্বাশয় (Ovary)

২। আনুষঙ্গিক অঙ্গ (Accessory sex organ) - ডিম্বনালী (Fallopian tube)
- জরায়ু (Uterus)
- যোনি (Vagina)
- বহিঃযৌনাঙ্গ (External genitalia)

১। **ডিম্বাশয়** (Ovary)

অবস্থান ও গঠন ঃ শ্রোণীর পেছনের ফাঁপা গহবরে জরায়ুর দুই পাশে ইউরেটারের নিচে বাদাম আকৃতির একজোড়া ডিম্বাশয় অবস্থিত। প্রত্যেক ডিম্বাশয় ২.৫ থেকে ৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ১.৫ থেকে ৩ সেন্টিমিটার চওড়া ও ০.৬ থেকে ১.৫ সেন্টিমিটার পুরু। জরায়ু ও ফেলোপিয়ান নালীসহ উদরে একটি পেরিটোনেয়াম পর্দার ভাঁজ করা কলার সাহায্যে আটকে থাকে। এদের ওজন ২.০ থেকে ৩.৫ গ্রাম।

ডিম্বাশয়ের কাজ

- ডিম্বাণু উৎপন্ন করা।
- স্ত্রী যৌন হরমোন ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন ক্ষরণ করা। এদের প্রভাবে রজঃচক্র, গর্ভ, অমরা, জননেন্দ্রিয়, মাতৃস্তন পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। **ফেলোপিয়ান নালী** (Fallopian tube)

অবস্থান ও গঠন ঃ ফেলোপিয়ান নালী জরায়ুর দুইপাশে অবস্থিত দুইটি পেশল ও ১২ সেন্টিমিটার লম্বা নালী। এদের একপ্রান্ত ডিম্বাশয়ের কাছে পেরিটোনিয়াল গহবরে ও অন্যপ্রান্ত জরায়ু–গহবরে উন্মুক্ত। ডিম্বাশয় সংলগ্ন প্রান্তটি অসংখ্য আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধনযুক্ত হয়ে ঝালর বা ফিমব্রি (Fimbriae) তে পরিণত হয়। পরের ফানেলাকার অংশটি ইনফান্ডিবুলাম (Infundibulum)। এর স্ফীত অংশ এম্পুলা (Ampulla) যে মধ্য অংশটি জরায়ু-প্রাচীরের কাছে থাকে তা ইসথমাস (Isthmus)।

ফেলোপিয়ান নালীর কাজ

- ডিম্বাশয় থেকে পতিত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করে জরায়ুতে পৌঁছে দেয়।
- রস ক্ষরণ করে শুক্রাণুকে উর্ধ্বপ্রান্তে উঠে ডিম্বাণুকে নিষিক্তকরণে সাহায্য করে।

৩। **জরায়ু** (Uterus)

অবস্থান ও গঠন : জরায়ু দেখতে উল্টানো নাশপাতির মতো ফাঁপা, মাংসল অঙ্গ এবং মূত্রাশয়ের পেছনে ও মলাশয়ের সামনে শ্রোণী-গহবরে অবস্থিত। জরায়ু-প্রাচীর বহিঃস্থ পেরিটোনিয়াম '(Peritoneum)', মধ্যস্থ মায়োমেট্রিয়াম '(Myometrium)' এবং অন্তঃস্থ এণ্ডোমেট্রিয়াম '(Endometrium)' এ গঠিত। জরায়ুর উপরের অংশকে জরায়ুদেহ '(Body of uterus)' এবং নিচের অংশকে সারভিক্স '(Cervix)' বলে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে জরায়ু পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় এটি প্রায় ২০ গুণবৃদ্ধি পায়।

জরায়ুর কাজ

- ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভ্রূণকে আগলে রক্ষা করে এবং পরিস্ফুটন সম্ভবপর করে তোলে।
- অমরা সৃষ্টি করে ভ্রূণের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন করে।
- শুক্রাণুর আগমনকে ত্বরান্বিত করে।
- সারভিক্সের (জরায়ুকণ্ঠের) নিঃসৃত ক্ষরকীয় রস শুক্রাণুর চলৎশক্তি বৃদ্ধি করে।

৪। যোনি (vagina)

এটি শুক্রাণু গ্রহণের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীদেহের একটি মাংসল, ৮-১০ সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার খাদ যা মূত্রাশয়ের নিচ দিয়ে দেহের

অভ্যন্তরস্থ জরায়ু থেকে বাইরে উন্মুক্ত। যোনির প্রাচীরে অসংখ্য ভাজ দেখা যায়। ভাঁজগুলোকে রূগী (Rogae) বলে। কুমারীদের যোনিপথে হাইমেন (Hymen) বা সতীচ্ছেদ নামক একটি যোনিপথ অবরোধকারী পর্দা দেখা যায়।

কাজ ঃ

- মাংসল প্রাচীরের সাহায্যে যে কোন আকারের শিশ্নকে গ্রহণ করা।
- বীর্য স্খলনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনা প্রদান করা।
- স্খলিত বীর্য গহণ করা ।
- প্রসব ঝামেলামুক্ত করা।

৫। বহিঃযৌনাঙ্গ (External genitalia)

অবস্থান ও গঠন ঃ এগুলো যোনিমুখে অবস্থিত সংবেদী স্নায়ুপ্রান্তসমৃদ্ধ দুটি মাংসল ভাঁজ ও ভগাঙ্কুর। দুটি মাংসল ভাঁজ কপাটের মতো যোনিপথকে ঢেকে রাখে। এদের একটি বড় ও একটি ছোট এবং যথাক্রমে লেবিয়া মেজরা ও লেবিয় মাইনরা নামে পরিচিত। দুই লেবিয়া মেজরার সন্ধিস্থলের উপরের অংশের ভেতর মেদ কলা থাকায় ওই অংশ বেশ উঁচু এবং চুলে ভরা থাকে। এ উচু অংশকে মন্স ভেনেরিস বা মন্স পিউবিস বলে। লেবিয়া মেজরার একেবারে উপরে জোড়ের কাছে যে উঁচু ছোট মাংসপিন্ড দেখা যায় তাকে ক্লাইটোরিস বা ভংগাকুর বলে। যোনি ও ইউরেথ্রা এখানে উন্মুক্ত হয়। ইউরেথ্রার চারদিকে এবং ক্লাইটোরিসের উপরে কতকগুলো ক্ষুদ্র গ্রন্থি অবস্থিত। লেবিয়া মাইনরা-র অন্তর্তলে বার্থোলিন এর গ্রন্থি নামে দুটি বড় গ্রন্থি উন্মুক্ত হয়েছে।

কাজ ঃ

- লেবিয়া জেরা ও মাইনরা যোনিদ্বারকে ঢেকে রাখে।
- বাথোলিন-এর গ্রন্থিক্ষরণ যৌনমিলনের সময় যোনিপথকে পিচ্ছিল করে তোলে।
- ক্লাইটোরিস যৌন মিলনকে অনন্দঘন করে তোলে।

একটি পরিপক্ব ডিম্বাণুর গঠন

স্ত্রীদেহের জনন একককে ডিম্বাণু বলে। এটি গোলাকার ও ১০৪-১২০ ব্যাস সম্পন্ন এবং ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে উৎপন্ন হয়। প্রতিটি পরিপক্ক ডিম্বাণুকে ৩টি অংশে ভাগ করা যায় ঃ

১/ ডিম্বাণুঝিল্লি
২/ সাইটোপ্লাজম ও
৩/ নিউক্লিয়াস।

১। **ডিম্বাণুঝিলি** ঃ মানুষের ডিম্বাণুতে কোনো প্রকৃত ভিটেলাইন ঝিল্লি নেই, তবে স্বাভাবিক প্লাজমালেমা আছে। এর চারদিক পলিকল কোষ নিঃসৃত একটি পুরু স্বচ্ছ পদার্থে আবৃত থাকে। এস্তর স্বচ্ছ হলেও অনেক ক্ষুদ্রাকৃতিক্ষুদ্র নালিকাযুক্ত। এসব নালিকাপথে ফলিকল কোষের প্রবর্ধন ভেতরে ঢুকে ডিমে পুষ্টির যোগান দেয়। তাই একে জোনা পেলুসিডা বা জোনা রেডিয়াটা (Zona pellucida or zona radiata) বলে। এ অঞ্চল এবং প্লাজমালেমার মধ্যবর্তী অংশে একটি ফাঁপা জায়গা আছে। ভিটেলাইন ঝিল্লি না থাকলেও এ ফাঁকা পায়গাটি পেরিভিটেলাইন ফাঁকা (Pervitelline space) নামে পরিচিত।

২। **সাইটোপ্লাজম** ঃ সাইটোপ্লাজম প্লাজমালেমায় আবৃত। এর উপরিগত স্তরটি পাতলা প্রোটিনে গঠিত এবং কর্টেক্স নামে অভিহিত। এতে প্রচুর পরিমাণ গলজি বস্তু, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা ও কর্টিকাল দানা (Cortical granule) থাকে। মানুষের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ অতি নগণ্য। কুসুম সাইটোপ্লাজমে সমানভাবে ছড়ানো থাকে। তাই মানুষের ডিম্বাণুকে মাইক্রোলেথিথাল (Microlecithal) ডিম্বাণু বলে।

৩। **নিউক্লিয়াস** ঃ নিউক্লিয়াসটি বেশ বড় ও বিকেন্দ্রিক, তবে নিষেকের সময় কেন্দ্রে গমন করে। ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস সাধারণ নিউক্লিয়াস অপেক্ষা দু-তিনশ গুণ বড়। এর ভেতর প্রচুর পরিমাণ RNA ও ২৩ টি ক্রোমোজম থাকে।

বয়ঃপ্রাপ্তিতে হরমোনের ভূমিকা

সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের সক্রিয় পরিস্ফুটনকালকে বয়ঃপ্রাপ্তি বা বয়ঃসন্ধি (Puberty) বলে সময়টি হচ্ছে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণের মুহূর্ত। এ কালটি পুরুষে ১৩-১৫ বছরের মধ্যে এবং নারীদের ১২-১৫ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হয়। এ সময় বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে দৈহিক গঠন ও চরিত্রে নানান বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। বয়ঃসন্ধিকালের এসব বৈশিষ্ট্যকে সেকেন্ডোরি যৌন বৈশিষ্ট্য (Secondary sex characters) বলে । বীর্যপাত রজঃচক্র যথাক্রমে পুরুস ও নারীর বয়ঃপ্রাপ্তীর বৈশিষ্ট্যসূচক । বয়ঃপ্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণে পিট্যুইটারি গ্রন্তির সন্মুখ কম থাকে , বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষরণের মাত্রা বেড়ে যায়, ফলে জননাঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং সেকেন্ডোরি যৌন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়। এভাবে বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে ।

নারীর বয়ঃ প্রাপ্তিতে হরমোনের ভূমিকা

যে সব হরমোন নারীর বয়ঃপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে নিচে তার উল্লেখ করা হলো ঃ

১। **সম্মুক পিট্যুইটারির গোনাডোট্রপিফক হরমোন** ঃ তিন ধরনের গোনাডোট্রফিক হরমোনের মধ্যে দুটি হরমোন নারীর জনানঙ্গ ও আনুষঙ্গিক জননঙ্গগুলোর পূর্ণতা লাবে সাহায্য করে। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) ডিম্বাশয়ের গ্র্যাফিয়ান ফলিকলকে প্রভাবিত করে রজঃচক্র শুরু করতে সাহায্য করে। লুটিনাইজিং হরমোরন (LH) ডিম্বাশয়ের লুটিয়াম সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে এবং তা থেকে প্রোজেস্টেরন নামক স্ত্রী যৌন হরমোন ক্ষরণে উদ্বুদ্ধ করে।

২। **সম্মুক পিট্যুইটারি গ্রন্থির গ্রোথ হরমোন** (GH) ঃ পেশীর বৃদ্ধি ও শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ।

৩। **সম্মুক পিট্যুইটারি গ্রন্থির বেপাকীয় হরমোন এবং পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্তির ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন** ঃ দৈহিক চরিত্রের পার্থক্য গঠনে সহায়তা করে।

৪। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির ইস্ট্রোজে হরমোন ঃ যৌন গ্রন্তি এবং জননাঙ্গের বৃদ্ধি ও পরিণতিতে এবং আনুষঙ্গিক সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে কিছুটা সাহায্য করে ।

৫। ডিম্বশয়ের ইস্ট্রোজেন হরমোনঃ বয়ঃসন্ধির শুরুতে সম্মুক পিট্যুইটারি গ্রন্থি-নিঃসৃত গোনাডোট্রফিক হরমোনের প্রভাব ডিম্বাশয় সক্রিয় হয়ে ইস্টোজেন খরনের পরিমান বাড়িয়ে দিয়ে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

ইস্ট্রোজেন প্রধানত নির্দিষ্ট কলাকোষের সংখ্যা বাড়ায় এবং দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে প্রাইমারি জননাঙ্গ, আনুষঙ্গিক জননাঙ্গ, আনুষঙ্গিক জননাঙ্গ এবং সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যর বিকাশ লাভে সহায়তা করে।

পুরুষ ও নারীর বয়ঃপ্রাপ্তিতে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন

আলোচ্য বৈশিষ্ট্য	পুরুষ	নারী
১) লোম	১) মুখ, বগল, শ্রোণীদেশের লোম।	১) বগল ও শ্রোণীদেশের লোম।
২) পেশি	২) বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয়।	২) তেমন নয়।
৩) মেদ	৩) মুখ ও পেটে সঞ্চিত হয়।	৩) কোমর ও নিতম্বে সঞ্চিত হয়।
৪) স্তন	৪) প্রায় স্বাভাবিক থাকে।	৪) প্রচুর মেদ সঞ্চিত হয়ে সুডৌল ও উন্নত হয়।
৫) কণ্ঠস্বর	৫) গাঢ়, ভারী ও গম্ভীর হয়ে উঠে।	৫) মেয়েলী স্বর প্রকাশ পায়।
শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন		
১) হৃদপিন্ডের গতি ও রক্তচাপ	১) বৃদ্ধি পায়।	১) বৃদ্ধি পায়।
২) শ্বাস–প্রশ্বাস	২) গভীর হয়।	২) গভীর হয়।
৩) মৌল বিপাকীয় হার	৩) বৃদ্ধি পায়।	৩) হ্রাস পায়।
৪) লোহিত রক্তকণিকা	৪) অনেক বৃদ্ধি পায়।	৪) কিছু পরিমান বৃদ্ধি পায়।
৫) জননাঙ্গের হরমোন	৫) উৎপন্ন ও ক্ষরিত হতে থাকে।	৫) উৎপন্ন ও ক্ষরিত হতে থাকে।
৬) জননকোষ	৬) শুক্রাণুসহ বীর্য উৎপন্ন ও স্খলিত হয়।	৬) রজঃচক্র আরম্ভ হয়।
৭) আনুষঙ্গিক জনন অঙ্গ	৭) সুগঠিত ও কার্যক্ষম হয়ে উঠে।	৭) সুগঠিত ও কার্যক্ষম হয়ে উঠে।
মানসিক পরিবর্তন		
১) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ।	১) নারীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।	১) পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।
২) ভাব	২) বিচিত্র খেয়াল ও ভাব মনে জেগে উঠে।	২) নারীসুলভ মানসিকতার প্রকাশ ঘটে।

নিষেক ও প্রজনন (Fertilization & Reproduction)

রজঃচক্র (Menstrual cycle)

বয়োঃপ্রাপ্ত নারীর সমগ্র যৌনজীবনে প্রায় নিয়মিত, গড়ে ২৮ দিন (২৪ থেকে ৩২ দিন) পরপর জরায়ু থেকে রক্ত, মিউকাস, এন্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিসিক্ত ডিম্বাণুর চক্রীয় নিষ্কাশনকে রজঃচক্র বলে। গোনাডোট্রফিক হরমোন (GTH) -এর প্রভাবে ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সে এই চক্রের সূত্রপাত ঘটে এবং ৪৫ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

রজঃচক্রকালে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম (অন্তঃস্তর) - এর পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রজঃচক্রকে নিচে বর্ণিত ৪টি পর্বে ভাগ করা হয়ে থাকে :

১। **নিরাময় পর্ব** (Regenerative/Repairng /Resting phase) ঃ বিগত রজঃচক্র শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী চক্রের প্রারম্ভে জরায়ুতে যে প্রক্রিয়ায় পুনর্গঠনমুলক কাজ শেষে এন্ডোমেট্রিয়াম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তাকে নিরময় পর্ব বলে। এর স্থায়িত্বকাল রজঃস্রাব শুরুর তিন দিন পর থেকে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত। এই সময় সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে FSH (ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন) ও LH (লুটিনাইজিং হরমোন) এর ক্ষরণ সামান্য বৃদ্ধি পায়, ডিম্বাশয়ে ফলিকলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং এন্ডোমেট্রিয়াম ১ মিলিমিটার পুরু হয়।

২। **বৃদ্ধি পর্ব** (Proliferative phase) ঃ রজঃচক্রের যে পর্বে এন্ডোমেট্রিয়াম অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ডিম্বাশয় থেকে সেকেন্ডারি উওসাইট নিষেকের যে পর্বে নিষেকের উদ্দেশে বিচ্ছিন্ন হয় (ডিম্বপাত) তাকে বৃদ্ধিপর্ব বলে। এই পর্বের স্থায়িত্বকাল ৭ম থেকে ১৪তম দিন পর্যন্ত। এ সময় বর্ধনশীল ফলিকলের ফলিকল কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে এন্ডোমেট্রিয়ামে বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় (রক্তবাহিকা ও গ্রন্থিময় কলাসমৃদ্ধ হয়ে উঠে ও প্রায় ৩ থেকে ৪ মিলিমিটার পুরু হয়), FSH ও LH এর ক্ষরণ বন্ধ করে দেয় (সম্মুখ পিট্যুইটারির মাধ্যমে), এবং ডিম্বাশয়ের ফলিকল ক্রমশঃ পরিণত হয়ে উঠে।

চক্রের ১২ তম দিনে হঠাৎ LH এর ক্ষরণ বেড়ে যায় এবং ইস্ট্রোজেনের ক্ষরণ কমে যায়। ১৪ দিনের মাথায় (চক্র যদি ২৮দিনের হয়) পরিণত ফলিকল থেকে ডিম্বপাত ঘটে। ডিম্বপাতের পর ফলিকলের বাকি কোষগুলি LH এর প্রভাবে একত্রে কর্পাস ল্যুটিয়াম (Corpus luteum) নামক এক বড়, হলদে বস্তুতে পরিণত হয়ে সাময়িক ভাবে এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে এবং প্রজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ করে। এ হরমোনও এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধিতে ও ডিম্বপাতে প্রভাব বিস্তার করে। ডিম্বপাতের পরপরই প্রোজেস্টেরন ক্ষরণে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

৩। **প্রাক্-রজঃস্রাবীয় পর্ব** (Premenstrual phase) ঃ রজঃচক্রের যে পর্বে ব্লাস্টোসিস্ট ধারনের জন্য জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম পুর্ণগঠিত পর্যায়ে অপেক্ষমাণ থাকে, তাকে প্রাক্-রজঃস্রাবীয় পর্ব বলে। এই পর্বের স্থয়িত্বকাল রজঃচক্রের ১৫ থেকে ২৮তম দিন পর্যন্ত অর্থাৎ (১৩ থেকে ১৪ দিন)। এই পর্বে কর্পাস ল্যুটিয়ামের কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রোজেস্টেরন ও অল্প পরিমাণ ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ অব্যাহত থাকে। প্রোজেস্টেরণের প্রভাবে এন্ডোমেট্রিয়াম আরও রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ হয়, এর কোষগুলোতে পুষ্টি পদার্থ (গ্লাইকোজেন ও লিপিড) বেড়ে যায়। পরিশেষে এন্ডোমেট্রিয়াম ৫ থেকে ৬ মিলিমিটার পুরু হয়ে ব্লাস্টোসিস্টের ধারণ ও পোষণে সক্ষম হয়।

৪। **রজঃস্রাবীয় পর্ব** (Mennstrual/Destructive/Bleeding phase) ঃ ডিম্বপাতের পর ডিম্বাণু ৩৬ ঘন্টার মধ্যে নিষিক্ত না হলে কর্পাস ল্যুটিয়াম থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের প্রভাবে সম্মুখ পিট্যুইটারি গ্রান্থি FSH ও LH ক্ষরণ বন্ধ করে দেয়। LH (ল্যুটিনাইজিং হরমোন) এর অভাবে কর্পাস ল্যুটিয়ামের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে বিদ্ধস্ত হয়। চক্রের এই পর্বে ৪টি হরমোনের (ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ও ল্যুটিনাইজি হরমোন) ক্ষরণ মাত্রাই নিম্নতম পর্যায়ে থাকে।

ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণমাত্রা কমে যাওয়ায় এন্ডোমেট্রিয়ামের আর বৃদ্ধ ঘটে না। বরং তা ভাঙতে শুরু করে। রক্তের অভাবে তখন এন্ডোমেট্রিয়ামের ধমনীকুণ্ডলী প্রসারিত হয়, ফলে ধমনিকা ও কৈশিকজালিকা ভিন্ন ভিন্ন হলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। পরে অবশ্য কিছু রক্তবাহিকার সংকোচনে স্থানীয় রক্তপাত বন্ধ হয়, কিন্তু অন্যান্য রক্তবাহিকার অক্ষমতার জন্য রক্তক্ষরণ ৪ থেকে ৫ দিন স্থায়ী হয়। এই সময় রক্তের সাথে এন্ডোমেট্রিয়াম, রক্তবাহিকার ভগ্নাংশ ও অনিষিক্ত ডিম্বাণু যোনীপথে নিষ্কাশিত হয়। এই সব পদার্থকে রজঃস্রাব বলে। প্রত্যেক রজঃস্রাবের পরিমাণ ৩০ থেকে ৪০ মিলিলিটার।

ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্ট্রেরনের ক্ষরণমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেলে সম্মুখ পিট্যুইটারি গ্রন্থির উপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায়, তখন আবারও FSH ও LH ক্ষরণ শুরু হয়। সেই সাথে শুরু হয় নতুন রজঃচক্র সৃষ্টির তৎপরতা।

নিষেক (Fertilization)

শুক্রাণু নিউক্লিয়াস ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের একীভবনের মাধমে ডিপ্লয়েড সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে নিষেক বলে। নিষেক একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন প্রানীগোষ্ঠী এমনকি প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের এ প্রক্রিয়ার বৈচিত্র উল্লেখযোগ্য। মানবদেহের যে নিষেক ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে সেকেন্ডারি উওসাইট ও পরিণত শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের একীভবন। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণীকৃত ধাপগুলো নিম্নরুপ :

১। স্খলিত শুক্রাণুগুলোর এক্রোসোম থেকে হায়েলুরোনিডেজ নামক এনজাইম ক্ষরিত হয়। ডিম্বাণুর চতুর্দিকে অবস্থিত ফলিকল কোষগুলো যে সব পদার্থের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে সে সব পদার্থকে এ এনজাইম পরিপাকের মাধ্যমে শুক্রাণুর গমন পথের সৃষ্টি করে।

২। উপরোক্ত পথ ধরে শুক্রাণু লেজের সাহায্যে চালিত হয়ে ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডার বহির্দেশে এসে পৌছে (সেকেন্ডারী উওসাইটের চতুর্দিক ঘিরে অবস্থিত পুরু স্তরকে জোনা পেলুসিডা বলে)। এই স্তরে অবস্থিত বিশেষ সংগ্রাহক প্রোটিনে শুক্রাণুর মস্তকঝিল্লির সংগ্রাহকগুলো বন্ধনের সৃষ্টি করে।

৩। বন্ধনের ফলে উদ্দীপ্ত হয়ে শুক্রাণুমস্তক আরেক ধরনের এনজাইম ক্ষরণ করে। এই এনজাইম জোনা পেলুসিডার অংশকে হজম করে একটি পথের সৃষ্টি করে। এই পথ ধরে শুক্রাণু ডিম্বনু-ঝিল্লির বহির্তলে এসে পৌছায়। এর মস্তকটি ডিম্বাণুর ভিলাইসমৃদ্ধ প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে একীভুত হয়। এবং ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে।

৪। শুক্রাণু-মস্তক ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশের সাথে সাথে ডিম্বাণুর বহির্দেশে অবস্থিত কর্টিকাল দানা (Cortical granules) নামে পরিচিত লাইসোসোমগুলো এনজাইম ক্ষরণ করে। এনজাইমের প্রভাবে জোনা পেলুসিডা পুরু ও শক্ত হয়ে নিষেক ঝিল্লি (Fertilisation membrane) সৃষ্টি করে। ফলে আর কোনো শুক্রাণু নিষেকে অংশ নিতে পারে না। তা ছাড়া, এনজাইমের প্রভাবে জোনা পেলুসিডা শুক্রাণুগ্রাহক প্রোটিনগুলিও নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কোনো শুক্রাণুই আর জোনা পেলুসিডায় যুক্ত হতে পারেনা।

৫। শুক্রাণু প্রবেশের ফলে সেকেন্ডারি উওসাইটটি উদ্দীপ্ত হয়ে দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজন ঘটিয়ে পরিণত ডিম্বাণু ও দ্বিতীয় পোলার বডি সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পোলার বডি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং শুক্রাণুর লেজ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে মিশে যায়। এ সময় শুক্রাণু নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিনগুলি নিস্তেজ হয়ে পরে, ফলে নিউক্লিয়াসটি প্রসারিত হয়। এই পর্যায়ে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসকে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াই (Male and female pronuclei) বলে।

৬। পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হলে ডিম্বাণুটি ডিপ্লয়েড জাইগোটে পরিণত হয়।

ইমপ্লানটেশন (Implantation)

নিষেকের পর ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থাপিত হয়, তাকে ইমপ্ল্যানটেশন বলে।

নারীর ডিম্বাণু ডিম্বনালীর (Fallopian tube) উর্ধ্বপ্রান্তে নিষিক্ত হয়ে জাইগোটে পরিনত হয়। এটি দ্রুত বিভক্ত হয়ে মরুলা নামক একটি নিরেট কোষপুঞ্জের সৃষ্টি করে এবং ডিম্বনালীর সিলীয় আন্দোলন ও ক্রমসংকোচনের ফলে নিম্নগামী হয়। জাইগোটের পর্যায়ক্রমিক মাইটোটিক বিভাজনকে ক্লিভেজ (Cleavage) বলে। নিরেট কোষপুঞ্জটি ডিম্বনালী থেকে সংগৃহীত তরলে পূর্ণ অন্তঃস্থ গহ্বর (ব্লাস্টোসিল) সমন্বিত ও এককোষস্তরীয় ব্লাস্টোসিস্ট

(Blastocyst) এ পরিণত হয়। ব্লাস্টোসিস্টে প্রায় ১০০টির মতো কোষ থাকে। ব্লাস্টোসিস্টের কোষকে ব্লাস্টোমিয়ার (Blastomere) বলে। ব্লাস্টোমিয়ারের স্তরকে ট্রোফোব্লাস্ট (Trophoblast) বলে। এর এক প্রান্তে কোষ জমা হয়ে অন্তঃস্থ কোষপিণ্ড (Inner cell mass) সৃষ্টি করে। ক্লিভেজের ফলে অসংখ্য কোষে বিভক্ত হলেও জোনা

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

পেলুসিডায় আবৃত থাকে বলে ব্লাস্টোসিস্টের আকার জাইগোটের চেয়ে বড় হয় না, বরং সৃষ্ট কোষগুলো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। অর্থাৎ জাইগোট ও মরুলার আকার একই থাকে।

৪ থেকে ৫ দিনের ভেতর ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুতে এসে পৌছালে দুই দিনের মধ্যে জোনা পেলুসিডা অদৃশ্য হয়ে যায়, ফলে ট্রফোব্লাস্টের কোষ ও জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

ট্রফোব্লাস্ট জরায়ু-প্রাচীরে অনুপ্রবেশে সচেষ্ট হয় এবং এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। পুষ্টির যোগান পেয়ে ট্রফোব্লাস্ট কোষ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এন্ডোমেট্রিয়ামের যেখানে ব্লাস্টোসিস্ট প্রোথিত হবে সেখানকার আবরণী কলা ট্রফোব্লাস্ট নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে বিগলিত হলে ব্লাস্টোসিস্ট সেখানে নিমজ্জিত হয়। এর নিচে থাকে যোজক কলাস্তর। বিগলিত এন্ডোমেট্রিয়ামের অংশ নতুন করে সৃষ্টি হয় এবং ব্লাস্টোসিস্টকে ঢেকে দেয়। এভাবে নিষেকের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম দিনের মধ্যে ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত হয়। জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্টের প্রোথিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ইমপ্ল্যানটেশন বলে। ইমপ্ল্যানটেশনের পর ট্রফোব্লাস্ট কোষগুলো দুটি স্তরে বিভাজন হয়। বাইরের স্তরটি কোরিওন যা থেকে কোরিওনিক ভিলাই নামক আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধন বেরিয়ে এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রবেশ করে। প্রাথমিক অবস্থায় কোরিওনিক ভিলাইয়ের সাহায্যে ব্লাস্টোসিস্ট কোষ এবং জরায়ুতে মাতৃরক্তের মধ্যে পুষ্টি, অক্সিজেন ও রেচন পদার্থের বিনিময় ঘটে। পরিস্ফুটনের পরবর্তী ধাপগুলিতে প্লাসেন্টা এ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অমরা (Placenta)

ভ্রূণীয় ও মাতৃকলায় গঠিত যে চাকতির মতো গঠন ফিটাস ও মাতৃদেহে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে আমরা বলে। নিষেকের ১২ সপ্তাহ পরে প্লাসেন্টা গঠিত হয়। ৬ সপ্তাহ পর ভ্রূণ যখন প্রায় মানুষের অবয়ব লাভ করে তখন তাকে ফিটাস (Fetus) বলে। প্লাসেন্টায় ফিটাসের অংশ কোরিওনিক কোষ। কোষগুলো কেরিওনিক ভিলাই সৃষ্টি করে। আম্বিলিকাল ধমনী ও শিরা নামক দুটি রক্ত বাহিক এসব ভিলাইয়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে কৈশিক জালিকা নির্মাণ করে। প্রধান রক্ত বাহিকা দুটি আম্বিলিকাল কর্ড (Umbilical cord) নামক ৪০ সেন্টিমিটার লম্বা একটি শক্ত গড়নের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে। এমোনিয়ন ও কোরিওন উদ্ভূত কোষে কর্ডটি বেষ্টিত থাকে। প্লাসেন্টায় মাতৃদেহের অংশ হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রবর্ধনসমূহ। এসব প্রবর্ধন এবং কেরিওনিক ভিলাইয়ের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে আর্টারিওল থেকে আগত ধমনী রক্তে পূর্ণ স্থান। দিয়ে জরায়ু-প্রাচীরে রক্ত অট্রারিওল

থেকে ভেনিউলে প্রবাহিত হয়। প্লাসেন্টা চাকতি আকৃতির, বেশ বড় গঠন। পুনঃ গঠিত প্লাসেন্টার ওজন প্রায় ৬০০ গ্রাম, ব্যাস ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার এবং মাঝখানে ৩ সেন্টিমিটার পুরু।

অমরার কাজ ঃ

- **সংস্থাপন ঃ** অমরার সাহায্যে ভ্রুণ জরায়ু প্রাচীরে সংস্থাপিত হয় ও সুরক্ষিত থাকে।
- **পুষ্টি ঃ** অমরা মায়ের রক্তস্রোত থেকে ভ্রুণের মধ্যে পুষ্টিদ্রব্য (মনোস্যাকারাইড, ডাইসোকারাইড, প্রোটিন ও ছোট ছোট লিপিড অণু) সরবরাহ করে।
- **গ্যাসীয় বিনিময় ঃ** অমরা মাতৃদেহ ও ভ্রুণের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বসনে সাহায্য করে।
- **রেচন ঃ** ভ্রুণের বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ অমরার মধ্য দিয়ে ব্যপিত হয়ে মায়ের দেহে প্রবেশ করে।
- **রোগ প্রতিরোধ ঃ** মাতৃদেহের রক্তে উৎপন্ন এন্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রুনদেহে প্রবেশ করে কয়েকটি রোগের বিরুদ্ধে ভ্রুণকে প্রতিরোধ্য করে তোলে। যেমন ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত স্কারলেট জ্বর প্রভৃতি।
- **জীবাণু বহন ঃ** কয়েক ধরনের ভাইরাসকে অমরা কাতৃদেহ থেকে ভ্রুনে প্রবেশ করতে দিয়ে ভ্রুনের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। গর্ভকালীন সময়ে মা যদি সিফিলিস, হাম, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত, রুবেলা এসব রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে ঐ ভাইরাস ভ্রুণদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি বা অঙ্গহানি ঘটাতে পারে।
- **ওষুধ সেবন ঃ** চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ওষুধ মাতৃদেহ থেকে অমরার মাধমে ব্যাপিত হয়ে ভ্রুণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রয়ার সৃষ্টি করে।
- **সঞ্চয় ঃ** অমরায় স্নেহ, গ্লাইকোজেন ও লোহা সঞ্চিত থাকে।
- **হরমোন নিঃসরণ ঃ** অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে অমরা চার ধরনের হরমোন ক্ষরণ করে। ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন ও কোরিওনিক গোনাডোট্রাফিন জরায়ু-প্রাচীর ও স্তনগ্রন্থির গড়নে ও কাজে এবং প্রসব ঝামেলায়মুক্তকরণে সাহায্য করে।

ভ্রুণ আবরণী ঃ

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রুণের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরপদ পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা রয়েছে। মানবভ্রুণের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্টা সবচেয়ে বেশি যত্নবান হয়ে ভ্রুণের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পুষ্টি সরবরাহ, গ্যাসীয় বিনিময়, রেচন পদার্থ ত্যাগ ইত্যাদি কোনো প্রক্রিয়াই যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তার জন্য ভ্রূণের চারদিকে কতকগুলি ঝিল্লি। এই সব ঝিল্লির উৎপত্তি সর্বপ্রথম সরিসৃপে ঘটলেও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে।

পরিস্ফুটন কালে মানবভ্রুণ ৪টি ঝিল্লিতে বেষ্টিত থাকে। এই গুলোকে বহিঃভ্রুণীয় আবরণী (Extraembryonic membrane) নামে অভিহিত করা হয়। কারণ আবরণীগুলো ভ্রুণের আনুষঙ্গিক গঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভ্রুণদেহের চতুর্দিক ঘিরে রেখে পরিস্ফুটন নিবিঘ্ন করে, কিন্তু ভূমিষ্ট হওয়ার সময় বর্জিত হয়। অর্থাৎ ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় আবরণীরূপে যেসব আনুষঙ্গিক গঠন সৃষ্টি হয় ভ্রূণদেহকে ঘিরে রেখে পরিস্ফুটণ নির্বিঘ্ন করে, কিন্তু ভূমিষ্ট হওয়ার সময় বর্জিত হয়, সে সব আবরণীকে বহিঃভ্রুণীয় আবরনী বলে। প্রাণিজগতের সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীতে যে ভ্রুণ সংশ্লিষ্ট আবরণী রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা বহিঃভ্রুণীয় আবরণী। মানবভ্রুণে চারটি বহিঃভ্রুণীয় আবরণী রয়েছে, যথা :- ১) এমনিওন, ২) এলনটয়েস, ৩) কোরিওন ও ৪) কুসুম থলি।

১। **এমনিওন** (Amnion) ঃ ভ্রূণের এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মের অংশগ্রহনে গঠিত যে থলি আকৃতির আবরণ জলীয় পদার্থে পূর্ণ থেকে ভ্রূণকে ঘিরে রাখে, তাকে এমনিয়ন বলে। এতে কোনো রক্তবাহিকা থাকে না।

এমনিওনের কাজ :

- ভ্রূণকে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে।
- ঝাঁকুনিজনিত আঘাত থেকে ভ্রূণকে রক্ষা করে।
- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে।
- তরলে পূর্ণ হওয়ায় বাইরের চাপ ভ্রূণদেহে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

২। **এলানটয়েস** (Allantois) ঃ ভ্রূণীয় অন্ত্রের পশ্চাৎ অংশ মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্মে গঠিত থলির মতো যে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়ে কোরিওনের নিচে বিন্যস্ত হয়, তাকে এলানটয়েস বলে। এতে রক্তবাহিকা ও জালিকা থাকে। এলানটয়েস বাইরের দিকে বর্ধিত ও কোরিওনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তবাহিকা-সমৃদ্ধ এলানটো-কোরিওন (Allanto-chorion) সৃষ্টি করে।

এলানটয়েসের কাজ

- ভ্রূণের শ্বসনে সাহায্য করে।
- ভ্রূণের রেচনে সাহায্য করে।
- এলানটো-কোরিওন প্লাসেন্টা গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩। **কোরিওন** (Chorion) ঃ ভ্রূণের সর্ববহিঃস্থ আবরণ যা এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত হয়, তাকে কোরিওন বলে।

কোরিওন কাজ ঃ

- এলন্টয়েসের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্বসনে ও পুষ্টি সরবরাহে সাহায্য করে।
- প্লাসেন্টা গঠনে অংশগ্রহণ করে।

৪। **কুসুম থলি** (Yolk sac) ঃ ভ্রূণের মধ্যান্ত্রের সংজ্ঞে যুক্ত এবং এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত অপেক্ষাকৃত ছোট থলি আকৃতির তরলে পূর্ন ঝিল্লিকে কুসুম থলি বলে। মানবভ্রূণের পুষ্টি কুসুম নির্ভর না হলেও সরিসৃপ, পাখি প্রভৃতির প্রচুর কুসুমযুক্ত ডিমে ভ্রূণের পরিস্ফুটোণের সময়ে যে ধরনের কুসুম সৃষ্টি হয়, মানবভ্রূণেও তেমনটি হয়।

কুসুম থলির কাজ ঃ কুসুম থলি স্টেম কোষ (Stem cell) এর উৎস হিসেবে কাজ করে। এসব কোষ থেকে রক্তকণিকা ও লিম্ফয়েড কোষ উৎপন্ন হয়। স্টেম কোষগুলি পরবর্তীতে বর্ধনশীল ভ্রূণে প্রবেশ করে। তাই কুসুম থলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝিল্লি।

শিশু প্রসব (Birth of a baby) ঃ

জাইগোট সৃষ্টির পর থেকে প্রায় ২৮০ দিনের মাথায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সাধারণত শিশুর ভূমিষ্ঠ কাল ২৮০ +/- ৭দিন। জাইগোট সৃষ্টির ৭ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রূণকে মানব শিশুরূপে শনাক্ত করা যায়। ভ্রূণের এ অবস্থাকে ফিটাস (Fetus) বলে। জরায়ুতে ফিটাস প্রায় ৩৮ সপ্তাহ অবস্থান করে। এ সময়কালকে গর্ভধারণ কাল বলে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম বিশুদ্ধ বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিয়ে ফুসফুসের কাজ শুরু করা মাত্রই ফিটাসের নতুন নাম হয় শিশু। সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণের জন্য সর্বশেষ রজঃচক্রের প্রথম দিনের সাথে ৪০ সপ্তাহ যোগ করে 'প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ' (Expected date of delivery -EDD) নির্ধারণ করা হয়। তবে এর সাথে ৭ দিন যোগ বা বিয়োগ করা যেতে পারে।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রজণনতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

২। পুরুষ প্রজননতন্ত্র কি কি অঙ্গ নিয়ে গঠিত?

৩। স্ত্রী প্রজননতন্ত্র কি কি অঙ্গ নিয়ে গঠিত?

৪। শুক্রাশয়ের কাজ কি কি?

৫। ডিম্বাশয়ের কাজ কি কি?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পুরুষ প্রজণন অঙ্গগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। স্ত্রী প্রজনন অঙ্গগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৩। পুরুষের বয়ঃপ্রাপ্তিতে হরমোনের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৪। নারীর বয়ঃপ্রাপ্তিতে হরমোনের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৫। নিষেক বলতে কি বোঝ? সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

একাদশ অধ্যায়
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland)

যেসব গ্রন্থি নালীবিহিন (Ductless), তাদের ক্ষরণ সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়, সে সব গ্রন্থিকে অন্তঃক্ষরা (Endocrine gland) গ্রন্থি বলে। যেমন :- পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, এড্রেনাল প্রভৃতি গ্রন্থি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থকে **হরমোন** বলে। হরমোন নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কম বা বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হলে দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত ঘটে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বৈশিষ্ট্য

১। ক্ষরণ পরিবহনের জন্য কোনো নালীর প্রয়োজন হয় না।
২। এদের নিঃসৃত পদার্থের নাম হরমোন যা সরাসরি রক্তের বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৩। এসব গ্রন্থি নিঃসৃত রস দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়।
৪। গ্রন্থিগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত সরাবরাহ পায়।
৫। হরমোন যেন সহজে রক্তে মিশতে পারে সেজন্য রক্তবাহিকার প্রাচীর পুরু কোলাজেন তন্তুর পরিবর্তে সূক্ষ্মজালক তন্তুতে নির্মিত।
৬। কোনো কোনো গ্রন্থি মিশ্র প্রকৃতির তাদের বহিঃক্ষরণ বৈশিষ্ট্য ও থাকে, যেমন- অগ্ন্যাশয়, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়।
৭। কোনো কোনো গ্রন্থির ক্ষরণকাল সাময়িক, যেমন- থাইমাস গ্রন্থি।

বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির পার্থক্য

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি
বহিঃক্ষরা গ্রন্থির নির্দিষ্ট নালী আছে।	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোনো নালী নেই।
নিঃসৃত পদার্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন – এনজাইম, দুধ, ঘাম ইত্যাদি।	নিঃসৃত পদার্থের সাধারণ নাম হরমোন।
নিঃসৃত পদার্থ নির্দিষ্ট নালী পথে পরিবাহিত হয়।	নিঃসৃত পদার্থ সরাসরি রক্ত বা লসিকায় পরিবাহিত হয়।
নিঃসৃত পদার্থ ক্ষরণ স্থানে বা সেখান থেকে অদূরে কাজ করে।	নিঃসৃত পদার্থ দূরবর্তী নির্দিষ্ট অঙ্গে বা কোষে কাজ করে।
বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস ও এনজাইমের ক্ষরণ, ক্ষরণহার ইত্যাদি কাজ সাধারণত হরমোন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব কাজ ক্ষণস্থায়ী এবং প্রত্যক্ষ।	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ স্বল্প, কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রায় নিঃসৃত হয়ে দেহে বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
লালাগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি, তৈল গ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি।	পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, প্যারা থাইরয়েড গ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স ইত্যাদি।

হরমোনের বৈশিষ্ট্য

১) নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
২) উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গে কাজ করে।

৩) কার্যপদ্ধতি মন্থর কিন্তু ফল সুদূরপ্রসারী।

৪) কাজ শেষে বিনষ্ট হয় এবং দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়।

৫) এদের রাসায়নিক প্রকৃতি স্টেরয়েড, প্রোটিন বা ফেনলধর্মী এবং রাসায়নিক সমন্বয়ক (Chemical co-ordinator) হিসাবে কাজ করে।

৬) নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কম বা বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হলে দেহের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং বিভিন্ন অস্বাভাবিকত্ব প্রকাশ পায়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর অবস্থান, নিঃসৃত হরমোন ও কাজ ছকের মাধ্যমে বর্ণনা করা হলো

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	*নিঃসৃত হরমোন*	*প্রধান কাজ*
হাইপোথেলামাস গ্রন্থি (মস্তিষ্কে অবস্থিত)	১। থাইরোট্রফিন হরমোন (TRH) ২। কর্টিকোট্রফিন (CRH) ৩। গোনাডোট্রফিন হরমোন (GTH)	১। থাইরয়েড উদ্দিপক হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে। ২। এড্রেনোকর্টিকোট্রফিন হরমোন নিঃসরণ করায়। ৩। লুটিনাইজিং হরমোন ও ফলিকল উদ্দিপক হরমোন নিঃস্বরণ করায়।
পিট্যুইটারি গ্রন্থি (মস্তিষ্কে অবস্থিত) ক) অগ্র পিট্যুইটারি	১। গ্রোথ হরমোন (GH), ২। থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH) ৩। এড্রেনোকর্টিকোট্রফিন হরমোন (ACTH) ৪। লুটিনাইজিং হরমোন (LH), ৫। প্রোল্যাকটিন	১। বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা। ২। থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন নিয়ন্ত্রণ করা। ৩। এড্রেনাল গ্রন্থির হরমোন নিঃস্বরণ করা। ৪। জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্য নিয়ন্ত্রণ করা। ৫। মাতৃ দেহের দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
খ) পশ্চাৎ পিট্যুইটারি	১। এন্টিডাইরোটিক হরমোন ২। অক্সিটোসিন	১। রেনাল টিউব্যুলে পানি শোষণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও রক্ত বাহিকার প্রাচীর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা। ২। জরায়ুর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা।
থাইরয়েড গ্রন্থি (কণ্ঠদেশে অবস্থিত)	থাইরোক্সিন	বিপাক ও বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রণ এবং যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করা।
প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (কণ্ঠদেশে অবস্থিত)	প্যারাথহরমোন	ক্যালসিয়াম ও ফসরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করা।
থাইমাস গ্রন্থি (শ্বাসনালীর মুলদেশে অবস্থিত)	থাইমোসিন	লিম্ফোসাইট প্রস্তুতি ও এন্টিবডি গঠন করা।
আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত)	১। ইনসুলিন ২। গুকাগন	১। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে তাকে কমিয়ে দেয়া; গাইকোজেন সংশেষ বা গাইকোজেনেসিসে সহায়তা করা। ২। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে তা বাড়ানো, গাকোজেনোলাইসিসে সহায়তা করা।
এড্রেনাল গ্রন্থি বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি ক) কর্টেক্স	১। গুকোকর্টিকয়েড ২। মিনারেলো কর্টিকয়েড ৩। যৌন কর্টিকয়েড	১। শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করা। ২। খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করা। ৩। যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি এবং যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করা।
খ) মেডুলা (প্রতিটি বৃক্কের উর্ধ্ব প্রান্তে অবস্থিত)	১। এড্রেনালিন ২। নরএড্রেনালিন	১। জরুরি অবস্থায় দেহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সহায়তা করে এবং এর প্রভাবে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, পিউপিল বিস্ফারিত হয় ও গায়ের লোম খাড়া হয়। ২) এর কাজ এড্রেনালিনের বিপরীত।
শুক্রাশয় (পূর্ণাঙ্গ পুরুষদেহে দেহ গহবরের বাইরে স্ক্রোটাম নামক থলির মধ্যে)	টেস্টোস্টেরন	পুরুষদেহের যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটানো, সেকেন্ডারী যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করা এবং শুক্রাণু উৎপাদন অব্যাহত রাখা।
ডিম্বাশয় (স্ত্রী দেহের শ্রোণীগহবরের পৃষ্ঠপ্রাচীরের গায়ে জরায়ুর দুই পাশে)	১। ইস্ট্রোজেন ২। প্রোজেস্টেরন	১। বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রী–দেহের বিভিন্ন যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা এবং রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণ করা। ২। স্ত্রী দেহে গর্ভবস্থায় জরায়ু, ভ্রুণ ও অমরার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা।

দেহের বৃদ্ধি ও শরীরবৃত্তিক কাজে হরমোনের ভূমিকা

দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা

মানুষের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির গ্রোথ হরমোন প্রধান ভূমিকা পালন করে। এ হরমোন তরুণাস্থিকোষের সজীবতা অক্ষুন্ন রেখে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে তরুণাস্থির দৈর্ঘ্য বাড়ায়, ফলে এতে ক্যালসিয়ামের অনুপ্রবেশ ঘটে। তা ছাড়া দেহের কোষ বিভাজন ঘটিয়ে মাংসপেশি ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ অঙ্গের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই হরমোন পেশিকলার উপর সরাসরি কাজ করে বলে শৈশবে এর ক্ষরণ কম হলে বামনদশা (Dwarfism) এবং বেশি হলে দানবদশা (Gigantism) দেখা দেয়। প্রাপ্ত বয়স্কে এর ক্ষরণ অতিরিক্ত হলে মানুষ গরিলাদশায় (Acromegaly) উপনীত হয়।

দেহের বৃদ্ধিতে আরও যে সব হরমোন ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে-

১) হাইপোথ্যলামাস নিঃসৃত GRH, (Growth releasing hormone), GIH (Growth Inhibiting hormone), PRH (Prolactin releasing hormone), PIH (Prolactin inhibiting hormone); GnRH (Gounadotropin releasing hormone), GnIH (Gonadotropin inhibiting hormone); TRH (Thyrotropin releasing hormone), TIH (Thyrotropin inhibiting hormone), CRH (Corticotropin releasing hormone), CIH (Corticotropin inhibiting hormone)।

২) সম্মুখ পিট্যুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত প্রোল্যাকটিন।

৩) থাইরয়েড গ্রন্থির থাইরক্সিন, ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন, থাইরোক্যালসিটোনিন প্রভৃতি হরমোন।

৪) প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির প্যারাথহরমোন।

৫) অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর ইনসুলিন ও সোমাটোস্ট্যাটিন।

৬) শুক্রাশয়ের টেস্টোস্টেরণ, ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন প্রভৃতি।

৭) এড্রেনাল কর্টেক্স থেকে গ্লুকোকর্টিকয়েড।

শরীরবৃত্তিক কাজে হরমোনের ভূমিকা : বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ও রক্তে বাহিত হরমোন অতি অল্প পরিমাণেই বিশেষ বিশেষ শারীরবৃত্তিক কাজ বা পদ্ধতিকে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। নিচে শারীরবৃত্তিক কাজে হরমোনের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১) **খাদ্য পরিপাকে** ঃ গ্যাসট্রিন, সিক্রেটিন, কোলেসিস্টোকাইনিন, প্যাংক্রিয়েজাইমিন, ভিলিকাইনিন, এন্টারোগ্যাস্ট্রোন নামক হরমোন পৌস্টিক নালীর অন্তঃক্ষরাধর্মী কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে পরিপাকে অংশ নিয়ে বিভিন্ন এনজাইমের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভিলাইকে সবল করে শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

২) **বিপাক নিয়ন্ত্রণে** ঃ থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, গ্লুকোর্টিকয়েড হরমোন শর্করা বিপাক, থাইরক্সিন হরমোন প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ আয়রন বিপাক, টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

৩) **প্রোটিন সংশ্লেষ ও সঞ্চয়ে** ঃ স্টেরয়েড ধর্মী টেস্টোস্টেরণ, প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন, আয়োডিনধর্মী থাইরক্সিন হরমোন জীন সক্রিয়করণের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয়। বৃদ্ধি হরমোন প্রোটিন সঞ্চয়ী প্রক্রিয়ার (Protein sparing action) মাধ্যেমে ফ্যাটকে ভেঙে শক্তি উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে। হরমোন DNA এবং RNA কেও নিয়ন্ত্রিত করে প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) **আয়ন সমতা রক্ষায় :** এড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত এলডোস্টেরন Na^+ ও K^+ আয়ন সমতা রক্ষা করে;

হৃদপিণ্ড থেকে ক্ষরিত ANF (Atri natri uratic factor) রক্তে Na^+ এর পরিমাণ অক্ষুন্ন রাখে।

৫) **পানি সাম্য নিয়ন্ত্রণে** ঃ পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে (আসলে হাইপোথ্যালামাসের সুপ্রাঅপটিক ও প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস থেকে) ক্ষরিত ADH (Anti diuretic hormone) নেফ্রনের প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা থেকে পানি শোষণ করে পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

৬) **লোহিত রক্তকণিকা উৎপদনে** ঃ বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এরিথ্রোপোয়েটিন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

৭) **স্নায়বিক উত্তেজনা প্রেরণে** ঃ এসিটাইলকোলিনের মতো এড্রেনালিন ও নর-এড্রেনালিন হরমোন স্নায়বিক উত্তেজনা প্রেরণে সাহায্য করে।

৮) **আপদকালীন অবস্থা নিয়ন্ত্রণে** ঃ এড্রেনাল গ্রন্থির মেডুলা থেকে ক্ষরিত এড্রেনালীন ও নর-এড্রেনালিন হরমোন রক্তনালীর সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে ঘাম নিঃসরণ বৃদ্ধি করে দেহকে আপদকালীন অবস্থা থেকে রক্ষা করে।

৯) **জনন প্রক্রিয়ায়** ঃ পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গ থেকে ক্ষরিত যথাক্রমে টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন জননকোষ উৎপাদনে ও পরিণতি প্রাপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যৌন মিলনে উদ্বুদ্ধ করে; এবং স্ত্রীলোকের প্রোজেস্টেরন হরমোন গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

১০) **দুগ্ধক্ষরণে** ঃ ইস্ট্রোজেন, প্রোল্যাকটিন, গ্রোথ হরমোন প্রভৃতি স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১১) **সন্তান প্রসবে** ঃ পশ্চাৎ পিট্যুইটারি থেকে ক্ষরিত অক্সিটোসিন জরায়ু-পেশির সংকোচন ঘটিয়ে প্রসুতির সন্তান প্রসবে সাহায্য করে।

১২) **দেহের গাত্রবর্ণ নিয়ন্ত্রণে** ঃ এড্রেনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন (ATCH) মেলানিন রঞ্জকসংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে গায়ের রং নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলতে কী বোঝ?

২। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বৈশিষ্টগুলি কি কি?

৩। অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য কি কি?

৪। হরমোন কাকে বলে? ৫টি হরমোনের নাম লেখ।

৫। টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোনের কাজ কি কি?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। অন্তঃক্ষরা ৫টি গ্রন্থির নাম ও কাজ লেখ?

২। পিটুটারী গ্রন্থি থেকে কি কি হরমোন নিঃসৃত হয়? তাদের কাজ উল্লেখ কর।

৩। ডিম্বাশয় থেকে কি কি হরমোন নিঃসৃত হয়? তাদের কাজ উল্লেখ কর।

৪। শুক্রাশয় থেকে কি কি হরমোন নিঃসৃত হয়? তাদের কাজ উল্লেখ কর।

৫। ইনসুলিন হরমোন কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়? ইনসুলিন হরমোন মানুষের জীবন রক্ষায় কীভাবে সাহায্য করে বর্ণনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland)

যে সব গ্রন্থি তাদের নিঃসৃত রাসায়নিক রস নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলের অদূরে বহন করে, সেগুলোকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। এদের নিঃসৃত পদার্থ রস বা জুস (Juice) নামে পরিচিত। যেমন- লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থির বৈশিষ্ট্য

- ক্ষরণ পরিবহনের জন্য এসব গ্রন্থির নিজস্ব নালী থাকে।
- এ গ্রন্থির রস যেখানে নিঃসৃত হয় সেখানেই কিংবা ধারে কাছেই কাজ করে।
- এরা দেহের নির্দিষ্ট স্থানে সক্রিয় থাকে, সমগ্র দেহে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।

নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বহিঃক্ষরা গ্রন্থির বিবরণ দেয়া হলো :

১। **তৈল গ্রন্থি বা সিবেসিয়াস গ্রন্থি** (Sebaceous gland) ঃ এই গ্রন্থি থলিকাকার, লোমের ফলিকলের সাথে সংলগ্ন থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত তৈল জাতীয় পদার্থকে সিবাম (Sebum) বলে। সিবামে ফ্যাটি অ্যাসিড, মোম ও স্টেরয়েড থাকে।

তৈল গ্রন্থির কাজ ঃ

- সিবাম দেহত্বক এবং লোমকে নমনীয় ও তৈলাক্ত রাখে।
- সেবাম ত্বক ও লোমের পাতলা আবরণ সৃষ্টি করায় ত্বক ও লোম পানি অভেদ্য হয়ে পড়ে।

২। **ঘর্ম গ্রন্থি বা সয়েট গ্রন্থি** (Sweat gland) : এই গ্রন্থি লম্বা প্যাঁচানো নলের মতো। এর নিম্নাংশ ত্বকের ডার্মিস স্তরে অবস্থিত। উর্ধ্বাংশ ত্বকের এপিডার্মিসে উন্মুক্ত। এদের নিঃসরণ ঘাম (Sweat) নামে পরিচিত। দেহের সর্বত্র ঘর্মগ্রন্থি ছড়িয়ে আছে। ঘামে পানি, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ইউরিয়া, এমোনিয়াম, গ্লুকোজ ইত্যাদি থাকে।

ঘর্ম গ্রন্থির কাজ ঃ

- ঘর্মগ্রন্থি দেহের পানি, লবন ও ইউরিয়া জাতীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে।
- দেহের অতিরিক্ত তাপ বের করে দিয়ে এই সব গ্রন্থি দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। **সেরুমিনাস গ্রন্থি** (Ceruminous gland) ঃ

এইগুলো রুপান্তরিত ঘর্মগ্রন্থি যা মানুষের বহিঃকর্ণের নালীগাত্রে অবস্থান করে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসকে সেরুমেন (Cerumen) বলে। সেরুমেন মোমের মতো আঠালো পদার্থ যা কানে প্রবিষ্ট ধুলা-বালির সাথে মিশে কানের খইল (Ear wax) এ পরিণত হয়।

সেরুমিনাস গ্রন্থির কাজ ঃ ধুলাবালি ও ছোট ছোট পোকা মাকড় থেকে বহিঃকণকে রক্ষা করে।

৪। **স্তনগ্রন্থি** (Mammery gland) ঃ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের বক্ষদেশে একজোড়া স্তনগ্রন্থি রয়েছে কেবল স্ত্রীলোকের বয়ঃসন্ধি কালে এই গ্রন্থি বৃদ্ধি পায় ও কার্যকর হয়। সন্তান প্রসবের পর স্তনগ্রন্থি থেকে দুধ নিঃসৃত হয়, যা নবজাত শিশুর পুষ্টি জোগায়। প্রতিটি স্তনের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যাক লোবিউল থাকে। প্রতিটি লোবিউলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুগ্ধ গ্রন্থি (Milk gland) থাকে। একেকটি দুগ্ধ গ্রন্থিতে অসংখ্য এলভিওলাই থাকে। প্রতিটি এলভিওলাস থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে ও পড়ে মিলিত হয়ে বড় নালী গঠন করে। এই নালীতে সাইনাস নামক স্ফীত অংশ থাকে। এলভিওলাসের এপিথিলিয়াল কোষ থেকে দুধ ক্ষরিত

হয়ে পেশি সংকোচনের মাধ্যমে সাইনাসে এসে জমা হয়। অবশেষে প্রতিটি সাইনাস স্বতন্ত্র নালী পথে স্তনের বোঁটায় উন্মুক্ত হয়। বোঁটাটি এরিওলা নামক বৃত্তাকার কালো অংশের মাঝখানে অবস্থিত। স্তনগ্রন্থি এক ধরনের পরিবর্তিত সিবেসিয়াস গ্রন্থি।

স্তনগ্রন্থির কাজ

- মায়ের স্তন নিঃসৃত দুধে শিশুর পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপাদান পরিমিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।
- প্রথম নিঃসৃত দুধ বা শাল দুধ নবজাত শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫। **অশ্রুগ্রন্থি** (Lachrymal gland) ঃ অক্ষিকোটরের পৃষ্ঠ-পার্শ্বীয় কোণে উপরের নেত্রপল্লবের নিচে অশ্রুগ্রন্থি অবস্থান করে। এই গ্রন্থি থেকে সামান্য লবণাক্ত পানির মতো অশ্রু (Tear) নিঃসৃত হয়।

অশ্রুগ্রন্থির কাজ ঃ

- অশ্রু অক্ষিগোলককে সিক্ত রাখে।
- কর্ণিয়াকে পরিষ্কার রাখে।
- বাইরের ধুলা-বালি থেকে চোখকে রক্ষা করে।
- ব্যাক্টেরিয়া জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করে।

৬। **লালাগ্রন্থি** (Salivary gland) ঃ মানুষের মুখগহ্বরে তিনজোড়া থলি আকৃতির লালাগ্রন্থি থাকে। এইগুলি নিম্নোক্ত তিন ধরনের ঃ

ক) কানের নিচে প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid gland),

খ) চোয়ালের নিচে সাবম্যান্ডিবুলার বা সাবম্যাক্সিলারী গ্রন্থি (Submandibular of submaxillary gland) এবং

গ) জিহ্বার নিচে সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual gland)।

লালাগ্রন্থির কাজ ঃ

- লালাগ্রন্থি থেকে এনজাইম ও মিউকাস নিঃসৃত হয়, যা খাদ্য পরিপাকে ও গলধঃকরণে সাহায্য করে।

৭। **যকৃত** (Liver) ঃ এই গ্রন্থিটি দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। উদরীয় গহ্বরের উপরে ডায়াফ্রামের নিচে যকৃত অবস্থিত এবং দুইটি প্রধান খন্ডে বিভক্ত। ডান খন্ড বাম খন্ড অপেক্ষা বড়। একটি অনুপ্রস্থ খাঁজের মাধ্যমে খন্ড দুইটি অঙ্কীয়দেশ বরাবর সর্বমোট চারটি লোবে বিভক্ত।

যকৃতের কাজ ঃ

- এই গ্রন্থি হতে পিত্তরস ক্ষরিত হয়, যা পাকমন্ডের অম্লত্ব হ্রাস করে এবং দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বিতে পরিণত করে সঞ্চিত রাখে।

৮। **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas) ঃ উদরীয় গহ্বরে পাকস্থলীর নিচে ডিওডেনামের দুইবাহুর মধ্যে প্রায় আড়াআড়ি ভাবে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। এই গ্রন্থি পাতার মত অনিয়ত আকার বিশিষ্ট গোলাপি রংএর গ্রন্থি। ডিওডেনাম মুখি এর প্রশস্ত অংশকে মাথা (Head), সংকীর্ণ বিপরীত প্রান্তকে লেজ (Tail) এবং মাথা ও লেজের মধ্যভাগকে দেহ (Body) বলে। অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে, যা থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়।

অগ্ন্যাশয়ের কাজ ঃ

- অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত রসে টিপসিন, এমাইলেজ ও লাইপেজ নামক পরিপাককারী এনজাইম থাকে যা যথাক্রমে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।
- এই গ্রন্থি হতে নিঃসৃত ইনসুলিন রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রন করে।

এনজাইম (Enzyme)

প্রোটিনধর্মী যে দ্রবণীয় জৈব প্রভাবক সজীব কোষে উৎপন্ন হয়ে ঐ কোষের নিয়ন্ত্রণে না থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে, তাকে এনজাইম (Enzyme) বলে। সাধারণত বহিঃক্ষরা গ্রন্থিতে এনজাইম উৎপন্ন হয়। প্রত্যেকটি এনজাইমে এপো-এনজাইম নামে প্রোটিনযুক্ত অংশ এবং কো-এনজাইম নামে প্রোটিনবিহীন অংশ থাকে। এপো-এনজাইম ও কো-এনজাইম একত্র হলে এনজাইম বলে। যে এনজাইম কোষের ভেতর থেকে কাজ করে তাকে অন্তঃকোষীয় এনজাইম এবং যে এনজাইম কোষের মধ্যে উৎপন্ন হলেও বাইরে নির্গত হয়ে কাজে অংশ নেয়, তাকে বহিঃকোষীয় এনজাইম বলে।

এনজাইমের বৈশিষ্ট্য

- প্রোটিনধর্মী রাসায়নিক পদার্থ।
- নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের (Substrate) উপর সুনির্দিষ্ট বিক্রিয়া ঘটায়।
- জৈব অনুঘটকের (Catalyst) ভূমিকা পালন করে, নিজে অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায়।
- পানিতে দ্রবনীয় (কেবল লিপোপ্রোটিনযুক্ত এনজাইম ছাড়া)।
- ২০° সেলসিয়াস থেকে ৪০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অত্যধিক সক্রিয়, তবে অল্প তাপমাত্রায় বা উচ্চ তাপমাত্রায় (৫০° সেলসিয়াস এর বেশি) নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।
- অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হতে পারে না।
- নালীবিশিষ্ট গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় এবং নালীপথে পরিবাহিত হয়।
- উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি ক্রিয়াশীল হয়।
- কার্যপদ্ধতি দ্রুত এবং ফল তাৎক্ষণিক।

এনজাইম ও হরমোনের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম (Enzyme)	হরমোন (Hormone)
১) নালীযুক্ত বহিঃ রা গ্রন্থি থেকে নিঃস্রত হয়।	১) নালীবিহীন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়।
২) নিজস্ব নালীর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।	২) রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৩) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয় এবং রাসায়নিক অনুঘটকের মতো বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে।	৩) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেয় না এবং কাজের শেষে বিনষ্ট হয় বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।
৪) কার্য পদ্ধতি দ্রুত ও ফল তাৎক্ষনিক।	৪) কার্যপদ্ধতি ধীরগতিসম্পন্ন, দীর্ঘস্থায়ী এবং ফল সুদূর প্রসারী।
৫) সাধারণত উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী স্থানে কাজ করে।	৫) উৎপত্তি স্থল থেকে দূরবর্তী অঙ্গে কাজ করে।
৬) সমস্ত এনজাইমের রাসায়নিক প্রকৃতি প্রোটিন ধর্মী।	৬) রাসায়নিক প্রকৃতি প্রোটিন, স্টেরয়েড ও এমাইন প্রকৃতির।
৭) সব বয়সে একই রকম এনজাইম দেখা যায়।	৭) বিভিন্ন বয়সে বা জীবনের বিভিন্ন দশায় হরমোনের তারতম্য দেখা যায়।
৮) খাদ্য পরিপাকে এনজাইমের গুরুত্ব অপরিসীম, যেমন: এমাইলেজ, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ ইত্যাদি।	৮) খাদ্যের বিপাক, দেহের বৃদ্ধি, জনন প্রক্রিয়া ইত্যাদিতে হরমোনের ভূমিকা অপরিসীম, যেমন: থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্রোথ হরমোন, টেস্টোস্টেরন, ইস্টোজেন ইত্যাদি।

শারীরবৃত্তীক কাজে এনজাইমের ভূমিকা

দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিক কাজ সম্পন্ন করতে ত্তিনজাইমের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এনজাইমের শরীরবৃত্তিক ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো

১। **পরিপাকে ভূমিকা** ঃ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে এনজাইমের অংশগ্রহণ অপরিহার্য

ক) **শর্করা পরিপাক** ঃ লালারস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের এমাইলেজ, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক রসের মলটেজ, আন্ত্রিক রসের ল্যাকটেজ, সুক্রোজ, আইসোমলটেজ প্রভৃতি এনজাইম জটিল শর্করা যেমন - স্টার্চ, ল্যাকটোজ, মলটোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি ভেঙে সরল ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনকারী গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ প্রভৃতি সৃষ্টি করে।

খ) **প্রোটিন পরিপাক** ঃ পাচক রসের পেপসিন ও জিলেটিনেজ, অগ্ন্যাশয় রসের ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কোলাজিনেজ, ইলাস্টেজ ও কার্বক্সিপেপটাইডেজ, আন্ত্রিক রসের অ্যামাইনো পেপটাইডেজ, ডাই ও ট্রাইপেপটাইডেজ প্রভৃতি এনজাইম উদ্ভিদ ও প্রানিজ প্রোটিনকে ভেঙ্গে সরল ব্যবহারযোগ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

গ) **ফ্যাট পরিপাক** ঃ পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক রসের লাইপেজ, অগ্ন্যাশয় রসের ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ প্রভৃতি এনজাইম প্রশমিত ফ্যাট, ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেরল এস্টারের ভাঙনের ফলে কোষের ব্যবহারযোগ্য ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল উৎপন্ন করে।

২। **বিপাকে ভূমিকা** ঃ বিপাকেও এনজাইম গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক) **উপচিতিতে** ঃ ফসফোরাইলেজ, গ্লাইকোজেন সিন্থেটেজ প্রভৃতি এনজাইম গ্লুকোজ থেকে গ্লাইজোজেন সংশ্লেষে (গ্লাইকোজেনেসিস), ট্রান্সএমাইনেজ, ডিহাইড্রোজিনেজ প্রভৃতি এনজাইম অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, ল্যাকটিক অ্যাসিড ও ডাইহাইড্রক্সিএসিটোনফসফেট থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষে এবং DNA ও RNA পলিমারেজ নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষের মাধ্যমে উপচিতিমুলক বিপাকে সহায়তা করে।

খ) **অপচিতিতে** ঃ হেক্সোকাইনেজ, ফসফোফ্রুকটোকাইনেজ, এনোলেজ প্রভৃতি এনজাইম ATP সংশ্লেষ, ডি-এমাইনেজ, কার্বামাইল ফসফেট সিন্থেটেজ, আরজিনেজ প্রভৃতি এনজাইম ইউরিয়া সংশ্লেষের মাধ্যমে অপচিতিমূলক বিপাকে সহায়তা করে।

৩। **হরমোনের কাজে সহায়তা** ঃ এডেনাইল সাইক্লেজ এর মাধ্যমে আনীত রাসায়নিক বার্তা প্রেরনে এনজাইম সাহায্য করে। কোষের যাবতীয় বিপাকীয় কাজের জন্য অপরিহার্য আপাত নিষ্ক্রিয় এনজাইমতন্ত্রকে ক্রমান্বয়ে সক্রিয় করে।

৪। **কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহনে ভূমিকা** ঃ কার্বনিক এনহাইড্রেজ এনজাইম রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বহনের সময় কার্বনিক অ্যাসিড গঠনে সাহায্য করে।

৫। **কোষীয় পরিপাকে ভূমিকা** ঃ অ্যাসিড ও ক্ষারীয় ফসফাইটেজ এনজাইম কোষীয় পরিপাকে সাহায্য করে।

৬। **জীবাণু ধ্বক্ষংসে ভূমিকা** ঃ লাইসোজাইম এনজাইম দেহে প্রবিষ্ট বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার পলিস্যাকারাইড নির্মিত কোষ-প্রাচীর বিগলিত করে ওদের বিনষ্ট করে।

৭। **স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনে ভূমিকা** ঃ এসিটাইলকোলিনেস্টারেজ এনজাইম স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলতে কি বুঝ?

২। বহিঃক্ষরা গ্রন্থির বৈশিষ্টগুলো কি কি?

৩। লালা গ্রন্থি বলতে কি বোঝ? লালা গ্রন্থির কাজগুলো বর্ণনা কর।

৪। সিবেসিয়াস গ্রন্থি বলতে কি বোঝ? সিবেসিয়াস গ্রন্থির কাজ বর্ণনা কর।

৫। সয়েট গ্রন্থি বলতে কি বোঝ? সয়েট গ্রন্থির কাজ বর্ণনা কর।

৬। সেরুমিনাস গ্রন্থি বলতে কি বোঝ? সেরুমিনাস গ্রন্থির কাজ বর্ণনা কর।

৭। যকৃত বলতে কি বোঝ? যকৃইতের কাজ বর্ণনা কর।

৮। অগ্ন্যাশয় বলতে কি বোঝ? অগ্ন্যাশয়ের অবস্থান বর্ণনা কর।

৯। অশ্রুগ্রন্থি বলতে কি বোঝ? অশ্রুগ্রন্থি অবস্থান বর্ণনা কর।

১০। এনজাইম কাকে বলে? এনজাইমের বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা কর।

খ) রচনামুলক প্রশ্ন

১। অন্তঃক্ষরা ৫টি গ্রন্থির নাম ও কাজ লেখ।

২। পিটুটারী গ্রন্থি থেকে কি কি হরমোন নিঃসৃত হয়? তাদের কাজ উল্লেখ কর।

৩। ডিম্বাশয় থেকে কি কি হরমোন নিঃসৃত হয়? তাদের কাজ উল্লেখ কর।

৪। শুক্রাশয় থেকে কি কি হরমোন নিঃসৃত হয়? তাদের কাজ উল্লেখ কর।

৫। এনজাইম ও হরমোনের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

এয়োদশ অধ্যায়
স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)

স্নায়ুতন্ত্র হলো এমন তন্ত্র যা দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা গ্রহন করে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে। মানবদেহের যে তন্ত্র পরিবর্তনশীল পরিবেশে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ সাধন করে, তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং আলো, শব্দ, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে দেহের সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস : মানুষের স্নায়ুতন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত, যথা :-

ক) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)
খ) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System)।

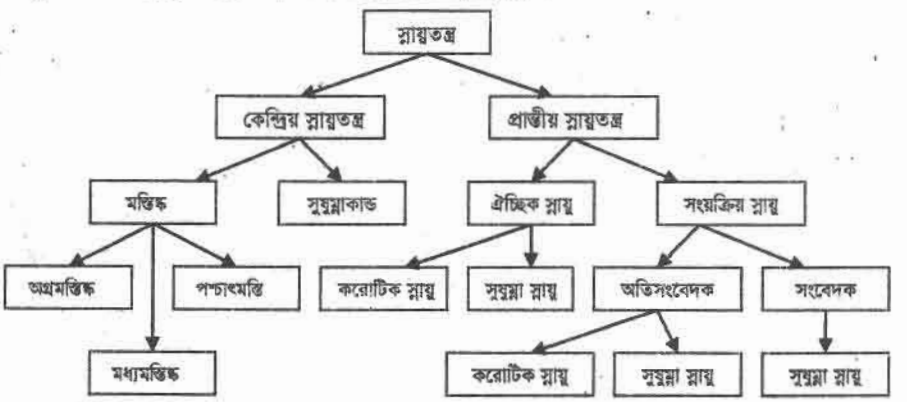

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা :-

ক) মস্তিষ্ক (Brain)
খ) সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)।

মস্তিস্ক তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা -

ক) অগ্রমস্তিষ্ক (Forebrain),
খ) মধ্যমস্তিষ্ক (Midbrain) ও
গ) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (Hindbrain)।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত, যথা -

ক) ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র (Somatic nervous system) এবং
খ) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system)।

ঐচ্ছিক স্নায়ুস্তন্ত্র দুইধরনের স্নায়ু আছে, যথা -

ক) করোটিক স্নায়ু (Cranial nerves) -১২ জোড়া

খ) সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerves) -৩১ জোড়া।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কাজের একককে **স্নায়ুকোষ** (Neuron) বলা হয়। স্নায়ুকোষের সংখ্যা প্রায় ১০০ বিলিয়ন। স্নায়ুকোষ তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা:-

ক) কোষ দেহ (Cell body),
খ) এক্সন (Axon),
গ) ডেনড্রাইট (Dendrite)।

কোষ দেহ (Cell body) ঃ কোষ দেহ স্নায়ুকোষের (Neuron) মুখ্য অংশ এবং গোলাকার, ডিম্বাকার, নক্ষত্রাকার সুচালো প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের হয়। এইগুলি প্লাজমা মেমব্রেন (Plasma membrane), সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) এবং নিউক্লিয়াস (Nucleus) এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।

এক্সন (Axon) ঃ কোষ দেহ থেকে উৎপন্ন বেশ লম্বা ও শাখাহীন তন্তুটির নাম এক্সন (Axon)। নিউরিলেমা পরিবেষ্টিত এক্সনকে স্নায়ুতন্তু (Nerve fiber) বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিউরিলেমা এক্সন -এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্নেহ পদার্থের একটি স্তর থাকে। এই স্তরকে মাইলিন পর্দা (Myelin sheath) বলে। স্নায়ুতন্ত্রে মাইলিন পর্দা বিহীন অংশকে নোড অব রেনভিয়ার (Node of ranviar) বলে। মাইলিন পর্দার উপর সোয়ান কোষ (Schwann cell) থাকে। একটি নিউরনে সাধারণত একটি এক্সন থাকে।

এক্সনের কাজ ঃ

- উদ্দীপনা একটি নিউরণের দেহ থেকে পরবর্তী নিউরনের দিকে প্রবাহিত করা।

ডেনড্রাইট (Dendrite) ঃ কোষ দেহের চারদিক থেকে সৃষ্ট শাখান্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও লম্বা অংশকে ডেনড্রাইট বলে। ডেনড্রাইটের মধ্যে রাইবোজোম, মসৃণ এণ্ডোপস্নাজমিক জালিকা, নিউরোফিলামেট ইত্যাদি বিস্তৃত থাকে। ডেনড্রাইটের সংখ্যা একটি থেকে বণ্ড হতে পারে।

ডেনড্রাইটের কাজ ঃ

- উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষ দেহে পৌঁছে দেয়া।

স্নায়ুকোষের (Neuron) **কাজ ঃ**

- স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করা (Reception of nerve impulse)।
- স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন করা (Conduction of nerve impulse)।
- স্নায়ু উদ্দীপনা সমন্বয় করা (Integration of nerve impulse)।
- স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করা (Transmition of nerve impulse)।

স্নায়ুকোষের প্রকারভেদ ঃ স্নায়ুকোষের কাজের উপর ভিত্তি করে একে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। আজ্ঞাবহ স্নায়ু (Motor Nerve)।
২। সংবেদী স্নায়ু (Sensory Nerve)।

১। আজ্ঞাবহ স্নায়ু ঃ

যে স্নায়ু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে আজ্ঞা স্নায়ু উদ্দীপনা কার্যকর অংশে বহন করে তাকে মোটর নার্ভ বা আজ্ঞাবহ স্নায়ু বলে।

২। সংবেদী স্নায়ু ঃ

যে স্নায়ু কার্যকর অংশ থেকে কেন্দীয় স্নায়ুতন্ত্রে সংবেদন স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে তাকে সেন্সরী নার্ভ বা সংবেদী স্নায়ু বলে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করে। এটি মস্তিস্ক (Brain) ও সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord) নিয়ে গঠিত। সমগ্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তিনটি ঝিল্লিতে বেষ্টিত থাকে। এই ঝিলিগুলোকে মেনিনজেস (Meninges) বলে। ঝিল্লি তিনিটি হচ্ছে (বাহির থেকে ভেতরের দিকে) ।

১) ড্যুরা ম্যাটার (Dura mater)
২) এরাক্নয়েড ম্যাটার (Arachnoid mater) এবং
৩) পায়া ম্যাটার (Pia mater)।

১। **ড্যুরা ম্যাটার** ঃ এই ঝিল্লি বহিঃস্থতম ও সুদৃঢ় ঝিল্লি যা করোটি ও কশেরুকার সঙ্গে লেগে থাকে।
২। **এরাক্নয়েড ম্যাটার** : এই ঝিল্লি হলো ড্যুরা ম্যাটার ও পায়া ম্যাটারের মধ্যবর্তী ঝিল্লি। এরাক্নয়েড ম্যাটার ও পায়া ম্যাটারের মধ্যবর্তী স্থান সাব-এরাক্নয়েড স্পেস নামে পরিচিত।
৩। **পায়া ম্যাটার** : এটি অন্তঃস্থতম ঝিল্লি যা স্নায়ুকলার সংলগ্ন থাকে।
সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal fluid-CSF) ঃ সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড হলো পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও রংবিহীন পরিবর্তিত কলা নিঃসৃত তরল পদার্থ যা সাব-এরাক্নয়েড স্পেস, মস্তিষ্কের গহ্বর এবং নিউরাল নালীতে অবস্থান করে। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের পরিমাণ প্রায় ১৫০ মিলিলিটার।

সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের কাজ ঃ

- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোনে পুষ্টি সরবরাহ করা।
- শ্বসনিক গ্যাসের বিনিময় ঘটানো।
- বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন।
- লিম্ফোসাইটের মাধ্যমে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা।
- স্নায়ুকলাকে অবলম্বন দান এবং যান্ত্রিক আঘাত থেকে রক্ষা করা।

মস্তিষ্ক (Brain) ঃ সুষুম্না কাণ্ডের শীর্ষে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ করোটির মধ্যে অবস্থান করে, তাকে মস্তিষ্ক বলে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার, গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি এবং এতে প্রায় ১০ বিলিয়ন (১ হাজার কোটি) নিউরোন থাকে। মানুষের মস্তিষ্ক ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা :-

১) অগ্রমস্তিষ্ক (Fore brain), ২) মধ্য মস্তিষ্ক (Mid brain) এবং ৩) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (Hind brain)।

অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান অংশ হচ্ছে সেরেব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালমাস। এই অংশটি ব্যথা-বেদনা ও আনন্দ অনুভুতি, রাগের প্রকাশ করে এবং আহার, নিদ্রা, স্মৃতি, মেধা ও যুক্তি প্রকাশের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। মধ্যমস্তিষ্ক অংশটি অগ্র ও পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসুত্র রচনা করে। এটি সেরেব্রাল পেডাঙ্কল, ক্রাস-সেরেব্রি, সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা ও সেরেব্রাল একুইডাক্ট নিয়ে গঠিত। এখানে দর্শন ও শ্রবণের কেন্দ্র অবস্থিত। দেহের ভারসাম্য রক্ষা, বিভিন্ন পেশীর কাজে সমন্বয় করা, দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি মধ্যমস্তিষ্কের প্রধান কাজ।

পশ্চাৎ মস্তিষ্ক সেরেবেলাম, পন্স ও মেডুলা নিয়ে গঠিত। এ অংশটি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন শ্বসন হার, হৃদস্পন্দন হার, রক্তচাপ, পেরিস্টালসিস, গলধঃকরণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়াও দেহভঙ্গি, পেশী সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সুষ্ঠুচলনে সমন্বয় সাধন করে।

মস্তিষ্ক থেকে মোট ১২ জোড়া স্নায়ু উদ্ভুত হয় যা করোটিক স্নায়ু (Cranial nerve) নামে পরিচিত। এই সব স্নায়ু দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছে বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

সুষুম্না কাণ্ড (Spinal cord) ঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের এবং স্নায়ুকলায় নির্মিত যে অংশ মেরুদণ্ডের নালীতে (Vertebral canal) সুরক্ষিত অবস্থায় মস্তিষ্কের পেছন থেকে প্রলম্বিত হয়, তাকে সুষম্নাকাণ্ড বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১.২৫ সেন্টিমিটার ও ওজন প্রায় ৩০ গ্রাম। এইটা মেরুদণ্ডের নালীর দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে অবস্থান করে। এটা সম্মুখে মেডুলা অবলংগাটার (Medulla oblongata) ৪র্থ ভেন্ট্রিকলে যুক্ত থাকে। এবং প্রথম কটিদেশীয় কশেরুকার (L_1) নিম্নপ্রান্তে বা দ্বিতীয় কটিদেশীয় কশেরুকার (L_2) উর্ধ্বর্ষপ্রান্তে শেষ হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি স্নায়ুর সেলবডি, সিনাপস ও মায়েলিনবিহীন সংযোজক নিউরোনে গঠিত ও দেখতে ইংরেজী H অক্ষরের মতো এবং ধূসর পদার্থ (Grey matter) নামে পরিচিত। গ্রে ম্যাটারের চতুর্দিকে বহিঃস্তর রূপে শ্বেত পদার্থ (White matter) অবস্থিত। এতে সেলবডি নেই, বরং এক্সনের চর্বিময় মায়োলিন সিথ থাকায় অঞ্চলটি হালকা বর্ণ ধারণ করে। সুষুম্নাকাণ্ডের দৈর্ঘ্য জুড়ে নিয়ত ব্যবধানে একজোড়া করে সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerve) বের হয়। মানবদেহে ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু আছে। প্রতিটি স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডের কাছেই দুটি শাখায় বিভক্ত হয়, যথা- ডর্সাল রুট (Dorsal root) ও ভেন্ট্রাল রুট (Ventral root)। ডর্সাল রুট শুধু সেন্সুরী নিউরন এবং ভেন্ট্রাল রুট শুধু মটর নিউরন বহন করে। সেন্সুরী নিউরনের সেল বডিগুলো ডর্সাল রুটের ভেতরে অবস্থান করে, ফলে একটি স্ফীত অংশ সৃষ্টি হয়। এই স্ফীত অংশকে ডর্সাল রুট গ্যাংগলিওন (Dorsal root ganglion) বলে।

সুষুম্না কাণ্ডের কাজ ঃ

- সুষুম্নাকাণ্ড দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে বহন এবং পক্ষান্তরে মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে দেহের প্রয়োজনীয় স্থানে বহনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- সুষুম্নাকাণ্ড সমন্বয় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেমন - হাঁটুর ঝাঁকুনির প্রতিক্রিয়া, মূত্রথলির সংকোচন, অন্ত্রের সংকোচন প্রভৃতি।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system)

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সৃষ্ট করোটিক ও সুষুম্না স্নায়ুগুলো দেহের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়ে যে স্নায়ুতন্ত্র গঠন করেছে, তাকে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে। এই স্নায়ুতন্ত্র ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত। অসংখ্য স্নায়ুতন্তু (Nerve fibre) নিয়ে একটি স্নায়ু গঠিত হয়। স্নায়ুতন্তুগুলো এপিনিউরিয়াম (Epineurium) নামক একটি যোজক কলার আবরণে বেষ্টিত থাকে। এপিনিউরিয়াম ভেতর দিকে বর্ধিত হয়ে স্নায়ু তন্তুগুলিকে গুচ্ছাকারে ভাগ করে আবদ্ধ রাখে। তখন প্রতিটি স্নায়ুতন্তুগুচ্ছের আবরণকে পেরিনিউরিয়াম (Perineurium) বলে অন্যদিকে, প্রত্যেক স্নায়ুতন্তু নিজেই এণ্ডোনিউরিয়াম (Endoneurium) নামক আবরণে আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ এপিনিউরিয়াম নামক যোজককলার আবরণে বেষ্টিত অসংখ্য স্নায়ুতন্তু গুচ্ছকে একত্রে একটি স্নায়ু বলে।

স্নায়ুতন্ত্রের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ুর ধারাবাহিক নাম

করোটিক স্নায়ুগুলোর ক্রমিক সংখ্যা লেখার জন্য রোমান সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

০১) অলফ্যাক্টরি স্নায়ু (Olfactory nerve)
০২) অপটিক স্নায়ু (Optic nerve)
০৩) অকুলোমোটর স্নায়ু (Oculomotor nerve)
০৪) ট্রকলিয়ার স্নায়ু (Trochlear nerve)
০৫) ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু (Trigeminal nerve)
০৬) এবডুসেন্ট স্নায়ু (Abducent nerve)
০৭) ফেসিয়াল স্নায়ু (Facial nerve)
০৮) ভেস্টিবুলো-কক্লিয়ার স্নায়ু (Vestibulo-cochlear nerve)
০৯) গেস্নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু (Glossopharyngeal nerve)
১০) ভ্যাগাস স্নায়ু (Vagas nerve)
১১) এক্সেসরি স্নায়ু (Accessory nerve)
১২) হাইপোগেস্নাসাল স্নায়ু (Hypoglossal nerve)

১) অলফ্যাক্টরি স্নায়ু (Olfactory nerve)

এরা প্রথম করোটিক স্নায়ু। মস্তিষ্কের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত অলফ্যাক্টরি লোব দুটির শীর্ষ দেশের অক্ষীয় দিক থেকে উৎপন্ন হয়ে নাকের মিউকাস পর্দায় বিস্তৃত। এই স্নায়ু প্রকৃতিতে সংবেদী (Sensory)।

অলফ্যাক্টরি স্নায়ুর কাজ ঃ

➢ ঘ্রাণ অনুভূতি নাকের মিউকাস পর্দার মাধ্যমে গ্রহন করে অলফ্যাক্টরি লোবে পৌছায়।

২) অপটিক স্নায়ু (Optic nerve) ঃ

দ্বিতীয় জোড়া করোটিক স্নায়ুকে অপটিক স্নায়ু বলে। এই স্নায়ু সেন্সরি প্রকৃতির। এরা মধ্যমস্তিষ্কের অপটিক লোব দুটির সম্মুখে অবস্থিত।

অপটিক স্নায়ুর কাজ ঃ

➢ অপটিক স্নায়ু রেটিনা থেকে দর্শন অনুভূতি অপটিক লোবে নিয়ে এসে দর্শনে অংশগ্রহণ করে।

৩) অকুলোমোটর স্নায়ু (Oculomotor nerve)

এরা তৃতীয় জোড়া করোটিক স্নায়ু, মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত মোটর স্নায়ু। এরা চোখের সুপিরিয়র রেক্টাস, ইনফেরিয়র রেক্টাস এবং মেডিয়াল রেক্টাস পেশীতে যায়।

অকুলোমোটর স্নায়ুর কাজ

- অকুলোমোটর স্নায়ু চোখের পেশিসমূহের সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে চোখের সঞ্চালন করে।

৪) **ট্রকলিয়ার স্নায়ু** (Trochlear nerve)

এরা চতুর্থ জোড়া করোটিক স্নায়ু। অপটিক লোবদ্বয়ের ঠিক পিছনে পৃষ্ঠীয় পার্শদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে চোখের পেশিতে যায়। এরা মোটর স্নায়ু।

ট্রকলিয়ার স্নায়ুর কাজ ঃ

- চোখের পেশির সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা চোখের সঞ্চালন করে।

৫) **ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু** (Trigeminal nerve) ঃ

এরা পঞ্চম জোড়া করোটিক স্নায়ু। মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটার পার্শদেশ থেকে উৎপন্ন হয়। এরা মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। অর্থাৎ মোটর ও সেন্সুরি উভয় প্রকৃতির স্নায়ু। উৎপন্ন হওয়ার পর পরই এই স্নায়ু ৩টি শাখায় বিভক্ত হয়। যথা -

ক) অপথ্যালমিক স্নায়ু (Opthalmic nerve) ঃ এটা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর প্রথম শাখা। এই স্নায়ু চোখের পাতা, মস্তকের সম্মুখ অঞ্চল, নাসিকার মিউকাস পর্দা ইত্যাদিতে যায়। এটা একটা সংবেদী স্নায়ু। এই স্নায়ু সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহ থেকে মস্তিষ্কে উদ্দীপনা বহন করে।

খ) ম্যাক্সিলারী স্নায়ু (Maxillary nerve) ঃ এটা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর দ্বিতীয় শাখা। এই স্নায়ু প্রকৃতিতে খাটি সংবেদী। এটা উপরের চোয়ালের দাঁতের মাড়ি, দাঁত, উপরের ঠোঁট এবং চক্ষু কোটর থেকে অনুভূতি বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে আসে।

গ) ম্যাণ্ডিবুলার স্নায়ু (Mandibular nerve) ঃ এরা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর তৃতীয় শাখা। এরা ম্যাণ্ডিবল বা নিচের চোয়ালের পেশি, ত্বক এবং মুখ গহ্বরের পেশিতে যায়। এরা মিশ্র স্নায়ু। এই স্নায়ু নিচের চোয়ালের পেশি ও ত্বক থেকে অনুভূতি বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যায়।

ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর কাজ ঃ

- অপথ্যালমিক স্নায়ু সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহ থেকে মস্তিষ্কে উদ্দীপনা বহন করে।
- ম্যাক্সিলারী স্নায়ু উপরের চোয়ালের দাঁতের মাড়ি, দাঁত, উপরের ঠোঁট এবং চক্ষু কোটর থেকে মস্তিষ্কে উদ্দীপনা বহন করে।
- ম্যাণ্ডিবুলার স্নায়ু নিচের চোয়ালের পেশি ও ত্বক থেকে মস্তিষ্কে উদ্দীপনা বহন করে।

৬) **এবডুসেন্ট স্নায়ু** (Abducent nerve) ঃ

এরা ষষ্ঠ জোড়া করোটিকা স্নায়ু। মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয় পার্শ্বদেশ থেকে এবং ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর ঠিক পিছনে উৎপন্ন হয়। এরা মোটর প্রকৃতির স্নায়ু।

এবডুসেন্ট স্নায়ুর কাজ ঃ

- এরা চোখের রেক্টাস পেশিতে যায় এবং অক্ষিগোলক থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে বহন করে।

৭) **ফেসিয়াল স্নায়ু** (Facial nerve) ঃ

এরা সপ্তম জোড়া করোটিকা স্নায়ু। এরা মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। উৎপন্ন হবার পর ফেসিয়াল স্নায়ু, ভেস্টিবুলো-ককলিয়ার স্নায়ুর সাথে একত্রে একই ছিদ্র পথ দিয়ে করোটিকার অস্থির ভেতর যায় এবং করোটির

স্টাইলোম্যাস্টোয়েড ছিদ্র পথে বের হয়ে আসে। এর পর এই স্নায়ু প্যারোটিড গ্রন্থির উপর দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৫টি প্রান্তীয় শাখায় বিভক্ত হয়। যথা -

ক) টেম্পোরাল (Temporal)
খ) জাইগোম্যাটিক (Zygomatic)
গ) বাক্কাল (Buccal)
ঘ) মেণ্ডিবুলার (Mandibular)
ঙ) সারভাইকাল (Cervical)

এই পাঁচ শাখায় বিভক্ত হওয়ার আগে মূল ফেসিয়াল স্নায়ু থেকে আরও কয়েকটা ছোট শাখা স্নায়ু বের হয়।

ফেসিয়াল স্নায়ুর কাজ ঃ

- মুখ-মণ্ডলের অভিব্যক্তি প্রকাশে সাহায্য করে।
- জিহ্বা থেকে মস্তিষ্কে স্বাদের অনুভূতি আনে।
- সাব-মেণ্ডিবুলার, সাবলিঙ্গুয়াল লালাগ্রন্থি এবং ল্যাক্রিম্যাল গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

৮) ভেস্টিবুলো-কক্লিয়ার স্নায়ু (Vestibulo-cochlear nerve) ঃ

এরা অষ্টম জোড়া করোটিক স্নায়ু। এরা মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। এরপর এরা দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে মেমব্রেনাস ল্যাবাইরিন্থে বিস্তৃত হয়। যথা-

ক) ভেস্টিবুলার স্নায়ু (Vestibular nerve) ঃ এই স্নায়ু ইউট্রিকুলাসের এম্পুলাসমূহ থেকে ভারসাম্যবোধের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে নিয়ে আসে। এই স্নায়ু ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে।

খ) কক্লিয়ার স্নায়ু (Cochlear nerve) ঃ এই স্নায়ু সেকুলাস থেকে শ্রবণের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।

ভেস্টিবুলো-কক্লিয়ার স্নায়ুর কাজ ঃ

- ভেস্টিবুলার স্নায়ু ভারসাম্য রক্ষার উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।
- কক্লিয়ার স্নায়ু শ্রবণের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।

৯) গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু (Glossopharyngeal nerve) ঃ এরা নবম জোড়া করোটিক স্নায়ু। এই স্নায়ু মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে বের হয়। এটা একটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এই স্নায়ুর ৪টি প্রধান শাখা। যথা :

ক) টিম্প্যানিক স্নায়ু (Tympanic nerve) ঃ এই স্নায়ু মধ্য কর্ণে যায়।
খ) ফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু (Pharyngeal nerve) ঃ এই স্নায়ু গলবিলে বিস্তৃত হয়।
গ) লিঙ্গুয়াল স্নায়ু (Lingual nerve) ঃ এই স্নায়ু জিহ্বায় যায় এবং গলবিলের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
ঘ) মাস্কুলার স্নায়ু (Muscular nerve) ঃ এটা স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস পেশিতে যায়।

গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুর কাজ ঃ

- গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু স্বাদ গ্রহণ, স্পর্শ এবং গলবিল অঞ্চলের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

১০) ভ্যাগাস স্নায়ু (Vagus nerve) ঃ এরা মানুষের দশম জোড়া করোটিক স্নায়ু। এরা মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়। ভ্যাগাস স্নায়ুর গোড়ায় ভ্যাগাস গ্যাংলিয়ন (Vagus ganglion) অবস্থিত। এরা মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। উৎপন্ন হবার পর ভ্যাগাস স্নায়ু দেহ গহ্বরে প্রবেশ করে চারটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়। যথা -

ক) ল্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু (Laryngeal nerve) ঃ এই স্নায়ু স্বরযন্ত্রে যায় এবং স্বরথলি থেকে অনুভূতি

মস্তিষ্কে নিয়ে আসে। ল্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু।

খ) কার্ডিয়াক স্নায়ু (Cardiac nerve) ঃ এই স্নায়ু হৃদযন্ত্রে যায় এবং হৃদযন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা একটা মোটর স্নায়ু।

গ) পালমোনারী স্নায়ু (Pulmonary nerve) ঃ এই স্নায়ু ফুসফুসে যায়। এরা ফুসফুসের সংকোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা একটা মোটর স্নায়ু।

ঘ) গ্যাস্ট্রিক স্নায়ু (Gastric nerve) ঃ এই স্নায়ু পাকস্থলীতে যায়। এটা পাকস্থলীর সঙ্কোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা একটা মোটর স্নায়ু। এ ছাড়া ভ্যাগাস স্নায়ু থেকে আরও কয়েকটা ছোট শাখা স্নায়ু বের হয়।

ভ্যাগাস স্নায়ুর কাজ ঃ

- ল্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু স্বরথলি থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।
- কার্ডিয়াক স্নায়ু হৃদযন্ত্রের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।
- পালমোনারী স্নায়ু ফুসফুসের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।
- গ্যাষ্ট্রিক স্নায়ু পাকস্থলীর উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।

১১) **এক্সেসরি স্নায়ু** (Accessory nerve) ঃ এরা একাদশ জোড়া করোটিক স্নায়ু। এরা মেডুলা অবলংগাটার সম্মুখ পার্শ্ব থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বরযন্ত্রের পেশি ও তালুর পেশিতে যায়।

এক্সেসরি স্নায়ুর কাজ ঃ

- এক্সেসরি স্নায়ু স্বরযন্ত্রের পেশি ও তালুর পেশির উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।

১২) **হাইপোগেস্নাসাল স্নায়ু** (Hypoglossal nerve) ঃ এরা দ্বাদশ জোড়া করোটিক স্নায়ু। এরা মেডুলা অবলংগাটার সম্মুখ পার্শ্ব থেকে উৎপন্ন হয়ে জিহবার মাংসপেশিতে যায়। এই স্নায়ু প্যালাটোগ্লসাস মাংশপেশিতে যায় না। এরা জিহবার আকৃতি ঠিক রাখে ও জিহবার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে।

হাইপোগ্লোসাল স্নায়ুর কাজ

- হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু জিহ্বার উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পরিবহন করে।

মস্তিষ্ক (Brain)

সুষুম্নাকাণ্ডের শীর্ষে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ করোটির মধ্যে অবস্থান করে, তাকে মস্তিষ্ক বলে। ভ্রূণ অবস্থায় সুষুম্নাকাণ্ডের অগ্রবর্তী দণ্ডাকার অংশ ভাঁজ হয়ে পর পর ৩টি বিষমাকৃতির স্ফীতি তৈরি করে। স্ফীতি ৩টি মিলেই গঠিত হয় মস্তিষ্ক। সামনের দিক থেকে স্ফীত অংশ ৩টি হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক ও পশ্চাৎমস্তিষ্ক। ভ্রূণ যত পরিণত হতে থাকে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের জটিলতাও তত বাড়তে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার, গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি এবং এতে প্রায় ১০ বিলিয়ন (এক হাজার কোটি) নিউরোন থাকে মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে বড়, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষের মস্তিষ্ক ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত :

১) অগ্রমস্তিষ্ক (Forebrain or prosephalon)
২) মধ্যমস্তিষ্ক (Midbrain or mesencephalon) এবং
৩) পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Hindbrain or rhombiencephalon)।

১) অগ্রমস্তিষ্ক

অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান অংশ হচ্ছে সেরেব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস

ক) **সেরেব্রাম** (Cerebrum) ঃ দুটি বড়, কুণ্ডলো পাকানো ও খাঁজবিশিষ্ট খণ্ড নিয়ে সেরেব্রাম গঠিত। খণ্ড দুটিকে সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার (Cerebral hemisphere) বলে। সেরেব্রাম মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ। মস্তিষ্কের ওজনের ৮০% হচ্ছে সেরেব্রাম। মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে সেরেব্রাম আবৃত করে রাখে। খণ্ডদুটি ভেতরের দিকে স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত। পৃষ্ঠতল নানা স্থানে ভাঁজ হয়ে উঁচু নিচু অবস্থায় থাকে। উঁচু স্থানকে জাইরাস (Gyrus) এবং নিচু স্থানকে ফিসার (Fissure) বলে।

কয়েকটি ভাঁজ সুগঠিত ও গভীর হয়ে ৩টি প্রশস্ত ফিসার সৃষ্টি করে। যথা–

i) সেন্ট্রাল ফিসার (Central fissure),
ii) প্যারাইটোঅক্সিপেটাল ফিসার (Paraito-oxipetal fissure) এবং
iii) ল্যাটেরাল ফিসার (Lateral fissure)।

ফলে প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার ৪টি সুস্পষ্ট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা-

i) ফ্রন্টাল লোব (Frontal lobe),
ii) প্যারাইটাল লোব (Pararital lobe),
iii) অক্সিপিটাল লোব (Oxipital lobe) এবং
iv) টেম্পোরাল লোব (Temporal lobe)

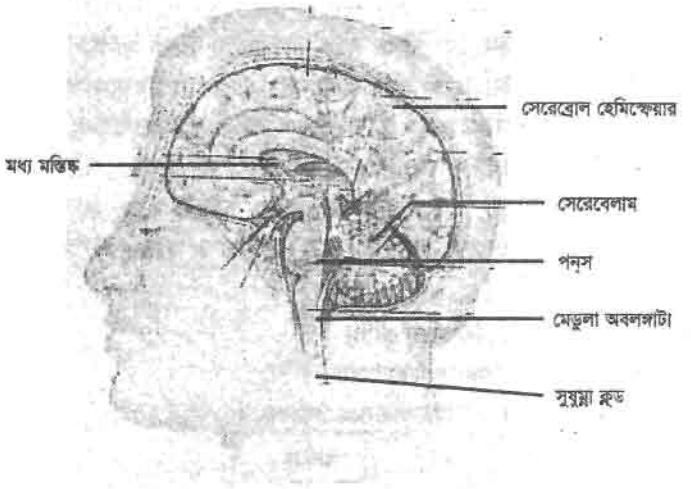

মানুষের মস্তিষ্ক

সেরেব্রামের বহিঃস্তর ৩ সেন্টিমিটার পুরুও গ্রে ম্যাটারে গঠিত। এর নাম সেরেব্রাল কর্টেক্স (Cerebral cortex)। এর নিচের স্তরটি অর্থাৎ সেরেব্রামের অন্তঃস্তর হোয়াইট ম্যাটারে গঠিত এবং সেরেব্রাল মেডুলা (Cerebral medulla) নামে পরিচিত। ডান সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম পাশকে এবং বাম হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান পাশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সেরেব্রামের কাজ

- সংবেদী অঙ্গ থেকে আসা অনুভূতি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে।
- চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতি উন্নত মানসিক বোধের নিয়ন্ত্রণ করে।
- বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।
- বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহের সব ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ) **থ্যালামস** (Thalamus) ঃ প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সেরেব্রাল মেডুলায় অবস্থিত এবং গ্রে ম্যাটারে গঠিত একেকটি ডিম্বাকার অঞ্চল। দুটি থ্যালামাই একটি যোজক দিয়ে যুক্ত।

থ্যালামসের কাজ

- এটি সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে (স্নায়ু আবেগ থ্যালামাস সেরেব্রাম)।
- চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা প্রভৃতি স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র, আবেগের কেন্দ্র ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়।
- ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলে ও পরিবেশ সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে।

গ) **হাইপোথ্যালামাস** (Hypothalamus) ঃ এটি থ্যালামাসের ঠিক নিচে অবস্থিত, গ্রে ম্যাটার নির্মিত এবং অন্তত এক ডজন পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত অংশ। অংশগুলো সুনির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকে। হাইপোথ্যালামাস

একটি সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে পিটুইটারি গ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত।

হাইপোথ্যালামাসের কাজ ঃ

- স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম, রাগ, পীড়ন, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- নিউরোহরমোন উৎপন্ন করে ট্রপিক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ভ্যাসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন নামে দুরকম নিউরোহরমোন সরাসরি ক্ষরিত হয় এবং তা পশ্চাৎ পিটুইটারির মধ্যে জমা থাকে।

২। মধ্যমস্তিষ্ক

এইটি খাটো ও সংকুচিত অংশ যা অগ্র ও পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং সেরেব্রাল হেমিস্ফেয়ারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকে। এর নিচের অংশ সেরেবেলাম ও পনস (পশ্চাৎ মস্তিষ্ক) – এর সাথে এবং উপরের অংশ অগ্রমস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত। মধ্যমস্তিষ্ক ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা :-

ক) সেরেব্রাল পেডাঙ্কল (Cerebrtal peduncle),
খ) কর্পোরা কোয়ড্রিজেমিনা (Corpora quadrigemina) এবং
গ) সেরেব্রাল একুইডাক্ট (Cerebral aqueduct)

ক) **সেরেব্রাল পেডাঙ্কল** ঃ এইটি মধ্যমস্তিষ্কের নিম্নাংশে অবস্থিত এবং অনুদৈর্ঘ্য স্নায়ুতন্তু নির্মিত একজোড়া পুরু নলাকার ব্যাণ্ড। অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

খ) **কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা** ঃ মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশ নির্মাণকারী ৪টি গোল অংশকে কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা বলে। প্রকৃত পক্ষে একজোড়া বড় আকৃতির খণ্ড (Lobe), এর প্রত্যেকটি খণ্ড আড়াআড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে মোট ৪টি খণ্ডের সৃষ্টি হয়। অক্ষিপেশীর সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা, চোখের পিউপিল ও লেন্সের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘাটানো, দৃষ্টি ও শ্রুতিজনিত উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে মাথা, ঘাড় ও দেহকাণ্ডকে সঞ্চালনে সাহায্য করা, দৃষ্টি ও শ্রুতিজনিত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা, চোখের পিউপিল ও লেন্সের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো এবং দৃষ্টি ও শ্রন্নতি ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

গ) **সেরেব্রাল একুইডাক্ট** ঃ এটি মধ্যমস্তিষ্কের ১৫ মিলিমিটার লম্বা ও সংকীর্ণ নালী যার প্রাচীর কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা ও সেরেব্রাল পেডাঙ্কলে নির্মিত হয়। এটি ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল (মস্তিষ্ক-গহ্বর) এর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে।

৩। পশ্চাৎ মস্তিষ্ক

এটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশ এবং ৩টি প্রধান অংশ দিয়ে গঠিত, যথা- সেরেবেলাম (Cerebellum), মডুলা অবলঙ্গটা (medull oblongata) এবং পনস (pons)।

ক) সেরেবেলাম ঃ এটি পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ যা সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচে অবস্থিত কুণ্ডলিকৃত ও দুটি সমগোলার্ধে গঠিত। গোলার্ধ দুটি ভার্মিস (vermis) নামে একটি ক্ষুদ্র যোজকের সাহায্যে যুক্ত। সেরেবেলামের বাইরের অংশ গ্রে ম্যাটারে এবং ভেতরের অংশ হোয়াইট ম্যাটারে গঠিত। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সেরেবেলামের গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।

পশ্চাৎ মস্তিষ্কের কাজ :

- ঐচ্ছিক চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- ঐচ্ছিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহের ভারসম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখে।
- চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে।

৪। **মেডুলা অবলঙ্গাটা** ঃ এটি পন্স এর নিচের কিনারা ঘেঁষে প্রসারিত, অনেকটা পিরামিড আকৃতির দণ্ডাকার অংশ যা লম্বায় প্রায় ৩ সেন্টিমিটার, চওড়ায় ২ সেন্টিমিটার এবং স্থূলত্বে ১.২ সেন্টিমিটার।

মেডুলা অবলঙ্গাটার কাজ ঃ

- হৃদস্পন্দন,শ্বসন, গলধকরণ, কাশি, রক্তবাহিকার সংকোচন, লালা ক্ষরণ প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- বমন, মল-মূত্রত্যাগ, রক্তচাপ, পরিপাক নালীর পেরিস্ট্যালসিস প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।
- সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে।
- ৯ম, ১০ম ও ১১শ করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল হিসেবে কাজ ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। **পন্স** ঃ এটি মেডুলা অবলাঙ্গাটার উপরের অংশের নিম্নাংশে অবস্থিত এবং আড়াআড়ি স্নায়ুতন্তু নির্মিত একটি পুরু ব্যাণ্ড।

পনসের কাজ ঃ

- সেরেবেলাম, সুষুম্নাকণ্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যে রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে।
- দেহের দুপাশের পেশীর কর্মকাণ্ড সমন্বয় করে।
- স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখান থেকে সৃষ্ট ৫ম থেকে ৮ম করোটিক স্নায়ু দেহের নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে।

৬। **মস্তিষ্কের গহ্বর**

মস্তিষ্ক নিরেট নয়। এর অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন অংশ ফাঁপা প্রকোষ্ঠের মতো। মস্তিষ্কের ভেতরকার ফাঁপা প্রকোষ্ঠকে মস্তিষ্কের গহবর (Ventricle) বলে। মানুষের মস্তিষ্কের ৪টি গহবর আছে এগুলোকে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গহ্বর নামে অভিহিত করা হয়। পার্শ্বীয় গহবরটি মধ্যমস্তিষ্কে এবং চতুর্থটি মেডুলা অবলাঙ্গটায় অবস্থিত। প্রথম দুটি গহ্বর যা পার্শ্বীয় গহ্বর নামে পরিচিত, তৃতীয় গহ্বরের সংগে ফোরামেন অব মনরো (Foramen of monro) নামক একটি অভিন্ন ছিদ্রপথে যুক্ত। তৃতীয় গহ্বরটি চতুর্থ গহ্বরের সঙ্গে সেরেব্রাল একুইডাক্ট নামক স্নায়ু নালী দিয়ে যুক্ত থাকে। সুষুম্নাকাণ্ডের নিউরাল নালী চতুর্থ গহ্বরটিতে উন্মুক্ত হয়। গহবরগুলি সেরেব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইডে পূর্ণ থাকে। এগুলো ফ্লুইডের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

সিনাপস (Synapse)

স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য নিউরোনে গঠিত হলেও নিউরোনগুলোর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ থাকে না। সাধারণত একটি নিউরোনের এক্সন-প্রান্ত অন্য নিউরোনের ডেনড্রাইট-প্রান্তের খুব কাছে অবস্থান করে কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করে না। এইভাবে দুটি স্নায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত এমন একটি সংযোগস্থল থাকে যেখানে একটি নিউরোনের এক্সনের প্রান্ত শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরোনের এক্সন, ডেনড্রাইট বা সেলবডি শুরু হয়, তাকে সিনাপস বলে।

সিনাপস-এর প্রকারভেদ ঃ সিনাপস নিম্নোক্ত তিন প্রকার ঃ

ক) এক্সোসোমাটিক সিনাপস ঃ এই জাতীয় সিনাপসে একটি নিউরোনের এক্সনের শাখাপ্রান্তগুলো

অন্য নিউরোনের সেলবডির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

খ) এক্সোডেনড্রাইটিক সিনাপস ঃ এই জাতীয় সিনাপসে একটি নিউরোনের এক্সনের শাখাপ্রান্তগুলি অন্য নিউরোনের ডেনড্রাইটের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

গ) এক্সোএক্সোনিক সিনাপস ঃ এই জাতীয় সিনাপসে একটি নিউরোনের এক্সনের শাখাপ্রান্তগুলো অন্য নিউরোনের এক্সনের শাখাপ্রান্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

সিনাপসের গঠন

একটি সিনাপসের ইলেক্ট্রন অনুবিক্ষণিক গঠনের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো

প্রতিটি এক্সনের প্রান্তগুলো স্ফীত হয়ে যে অংশ গঠন করে, তাকে সিনাপটিক নব (Synaptic nob) বলে। এই নবের ভেতরে থাকে অনেক মাইটোকণ্ড্রিয়া, মাইক্রোফিলামেন্ট ও অসংখ্য ক্ষুদ্র সিনাপটিক ভেসিকল (Synaptic vesicle)। এইসব ভেসিকল এসিটাইলকোলিন (কিংবা নরএড্রিনালিন) নামক রাসায়নিক নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থে পূর্ণ থাকে। প্রতিটি ভেসিকলে প্রায় ৩ হাজার অণু এসিটাইলকলিন থাকে।

সিনাপস-অভিগামী স্নায়ু-উদ্দীপনাবাহী নিউরোনকে প্রিসিনাপটিক নিউরোন (Presynaptic neurone) সিনাপস্-বহির্গামী স্নায়ু-উদ্দীপনাবাহী নিউরোনকে পোস্টসিনাপটিক নিউরোন (Postsynaptic neurone) বলে। নিউরোন দুটি যথাক্রমে প্রিসিনাপটিক ঝিল্লি ও পোস্টসিনাপটিক ঝিল্লিতে (Postsynaptic membrane) আবদ্ধ। পোস্টসিনাপটিক ঝিল্লিতে গ্রাহক অণু (Receptor molecules) নামে কতকগুলো বড় প্রোটিন অণু রয়েছে। প্রি ও পোস্টসিনাপটিক নিউরোনের মাঝখানে অবস্থিত ২০ ন্যানোমিটার (nm) ফাঁকা জায়গাকে সিনাপটিক ক্লেফ্ট (Synaptic cleft) বলে।

সিনাপস -এর কাজ ঃ

- সিনাপস -এর প্রধান কাজ নিউরোন থেকে নিউরোনে তথ্য স্থানান্তর করা।
- স্নায়ু-উদ্দীপনাকে কেবল একদিকে প্রেরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করা।
- বিভিন্ন নিউরোনের প্রতি সমন্বিত সাড়া দেয়া।
- অতি নিচু মাত্রার উদ্দীপনাকে বাছাই করে বাদ দিয়ে দেয়া।
- প্রচণ্ড স্নায়ু-উদ্দীপনায় নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থের ক্ষরণ কমিয়ে অতি উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা দেয়া, ফলে কার্যকর (Effector) অংশ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

স্নায়ুতন্ত্রে সিনাপসের মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবহন

স্পর্শ, শৈত্য, ব্যথা প্রভৃতি উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে যে অনুক্রমিক (Sequential) তড়িৎ-রাসায়নিক (Electrochemical) মেরুকরণ ও বিমেরুকরণ নিউরোনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে স্নায়ু-উদ্দীপনা (Nerve impulse) বলে। স্নায়ু উদ্দীপনা স্নায়ুর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিনাপটিক নবে পৌছালে Ca^{++} এর প্রতি প্রিসিনাপটিক ঝিল্লির ভেদ্যতা বেড়ে যায়। ফলে নবের চারপাশের কোষবহিঃস্থ তরল থেকে Ca^{++} নবের মধ্যে প্রবেশ করে। Ca^{++} নবের মধ্যে প্রবেশ করার সংগে সঙ্গে সিনাপটিক ভেসিকলগুলো প্রিসিনাপটিক ঝিল্লির সাথে একীভূত হয়ে সিনাপটিক ক্লেফ্টে নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ এসিটাইলকোলিন ক্ষরণ করে। শুন্য ভেসিকলগুলি পুনরায় সাইটোপস্নাজমে ফিরে গিয়ে এসিটাইলকোলিনে পূর্ণ হয়। এসিটাইলকোলিন ০.৫ মিলিসেকেণ্ড (ms) সময় নিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সিনাপটিক ক্লেফ্ট পেরিয়ে পোস্টসিনাপটিক ঝিল্লিতে পৌছে ঐ ঝিল্লিতে অবস্থিত গ্রাহক প্রোটিন অণুর সঙে যুক্ত হয়। ফলে উদ্দীপ্ত হয়ে এই ঝিল্লির আয়ন-চ্যানেলগুলো উন্মুক্ত হয়ে যায়। এইসব চ্যানেল পথে Na^{+} প্রবেশ করে। পোষ্ট-সিনাপেটিক ঝিল্লির ভেতর Na^{+} প্রবেশের ফলে ঝিল্লির বিমেরুকরণ ঘটে।

মেরুকরণ (Polazation) ঃ যখন ঝিল্লির বাইরে ইলেক্ট্রিকাল চার্জ পজিটিভ, কিন্তু ভেতরে নেগেটিভ থাকে।

বিমেরুকরণ (Depolarization) ঃ যখন পজিটিভ আয়ন ভেতরে প্রবেশ করে অভ্যন্তরীণ চার্জকে পজিটিভ করে করে তোলে, বাইরে নেগেটিভ হয় অর্থাৎ এক অস্থিতাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা ১/১০০০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। উল্লেখ্য

যে, একটি স্নায়ুতন্তু প্রতি সেকেণ্ড ১ হাজার স্নায়ু উদ্দীপক পরিচালনে সক্ষম।

মেরুত্বের এই পরিবর্তনকে এ্যাকশন পোটেনশিয়াল (Action potential) বলে। এই এ্যাকশন পোটেনশিয়াল স্নায়ুতন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর বিমেরুকরণ তরঙ্গ (Wave of depolarization) রুপে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হয় এবং একেই বলে স্নায়ু-উদ্দীপনা। অতএব, স্নায়ু-উদ্দীপনা একটি তড়িৎ-রাসায়নিক (Electro–chemical) প্রক্রিয়া। পোস্টসিনাপটিক ঝিল্লির ভেদ্যতার পরিবর্তন ঘটানোর পর এসিটাইলকলিন সিন্যাপটিক ক্লেফ্‌ট থেকে অপসারিত হয়। পোস্টসিনাপটিক ঝিল্লিতে অবস্থিত এসিটাইলকোলনেস্টারেজ (Acetylcholinasterase, AChE, সংক্ষেপে কলিনেষ্টারেজ) নামক এনজাইম এসিটাইলকোলিনকে বিশ্লিষ্ট করে কোলিন ও ইথানয়েক এসিড এসিটাইল এ পরিণত করে। এগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সিনাপটিক ক্লেফ্‌ট পেরিয়ে সিনাপটিক নবের কাছে পৌঁছালে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রিসিনাপটিক ঝিল্লি অতিক্রম করে নবের ভেতরে পুনঃপ্রবেশ করে। নবের ভেতরে মাইটোকণ্ড্রিয়া থেকে মুক্ত ATP-র সহায়তায় পুনরায় যুক্ত হয়ে সিনাপটিক ভেসিকলে জমা হয় এবং পুণঃব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে?
২। করোটিক স্নায়ু কাকে বলে?
৩। মোটর স্নায়ু কাকে বলে?
৪। উদ্দীপক বলতে কি বোঝ?
৫। সিনাপস্ কি?
৬। সুষুম্নাকাণ্ড কি?
৭। মিশ্র স্নায়ু বলতে কি বোঝ?
৮। হাইপোথেলামাস কাকে বলে?
৯। মস্তিষ্কের গহবর কয়টি?
১০। সিনাপস্ কত প্রকার ও কি কি?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।
২। মানুষের করোটিক স্নায়ুগুলোর নাম লেখ।
৩। সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
৪। সিনাপসের মাধ্যমে কীভাবে স্নায়ু-উদ্দীপনা পরিবাহিত হয় বর্ণনা কর।
৫। সিনাপসের কাজগুলো বর্ণনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

সংবেদী অঙ্গসমূহ

সংবেদী অঙ্গসমূহ (Sensory organs)

প্রত্যেক জীব নিজ নিজ পরিবেশ সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকে। সতর্ক না হলে নিজের এবং নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যাবে। নিম্নতম জীব থেকে উচ্চতম জীব মানুষ পর্যন্ত সবাই পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ। সংবেদন শক্তির মাধ্যমে জীব পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পারে। উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সংবেদন শক্তি বেশি সুগঠিত। কারণ এদের রয়েছে উন্নত স্নায়ুতন্ত্র ও সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র। **যে অঙ্গের মাধ্যমে আমরা বাহ্যজগত অনুভব করতে পারি, তাকে সংবেদী অঙ্গ বলে।** ত্বক, নাক, জিহ্বা, চোখ ও কান এই পাঁচটি হচ্ছে মানুষের সংবেদী অঙ্গ। সাধারণ ভাষায় এদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বলে। উন্নত স্নায়ুতন্ত্র, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গ নিয়ে মানুষ সর্বোতভাবে পৃথিবীর সেরা জীবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

সংবেদী অঙ্গ (Sensory organ)

মানুষ স্রষ্টার সমগ্র সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে অন্যান্য সকল জীবের নিয়ন্ত্রকের আসনে আসীন হয়েছে যে কারণে তা হলো- উন্নত স্নায়ুতন্ত্র, সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। আমরা বাহ্যজগৎ অনুভব করতে পারি সংবেদী অঙ্গসমূহের (Sensory organs) সহায়তায়। সংবেদী অঙ্গসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে ত্বকের কথা। কারণ মানুষের সমস্ত শরীর ঘিরে ত্বকের অবস্থান রয়েছে।

ত্বক (Skin)

মানবদেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অঙ্গ হলো ত্বক (Skin)। ত্বক দুই স্তর বিশিষ্ট যথা -

ক) ইপিডারমিস (Epidermis),

খ) ডারমিস (Dermis)।

ক) ইপিডারমিস ঃ ইপিডারমিসে বিভিন্ন ধরনের কোষ থাকে যেমন-

১) কিরাটিন কোষ (Kiratinocyte),

২) মেলানিন কোষ (Melanocyte),

৩) লেঙ্গারহেন কোষ (Langerhan's cell) ও

৪) মারকেল কোষ (Merkel cell)।

ইপিডারমিস আবার পাঁচ স্তরবিশিষ্ট, এই স্তরগুলো ডারমিসের বাহির দিকে অবস্থিত। যথা -

১। স্ট্রাটাম বেজালি (Stratum basale) : এই স্তর ডারমিসের উপরে থাকে।

২। স্ট্রাটাম স্পাইনোসাম (Stratum spinosum),

৩। স্ট্রাটাম গ্রানোলোসাম (Stratum granolosum),

৪। স্ট্রাটাম লুসিডাম (Stratum lucidum),

৫। স্ট্রাটাম কোরনিয়াম (Stratum corneum): এই স্তর সর্বাপেক্ষা বাহিরের স্তর।

ত্বকের (Skin) **প্রকারভেদ**

ত্বক দুই প্রকার, যথা ঃ- ক) পুরু ত্বক (Thick skin) এবং খ) সরু ত্বক (Thin skin)।

ক) পুরু ত্বক (Thick skin) ঃ হাতের তালু (Palms) এবং পায়ের পাতা (Soles) ত্বক পুরু। এখানে ইপিডারসিস (Epidermis) খুব পুরু হয়। বিশেষভাবে স্ট্রাটাম কোরনিয়াম (Stratum corneum) পুরু ত্বকে অসংখ্য ঘর্ম গ্রন্থি (Sweat glands) থাকে।

খ) সরু ত্বক (Thin skin) ঃ দেহের বাকি অংশে সরু ত্বক থাকে। এতে লোমকুপ (Hair follicles), ঘর্ম গ্রন্থি (Sweat glands), তৈল গ্রন্থি (Sebaceous glands) থাকে।

ত্বকের কাজ ঃ

- ত্বক দেহের সব অঙ্গকে রক্ষা করে। দেহের বেশি চামড়া পুড়ে গেলে মানুষ মারা যায়।
- ত্বকের মাধ্যমে সাধারণ অনুভতি অনুভব করা যায়।
- ত্বক দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ত্বক ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা কমিয়ে দেয়।
- ত্বক দেহ থেকে ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে দেহে পানির সমতা রক্ষা করে।
- ত্বকের মাধ্যমে দেহের নানা বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে যায়। যেমন – ইউরিক অ্যাসিড, ক্লোরাইড, এ্যামোনিয়া, সালফেট, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদি।
- ত্বকে মেলানিনের তারতম্যের জন্য ত্বকের রং ও লাবন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- ত্বক সূর্যের আলোর সংস্পর্শে ভিটামিন-ডি উৎপন্ন করে।
- ত্বক মানবদেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।

নাক (Nose)

মানুষের এই অঙ্গটি মুখমন্ডলের সামনের দিকে, দুই চোখের মধ্যস্থল থেকে শুরু করে উপরের ঠোঁটের সামান্য উপর পর্যন্ত অবস্থিত। চোখের কাছের অংশটি নিচু ও অপ্রশস্ত এবং ঠোঁটের কাছের অংশটি প্রশস্ত এবং উঁচু। নাকের গোড়ার অংশটি অস্থি গঠিত এবং সামনের অংশটি কোমলাস্থি দ্বারা গঠিত। নাকের ভেতর নাসিকা গহ্বর (Nasal cavity) অবস্থিত।

নাক একটি প্রায় ত্রিকোণাকার বা পিরামিড আকৃতির দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম অঙ্গ। নাকের অগ্রদিকে অক্ষীয় নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রদ্বয়কে বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র বা নাসিকা ছিদ্র বলে। নাসিকা ছিদ্রের পরের অপ্রসস্ত গহ্বরকে নাসাপথ বা কোয়ানা বা নাসিকা গহ্বর বলে। এটা সন্মুখে নাসারন্ধ্র হতে নাসা-গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিটি নাসারন্ধ্র প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা ও আধা ইঞ্চি চওড়া ডিম্বাকৃতির ছিদ্র বিশেষ। এর সামনের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমে আবৃত এবং পিছনের দিকে শ্লেষ্মাঝিল্লি (Mucous membrane) দ্বারা আবৃত। একটি পাতলা

মানুষের নাক

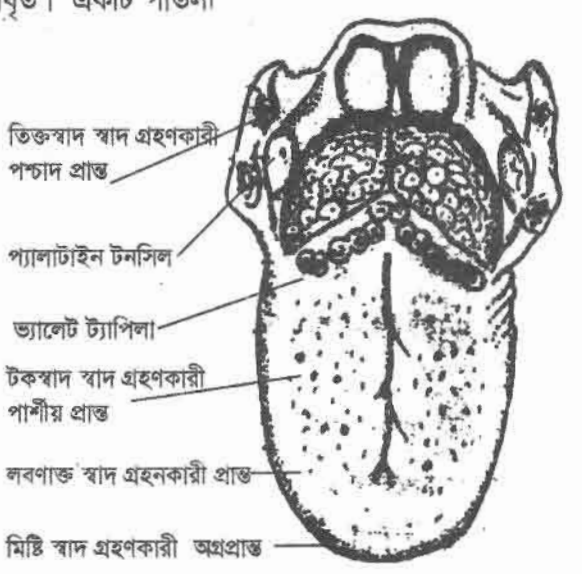

মানুষের জিহ্বা

প্রাচীর দ্বারা নাসাপথ দুইভাগে বিভক্ত। এর প্রাচীর সিলীয় এপিথেলিয়ামে আবৃত, মিউকাস-ঝিল্লি বেষ্টিত এবং রক্তবাহিকা ও স্নায়ুপ্রান্তসমৃদ্ধ। নাসা গহবরের উপরের অংশের মিউকাস ঝিল্লি সংবেদী অলফ্যাক্টরি কোষযুক্ত। নাসাপথের প্রাচীরের উভয় দিকে তিনটি করে পাতলা অস্থি থাকে। এগুলি যথাক্রমে ক) উধর্ষ্ক, খ) মধ্য ও গ) নিম্ন কঙ্কা নামে পরিচিত। কঙ্কাগুলো নাসিকা গহ্বরকে উধর্ষ্ক, মধ্য ও নিম্ন মিয়েটাসে বিভক্ত করে। ভেতরের দিকে নাসাপথ বা কোয়ানার শেষ প্রান্তে একজোড়া ছিদ্র আছে। এগুলোকে অন্তঃনাসারন্ধ্র বলে। অন্তঃনাসারন্ধ্র নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয়।

নাকের কাজ

- সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ শনাক্তকরণের মাধ্যমে পরিবেশ ও খাদ্যদ্রব্যের গ্রহনযোগ্যতা বিশ্লেষণ করা।
- প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশে সাহায্য করা।
- প্রশ্বাস বায়ুতে যে সব ধুলিকণা, রোগজীবাণু, ক্ষতিকর গ্যাস থাকে লোম, শ্লেস্মঝিল্লি ও স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে সেগুলোকে যথাক্রমে ছাঁকনির মত আটকে রাখা এবং মস্তিষ্কে স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ করা।

জিহবা (Tongue)

মানুষের মুখ গহ্বরের নিম্নাংশে একটি মাংসল চঞ্চল অঙ্গ থাকে তাকে জিহ্বা বলে। জিহ্বার গোড়া প্রশস্ত এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎ প্রান্তে নিচের চোয়ালের সাথে সংযুক্ত থাকে। জিহ্বার সামনের প্রান্ত ক্রমশ সরু। জিহ্বায় প্রচুর স্বাদ কোরক (Taste buds) থাকে। মানুষ জিহ্বার সাহায্যে খাদ্য বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে। কথা বলা এবং খাদ্যবস্তুকে চূর্ণ করার কাজে জিহক্ষার সহায়তা প্রয়োজন হয়। কোনভাবে জিহ্বার কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে কথা বলা ও খাদ্য গ্রহণে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সুতরাং জিহ্বার গুরুত্ব অপরিসীম।

জিহ্বার দুটি অংশ, যথা -

ক) দেহ (Body),

খ) মূল (Root or base)।

জিহ্বার দেহ অংশটি চলনশীল এবং মুখবিবরে থাকে। মূল অংশটি মুখবিবরের পাদদেশে আটকানো থাকে।

জিহক্ষার কাজ :

- খাদ্যবস্তু চর্বনে সহায়তা করা।
- খাদ্যবস্তু গলাধকরণে সহায়তা করা।
- জিহবা কথা বলতে সহায়তা করে।
- খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণে জিহবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের চোখ (Human Eye)

যে জ্ঞানেন্দ্রিয় আলোকের মাধ্যমে দৃষ্টি সঞ্চার করে তাকে চোখ বলে। মানুষের চোখ দুটি মাথার দুপার্শ্বে বহিঃকর্ণ ও নাসারন্ধ্রের প্রায় মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। চোখ গোলাকার অক্ষিগোলক (Eye ball) এ গঠিত। কয়েকটি আনুষঙ্গিক অঙ্গও চোখের সাথে জড়িত। চোখের মাত্র ১/৬ অংশ বাইরে উন্মোচিত, বাকি ৫/৬ অংশই কোটরের ভেতরে অবস্থান করে। চোখের পর্দায় অবস্থিত ক্ষুদ্র গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসে চোখ সিক্ত থাকে। মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- অক্ষিগোলক (Eye ball) আনুষঙ্গিক অংশ (Accessory parts)। নিচের ছকে চোখের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো।

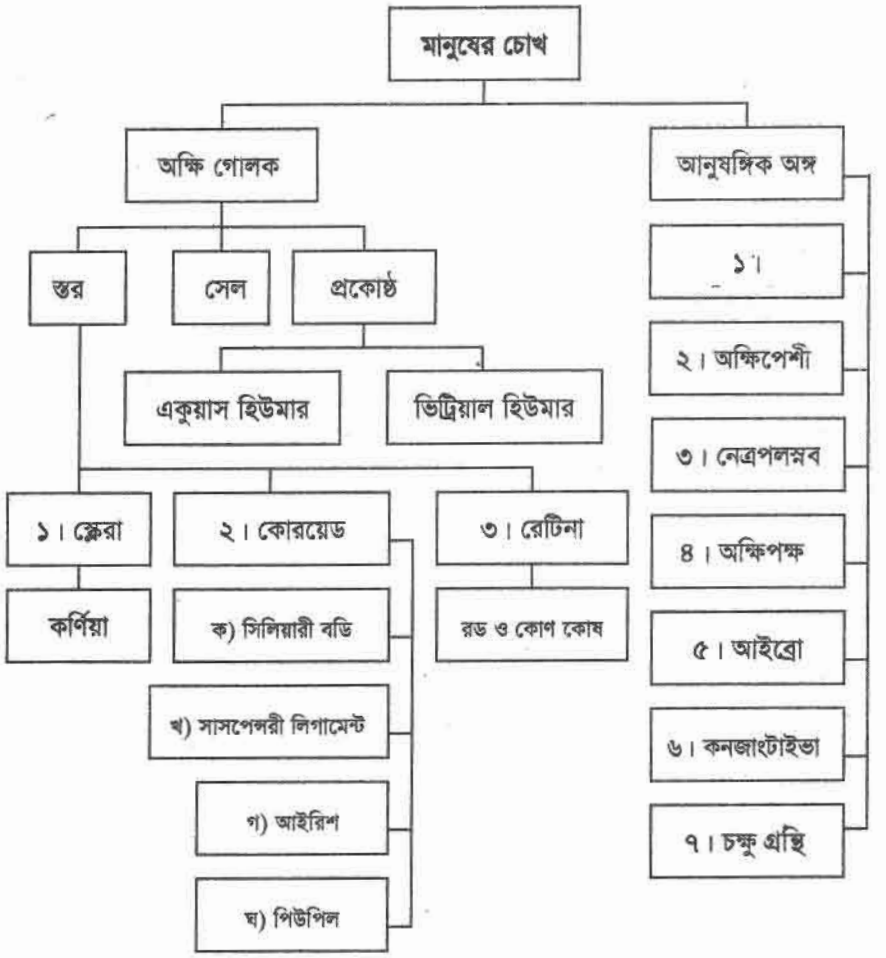

নিচে মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

অক্ষিগোলক (Eye ball) ঃ মানুষের চোখ দেখতে গোল বলের মতো হওয়ায় এগুলো অক্ষিগোলক নামে পরিচিত। প্রত্যেক গোলক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত।

ক) অক্ষিগোলকের স্তর,
খ) লেন্স ও
গ) প্রকোষ্ঠ।

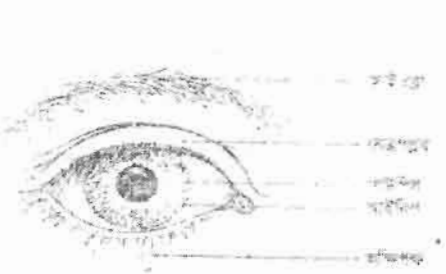

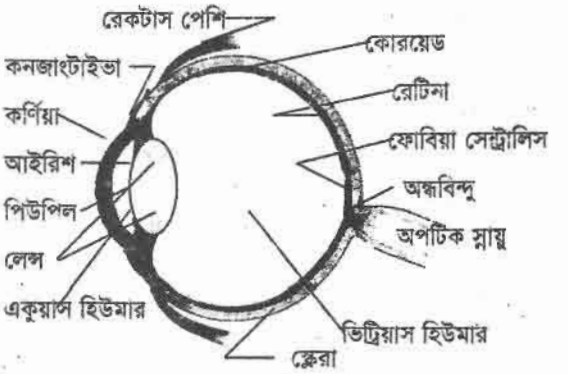

অক্ষিগোলক

ক) অক্ষিগোলকের স্তর

১। স্ক্লেরা (Sclera) বা স্ক্লেরোটিক স্তর (Sclerotic layer) ঃ এটি অক্ষিগোলকের বাইরে সাদা, অসচ্ছ ও তন্তুময় স্তর। অস্বচ্ছ হলেও চোখের সামনের দিকে খুব পাতলা ও স্বচ্ছ পর্দায় পরিণত হয়েছে। স্বচ্ছ পর্দাটির নাম কর্ণিয়া (Cornea)। কর্ণিয়াটি পুনরায় আরও একটি পাতলা স্বচ্ছ পর্দা বা কনজাংটাইভায় (Conjuntiva) আবৃত।

অক্ষিগোলকের কাজ ঃ

- স্ক্লেরা চোখের আকৃতি রক্ষা করে, চোখকে সংরক্ষণ করে ও পেশি সংযুক্ত রাখে।
- কর্ণিয়ার মাধ্যমে চোখের ভেতর আলো প্রবেশ করে।
- কনজাংটাইভা চোখকে ধুলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে।

২। **কোরয়েড** (Choroid) ঃ এটি স্ক্লেরার নিচে অবস্থিত রক্তবাহিকা সমৃদ্ধ ও মেলানিন রঞ্জকে রঞ্জিত স্তর। মেলানিন রঞ্জক থাকায় এটি কালো দেখায়।

কোরয়েডের কাজ ঃ

- রঞ্জক পদার্থ চোখের ভেতরে আলোর প্রতিফলনকে হ্রাস করে।
- রক্ত বাহিকাগুলো চোখের কোষে পুষ্টি জোগায়, অক্সিজেন সরবরাহ করে ও বর্জ্য অপসারণ করে।

ক) **সিলিয়ারি বডি** (Ciliary body) ঃ আইরিশ ও কোরয়েডের সংযোগস্থলে অবস্থিত স্থূল বলয়াকৃতি অংশকে সিলিয়ারি বডি বা সিলীয় অঙ্গ বলে। এটি সিলীয় বলয় (Ciliary ring), সিলীয় প্রবর্ধক (Ciliary processes) ও সিলীয় পেশি (Ciliary muscles) দিয়ে গঠিত। চোখের লেন্স সাসপেন্সরি লিগামেন্ট (Suspensory ligament) দিয়ে সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত থাকে।

সিলিয়ারি বডির কাজ ঃ

- সিলীয় পেশিগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়।
- সিলিয়ারি বডি একুয়াস হিউমারও উৎপন্ন করে।

খ) **সাসপেন্সরি লিগামেন্ট** (Suspenory ligament) ঃ লেন্সের চতুর্দিক বেষ্টনকারী লিগামেন্টকে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট বলে। লিগামেন্টের অপর প্রান্ত সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত থাকে।

সাসপেন্সরি লিগামেন্টের কাজ ঃ

- সাসপেন্সরি লিগামেন্ট দিয়ে লেন্সটি যথাস্থানে অবস্থান করে এবং সিলিয়ারি বডির সাথে সংযুক্ত থাকে ।

গ) **আইরিশ** (Iris) ঃ কর্ণিয়ার পেছনে কোরয়েডের বাড়ানো অস্বচ্ছ, গোল ও মধ্য-ছিদ্রযুক্ত কালো রঙের পর্দাটি আইরিশ। এটি কর্ণিয়ার পেছনে ও লেন্সের সামনে অবস্থিত এবং দুধরনের অনৈচ্ছিক পেশিতে গঠিত।

আইরিশের কাজ ঃ

- আইরিশ পেশির সংকোচন-প্রসারণ পিউপিলকে বড় ও ছোট করে, ফলে লেন্সে পরিমিত আলোর প্রবেশ নিশ্চিত হয়।

ঘ) **পিউপিল** (Pupil) ঃ আইরিশের মধ্যস্থলে পিউপিল নামক একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রকে ঘিরে বৃত্তাকার ও অরীয় পেশি অবস্থিত। আলোকের তীব্রতা অনুযায়ী অরীয় ও বৃত্তাকার পেশির সংকোচন ও প্রসারণের সাহায্যে পিউপিলটি প্রয়োজন মতো ছোট বা বড় করা যায়। অরীয় পেশি প্রসারিত হলে এবং বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হলে পিউপিল ছোট হয় এবং অরীয় পেশি সংকুচিত হলে ও বৃত্তাকার পেশি প্রসারিত হলে পিউপিল বড় হয়ে অক্ষিগোলকের ভেতরে আলোকের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। পিউপিলের মধ্য দিয়ে চোখে আলোক প্রবেশ করে।

পিউপিলের কাজ ঃ

- মৃদু আলোকে পিউপিল বড় হয় এবং উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে পিউপিল ছোট হয়।

৩। **রেটিনা** (Retina) ঃ এইটি কোরয়েডের নিচে অবস্থিত এবং একমাত্র আলো-সংবেদী অংশ। এতে দুই ধরনের আলো-সংবেদী কোষ আছে, যথা ঃ রড ও কোণ কোষ। রডকোষগুলো লম্বাটে ও রোডপসিন নামক প্রেটিনযুক্ত। কোণকোষগুলো কোণাকৃতি ও আয়োডপসিন নামক প্রোটিনযুক্ত। চোখে রডকোষ ও কোণকোষের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় বার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ এবং সত্তর লক্ষ। কোণকোষগুলো উজ্জ্বল আলোতে দর্শণের জন্য, রঙিন বস্তু দর্শণের জন্য এবং ছবির সঠিক বিশ্লেষণের জন্য উপযোগী। রডকোষগুলি অনুজ্জল আলোতে (Dim light) দর্শনের উপযোগী। তিন প্রকারের কোণকোষ আছে বলে মনে করা হয়। প্রথম ধরনের কোণকোষ লাল রং, দ্বিতীয় ধরন সবুজ রং এবং তৃতীয় ধরন নীল রঙের জন্য। তিন ধরনের কোষের সকলেই সমভাবে উদ্দীপিত হলে সাদা রং দৃষ্ট হয়।

রেটিনার কাজ ঃ

- রেটিনা বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।

অন্ধবিন্দু (Blind spot) ঃ এক্সনগুলো অক্ষিগোলকের যে বিন্দুতে মিলিত হয়ে অপটিক স্নায়ু গঠন করে তাকে অন্ধবিন্দু বলে। ঐ স্থানে কোন রডকোষ বা কোণকোষ থাকে না, তাই আলোক সংবেদী নয়।

ফোবিয়া সেন্ট্রালিস (Fovea centralis) ঃ অন্ধবিন্দুর কাছাকাছি রেটিনার একটি অংশে প্রচুর কোণকোষ দেখা যায়, রডকোষ থাকে না। এই অংশকে পীতবিন্দু (Yellow spot) বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিস বলে।

ফোবিয়া সেন্ট্রালিসের কাজ ঃ

- এটি অতিরিক্ত আলো সংবেদী, তাই এখানে সবচেয়ে ভালো প্রতিবিম্ব তেরি হয়।

অপটিক স্নায়ু ঃ গ্যাংগ্লিওনিক নিউরনের এক্সনগুলো একত্রিত হয়ে অপটিক স্নায়ু তৈরি করে।

অপটিক স্নায়ুর কাজ ঃ

- রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক পৌছে।

খ) **লেন্স** (Lens) ঃ

এইটি পিউপিলের পেছনে অবস্থিত ও সিলেয়ারি বডির সাথে সাসপেন্সরি লিগামেন্টযুক্ত হয়ে ঝুলে থাকা একটিস্বচ্ছ স্থিতিস্থাপক ও দ্বিউত্তল চাকতি বিশেষ। লেন্সতন্তু (Lens fibres- নিউক্লিয়াস বিহিন সরু লম্বা কোষ) লেন্সের

পেছনের চেয়ে সামনের দিক বেশি চাপা, নরম ও কিছুটা হলুদ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটি আরো চাপা হলদে ও দৃঢ় হয়, ফলে এর স্থিতিস্থাপকতা করে যায়। লেন্সে রক্ত সরবরাহ নেই। সিলীয় পেশার সংকোচন-প্রসারণে লেন্সও প্রসারিত হয়। লেন্সের সাহায্য আলোক রশ্মি বক্রতা প্রাপ্ত হয়ে রেটেনায় নিক্ষিপ্ত হয়।

লেন্সের কাজ

- লেন্সের মাধ্যমে বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি রেটিনার নির্দিষ্ট অংশে প্রতিফলিত হয়।

গ) অক্ষিগোলকের গহবর বা প্রকোষ্ঠ (Chambers)

অক্ষিগোলকে তরল পদার্থপুর্ণ তিনটি গহবর আছে প্রথম গহবর কর্ণিয়া ও আইরিশ, দ্বিতীয় গহ্বর আইরিশ ও লেন্স এবং তৃতীয় গহ্বর লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। প্রথম দুটি গহবর স্বচ্ছ ও পানির মতো তরল একুয়াস কোষ (Aqueous humour)- এ পূর্ণ থাকে। তৃতীয় গহ্বরটি সবচেয়ে বড় (অক্ষিগোলকের প্রায় ৮০%) এ গহ্বরে ভিট্রিয়ার্স হিউমার (Vitreous humour) নামক জেলীর মতো তরল পদার্থে পূর্ণ। ভিট্রিয়াস হিউমার প্রকৃতপক্ষে ডিমের সাদা অংশের মতো ঘন কিন্তু স্বচ্ছ। ৯৯% পানি এবং ১% কোলাজেন ও হায়াল্যুরেনিক অ্যাসিড (Hyaluronic acid) - এ ভিট্রিয়াস হিউমার গঠিত।

অক্ষিগোলকের গহ্বরের কাজ ঃ

- একুয়াস হিউমার আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে। চোখের সম্মুখ অংশের আকৃতি ঠিক রাখে এবং লেন্স ও কর্ণিয়ায় পুস্টি জোগায়। ভিট্রিয়াস হিউমার রেটিনার দিকে আলোর সম্মুখ অংশের আকৃতি ঠিক রাখে এবং লেন্স ও কর্ণিয়ায় পুষ্টি জোগায়। ভিটিঞ্রয়াস হিউমার রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে এবং অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।

চোখের আনুষঙ্গিক অংশ (Accessory parts of eye)

নিম্নোক্ত অংশগুলো নিয়ে চোখের আনুষঙ্গিক অংশ গঠিত।

১) **অক্ষিকোটর** (Orbit) ঃ মস্তক ও মুখমণ্ডলের অস্থি যে ক্ষীণ অক্ষিকোটরের প্রাচীর নির্মাণ করে সেটি পরিবেষ্টিত ফাঁপা গর্তটি অক্ষিকোটর।

অক্ষিকোটরের কাজ ঃ

- এতে অক্ষিগোলক সুরক্ষিত থাকে।

২) **অক্ষিপেশি** (Eye muscles) ঃ তিনজোড়া বিপরীতধর্মী অক্ষিপেশি দিয়ে প্রতিটি অক্ষিগোলক অক্ষিকোটরের সাথে যুক্ত থাকে, যথা– (ক) সুপরিয়র রেক্টাস, (খ) ইনফিরিয়র রেক্টাস, (গ) ইন্টার্নাল রেক্টাস, (ঘ) এক্সটার্নাল রেক্টাস, (ঙ) ইন্টার্নাল অবলিক এবং (চ) এক্সটার্নাল অবলিক।

অক্ষিপেশি কাজ ঃ এ পেশিগুলো চোখকে অক্ষিকোটরের স্বস্থানে আটকে রাখে এবং অক্ষিগোলককে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে সাহায্য করে।

৩) **নেত্র পল্লব** (Eye lids) ঃ প্রত্যেক চোখের উপরে ও নিচে রোমযুক্ত পেশল পাতার মতো দুটি পর্দা থাকে। উপরেরটি উধর্ষ্ক নেত্রপল্লব ও নিচেরটি নিম্ন নেত্রপল্লব।

নেত্র পল্লবের কাজ ঃ

এগুলি ধুলাবালি, তীব্র আলো, পানি ও বাতাস থেকে চোখকে রক্ষা করে।

৪) **অক্ষিপক্ষ** (Eye lash) : চোখের পাতার লোমকে অক্ষিপক্ষ বলে।

অক্ষিপক্ষের কাজ ঃ

- উড়ন্ত কিট–পতঙ্গ ধুলাবালিকে চোখে প্রবেশে বাধা দেয়।

৫) **আই ব্রো** (Eye brow) ঃ চোখের পাতার উপর অংশের লোমকে আইব্রো বলে।

আই ব্রোর কাজ ঃ

- কপাল থেকে গড়িয়ে আসা ঘাম প্রতিহত করে।

৬) **কনজাংটাইভা** (Conjunctiva) ঃ নেত্রপল্লবের ভেতরের অংশ স্ক্লেরার অগ্রাংশ এবং কর্ণিয়ার সম্মুখ অংশ যে স্বচ্ছ পাতলা মিউকাস স্তরে আবৃত থাকে তা কনজাংটাইভা।

কনজাংটাইভার কাজ ঃ

- এইটি ধুলাবালি থেকে চোখকে রক্ষা করে।

৭) **চক্ষুগ্রন্থি** ঃ প্রত্যেক চোখে ৩ ধরনের গ্রন্থি থাকে, যথা :- ক) **অশ্রুগ্রন্থি** (Lacrimal glands), খ) **হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি** (Harderian glands) এবং গ) **মেবোমিয়ান গ্রন্থি** (Meibomian glands)।

চক্ষুগ্রন্থির কাজ ঃ

- হার্ডেরিয়ান ও মেবোমিয়ান গ্রন্থির তৈলাক্ত ক্ষরণ নেত্রপল্লব ও কর্ণিয়াকে পিচ্ছিল রাখে।
- অশ্রুগন্থি নিঃসৃত অশ্রু মানে এক ধরনের লবণাক্ত ও জীবানুরোধক তরল পদার্থ যা লাইসোজাইম এনজাইম বহন করে।
- অশ্রু কনজাংটিভা নরম, সিক্ত, পরিছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখে।

প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া

চোখের পাতা (নেত্রপল্লব) যখন খোলা থাকে তখন বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি ক্রমান্বয়ে কর্ণিয়া, একুয়াস হিউমার, পিউপল, লেন্স ও ভিট্রিওয়াস হিউমার এর মধ্য দিয়ে রেটিনায় এসে পড়ে। আপতিত আলোকরশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিসৃত হয়ে রেটিনার ফোবিয়া সেন্ট্রালিসের (পীত বিন্দুর) উপর একগুচ্ছ অভিসারী রশ্মিরূপে প্রতিফলিত হয়। ফলে, রেটিনার উপর বস্তুটির সংক্ষিপ্ত ও উল্টো প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। রেটিনার আলোকসংবেদী রড এবং কোণ কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে এ আলো অনুভূতি মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় অজ্ঞাত উপায়ে উল্টো প্রতিবিম্ব সোজা হয়ে যায়, ফলে মানুষ বস্তুটিকে সোজা দেখতে পায়।

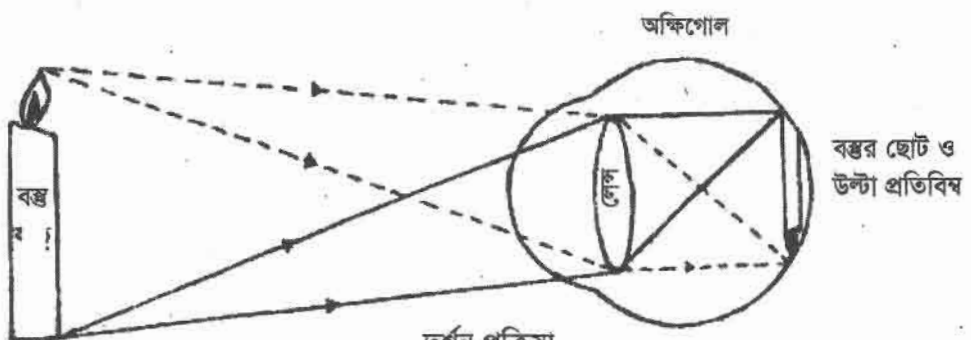

দর্শন প্রক্রিয়া

উপযোজন (Accommodation)

প্রাণি যখন কোনো জায়গায় বদল না করে অর্থাৎ বস্তু ও চোখের মধ্যকার দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখেই যে কোনো দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে সমান স্পষ্ট দেখার জন্য চোখে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটায় তখন ঐ প্রক্রিয়াকে উপযোজন বলে। মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণিতে উপযোজন একটি বৈশিষ্ট্য। লেন্সের বক্রতার পরিবর্তন, চোখ দুইটি পরস্পরের দিকে সমকেন্দ্রীকরণ ও পিউপলের সংকোচন এ তিনটি মাধ্যমে উপযোজন সম্পন্ন হতে পারে।

দ্বিনেত্র দৃষ্টি (Binocular vision) বা স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি (Streioscopic vision) ঃ মানুষের দৃষ্টিকে দ্বিনেত্র দুষ্টি বলে। কারণ আমরা কোনো দৃশ্যযোগ্য বস্তু একই সাথে দুচোখের সাহায্যে এককভাবে দেখতে পাই। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হলে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে একটি মাত্র প্রতিবিম্বে একত্রীভূত হয়, ফলে আমরা দুইচোখে একটি বস্তুকে এককভাবে দেখতে পাই। মানুষের চোখ দুটি মাথার সামনে ৬.৩ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্তিত। ফলে কোনো বস্তু দেখার সময় প্রত্যেক চোখ বস্তুটির একটি করে প্রতিবিম্ব তৈরি করে। প্রতিবিম্ব দুটির একটি থেকে অন্যটি কিছুটা আলাদা। উভয় উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। মস্তিষ্ক দুটি উদ্দীপনাকে সমন্বয় সাধন করে। ফলে বস্তুর একটি ত্রিমাত্রিক (Three dimensional) চিত্র দেখা যায়।

দ্বিনেত্র দৃষ্টির শর্ত ঃ দ্বিনেত্র দৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১) অক্ষিপেশিকে নির্দিষ্ট বস্তুতে নিবদ্ধ করার জন্য অক্ষিপেশিকে সঠিকভাবে সংকুচিত হতে হবে।
২) দুচোখের রেটিনায় সদৃশ বিন্দুর উপস্থিতি থাকতে হবে।
৩) দুচোখের রেটিনায় প্রায় একই রকম প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হতে হবে।
৪) দুটি বীক্ষণ ক্ষেত্রকে এক জায়গায় পরস্পর মিলে যেতে হবে।

দ্বিনেত্র দুষ্টির সুবিধা ঃ দ্বিনেত্র দৃষ্টির সুবিধাগুলো হলো :

১) দুচোখের বিক্ষণ ক্ষেত্র এক চোখের একক বিক্ষণ ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়।
২) এক চোখে ত্রুটি থাকলে অন্য চোখ তা সংশোধন করে নিতে পারে।
৩) কোনো বস্তুর আকৃতি, দূরত্ব ও গভীরতার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

চোখের অংশ	অবস্থান	প্রধান কাজ
১। কর্ণিয়া	অক্ষিগোলকের সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তরের ১/৬ অংশ স্বচ্ছ এবং কোটরের বাইরে অবস্তিত।	ক) প্রতিসারক মাধ্যমরূপে কাজ করে। খ) আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে।
২। স্ক্লেরা	অক্ষিগোলকের বহিরাবরণীর ৫/৬ অংশ অক্ষিকোটরে অবস্থিত।	ক) অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। খ) চোখকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।
৩। কোরয়েড	অক্ষিগোলকের মধ্যবর্তী স্তরটির প্রায় ৫/৬ অংশ এবং এটি রঞ্জক পদার্থযুক্ত।	ক) অক্ষিগোলকে বিচ্ছুরিত আলোকের প্রতিফলন রোধ করে। খ) অক্ষিগোলকের পুষ্টি প্রদান করে।
৪। আইরিশ	কর্ণিয়া এবং লেন্সের মাঝে একুয়াস হিউমারে ঝুলন্ত একটি পাতলা গোলাকার সংকোচনশীল, মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত চাকতি বিশেষ।	পিউপিলের ছিদ্র ছোট–বড় করে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

চোখের অংশ	অবস্থান	প্রধান কাজ
৫। সিলিয়ারী বডি	স্থূল পেশিস্তর লেন্সকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান করে।	লেন্সের উপযোজনে সহায়তা করে।
৬। রেটিনা	অক্ষিগোলকের একেবারে ভেতরের স্নায়ুসমৃদ্ধ আবরণ।	বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
৭। লেন্স	আইরিশের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত দ্বি–উত্তল বৃত্তাকার চাকতি।	ক) আলোর প্রতিসরণ ঘটায়। খ) আলোক রশ্মিকে রেটিনার উপর কেন্দ্রীভূত করে।
৮। পিউপিল	আইরিশের মাঝখানে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশেষ।	এর মাধ্যমে চোখে আলোক রশ্মি প্রবেশ করে।
৯। কনজাংটাইভা	কর্ণিয়ার বাইরে অবস্থিত পাতলা শ্লেষ্মাস্তর বিশেষ ।	কর্ণিয়াকে রক্ষা করে।
১০। অন্ধবিন্দু	রেটিনা ও অপটিক স্নায়ুর মিলনস্থলে অবস্থিত ।	অন্ধবিন্দুতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না।
১১। ফোবিয়া সেন্ট্রালিস	পিউপিলের বিপরিত দিকে রেটিনার উপর অবস্থিত।	বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি এখানেই সবচেয়ে ভালো হয় ।
১২। রড কোষ	রেটিনায় অবস্থিত।	মৃদু আলো শোষণ করে।
১৩। কোণ কোষ	রেটিনায় অবস্থিত।	উজ্জল আলো ও বর্ণ শোষণ করে।
১৪। একুয়াস হিউমার	কর্ণিয়া ও লেন্সের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থিত ।	ক) লেন্সের পুষ্টি যোগায়। খ) বিবর্ধক মাধ্যমরূপে কাজ করে।
১৫। ভিট্রিয়াস হিউমার	লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত।	ক) রেটিনা দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে খ) অক্ষিগোলকে আকৃতি বজায় রাখে
১৬। অশ্রু গ্রন্থি	চোখের বহিঃকোণের ঠিক উপরে ছোট পটল আকৃতি কিংবা অনেকটা খোলসযুক্ত বাদামের মতো গ্রন্থি।	ক) অশ্রুক্ষরণ করে চোখকে আর্দ্র রাখা অর্থাৎ শুষ্কতা হতে রক্ষা করা। খ) চোখের মধ্যে প্রবিষ্ট ক্ষতিকারক জীবনু ধ্বংস করা।

মানুষের কান (Human Ear)

কান এমন এক বিশেষ ইন্দ্রিয় যা একাধারে শ্রবণ ও দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। মানুষের মাথার দুইপাশে ও চোখের পেছনে করোটির শ্রুতিকোটরে দুটি কান অবস্থান করে। মানুষের কান ৩টি অংশে বিভক্ত। যথা -

ক) বহিঃকর্ণ (External ear), খ) মধ্যকর্ণ (Middle ear) ও গ) অন্তঃকর্ণ (Internal ear)।

ক) বহিঃকর্ণ (External ear)

বাইরের দিক থেকে এই অংশটি কানের প্রথম ভাগ এবং এই অংশ নিম্নোক্ত ৩টি অঙ্গ নিয়ে গঠিত

১) **কর্ণছত্র** (Pinna) ঃ কর্ণছত্র মাথার দুইপাশে অবস্থিত ও তরুণাস্থি নির্মিত কানের বাইরের প্রসারিত ও লোমশ অংশ। এর অভ্যন্তরে পেশিতন্তু থাকলেও মানুষ কান নাড়াতে পারে না। কোনো শব্দ ভালভাবে শোনার জন্য যে দিক থেকে শব্দ আসে সেদিকে মাথাসহ কানের ছিদ্রকে ঘোরাতে হয়।

কর্ণছত্রের কাজ ঃ

- শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে বহিঃঅডিটরি মিটাসে প্রেরণ করা।

২) **কর্ণকূহর** (External auditory meatus) ঃ কর্ণছত্রের কেন্দ্রে কানের বহিঃছিদ্র থেকে যে সরু নালীপথ কানের টিমপেনিক পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত তার নাম কর্ণকূহর বা বহিঃঅডিটরি মিটাস। এর বাইরের দুই তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি দিয়ে এবং এক তৃতীয়াংশ অস্থিতে গঠিত। এটি মোমগ্রন্থি ও সূক্ষ্মরোমযুক্ত ত্বকে আবৃত।

কর্ণকূহরের কাজ ঃ

- এর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ লম্বভাবে টিমপেনিক পর্দায় পৌছে।
- এতে অবস্থিত মোম ও লোম কানের ভেতরে ধুলোবালি প্রবেশে বাধা দেয় এবং জীবাণু নাশ করে।
- টিমপেনিক পর্দার অনুকূল উষ্ণ ও আদ্রতা বজায় রাখে।

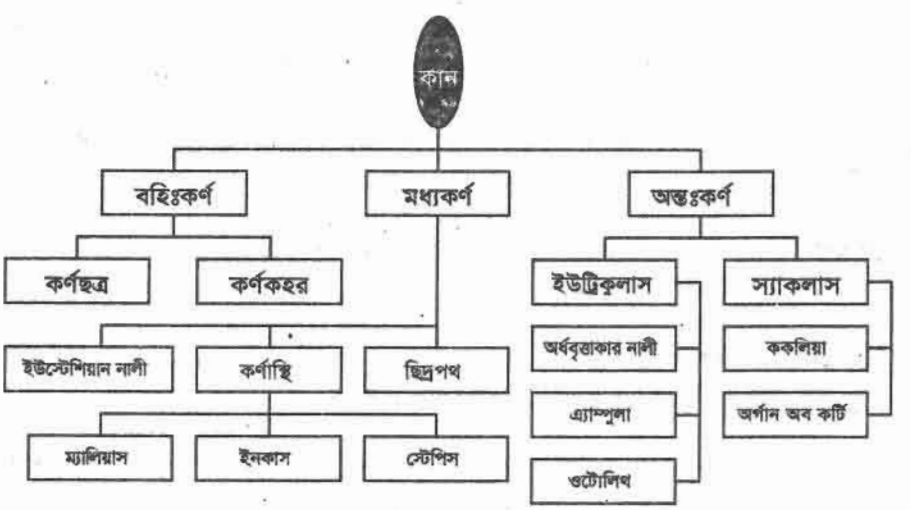

কানের অঙ্গসমূহের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস

৩) **কর্ণপটহ** (Tympanic membrane) ঃ কর্ণকূহরের শেষ প্রান্তে এবং মধ্যকর্ণের মুখে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ডিম্বাকার, স্থিতিস্থাপক পর্দাকে কর্ণপটহ বা টিমপেনিক পর্দা বলে। এর বাইরের দিক অবতল এবং ভেতরের দিক উত্তল। এর সাথে মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস অস্থি যুক্ত থাকে।

কর্ণপটহের কাজ ঃ

- বহিঃকর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে পৃথক রাখে।
- শব্দতরঙ্গে কেপে উঠে এবং শব্দতরঙ্গকে সমতলে মধ্যকর্ণে পরিবাহিত করে।

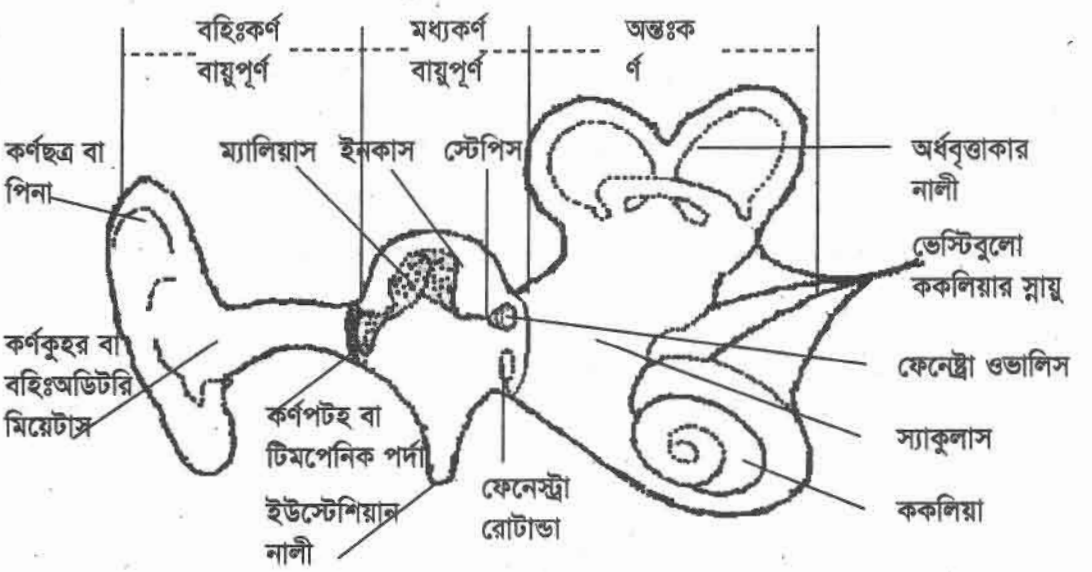

মানুষের কানের গঠন

খ) মধ্যকর্ণ (Middle ear) ঃ

মধ্যকর্ণ একটি অসম আকৃতির বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ বিশেষ এবং করোটির টিমপেনিক বুলা-র ভেতর অবস্থিত। নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে মধ্যকর্ণ গঠিত হয়।

১) **ইউস্টেশিয়ান নালী** (Eustachian canal) ঃ মধ্যকর্ণের অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত এটি একটি সরু নালী বিশেষ।

ইউস্টেশিয়ান নালীর কাজ ঃ

- টিমপিনিক পর্দার উভয় পাশের বায়ুর চাপ সমান রাখা।

২) **কর্ণাস্থি** (Ear ossicles) ঃ এইগুলো মধ্যকর্ণের গহবরে অবস্থিত পরস্পর পেশি দিয়ে যুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সাজানো ৩টি ছোট অস্থি। অস্থি তিনটি হচ্ছে :

ক) **ম্যালিয়াস** (Malleus) ঃ হাতুড়ির মতো দেখতে এ অস্থি একদিকে টিমপেনিক পর্দার সাথে অন্যদিকে পরবর্তী অস্থি ইসকাস এর সাথে যুক্ত।

খ) **ইনকাস** (Incus) ঃ এটি দেখতে নেহাই (Tobaco pipe) -এর মতো। এটা ম্যালিয়াস ও স্টেপিসকে যোগ করে।

গ) **স্টেপিস** (Stapes) ঃ ত্রিকোণা এই অস্থিটি একদিকে ইসকাসের সাথে অন্যদিকে, ফেসেস্ট্রা ওভালিস নামে ছিদ্রের গায়ে বসানো থাকে।

কর্ণাস্থিগুলোর কাজ ঃ

- অস্থিগুলো বহিঃকর্ণের টিমপেনিক পর্দা থেকে শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে বহন করে।

৩) **ছিদ্রপথ** ঃ মধ্যকর্ণের প্রাচীর পেরিওটিক অস্থিতে গঠিত, তবে সেখানে দুটি ছোট ছিদ্রপথ থাকে। উপরের দিকে ডিম্বাকার ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা ওভালিস এবং নিচের দিকের গোল ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রো রোটণ্ডা বলে।

ছিদ্রপথের কাজ

- ফেনেস্ট্রা ওভালিসের মাধ্যমে শব্দ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে।
- শব্দতরঙ্গ ককলিয়ায় প্রবেশের পর অবশেষে ফেনেস্ট্রা রোটাণ্ডার মাধ্যমে বাইরে চলে আসে।

গ) **অন্তঃকর্ণ** (Internal ear)

প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ করোটির শ্রুতিকোটরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণের প্রধান অংশ মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ (Membranus Labyrinth)। এটি অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ (Bony labyrinth) এ পরিবেষ্টিত। মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ এণ্ডোলিম্ফ (Endolymph) নামক তরলে এবং অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ পেরিলিম্ফ (Perilymph) এ পূর্ণ থাকে। প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ দুইটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত-

১) ভারসাম্য অঙ্গ বা ইউট্রিকুলাস (Utriculus) এবং
২) শ্রবণ অঙ্গ বা স্যাকুলাস (Sacculus)

১) **ভারসাম্য অঙ্গ বা ইউট্রিকুলাস** : এইটি অন্তঃকর্ণের উপরদিকের গোল প্রকোষ্ঠ। ইউট্রিকুলাসের সাথে দুটি উল্লম্ব এবং অনুভূমিকভাবে অবস্থিত মোট ৩টি অর্ধবৃত্তাকার নালী থাকে। নালীগুলো পরস্পর সমকোণে অবস্থিত। প্রত্যেক নালীর এক প্রান্ত স্ফীত হয়ে এম্পুলা (Ampulla) গঠন করে যার মধ্যে সংবেদী কোষ ও রোম থাকে। রোমগুলো চুনময় ওটোলিথ দানা সম্বলিত জেলীর মতো ক্যুপুলায় (Cupula) আবৃত।

ভারসাম্য অঙ্গের কাজ

- দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্কের সেরেবেলামকে সাহায্য করা এবং দেহ-অবস্থানের অনুভূতির উদ্রেক করে।

২) **শ্রবণ অঙ্গ বা স্যাকুলাস** ঃ এটি অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের প্রকোষ্ঠ যা অক্ষীয়দেশ থেকে প্রলম্বিত এবং শামুকের খোলকের মতো প্যাঁচানো একটি নালিকার সৃষ্টি করেছে। এটাকে ককলিয়া বলে। এটি তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ঃ

ক) উপরে পেরিলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা ভেস্টিবুলি,**
খ) মাঝে এণ্ডোলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা মিডিয়া** এবং
গ) নিচে পেরিলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা টিমপেনি**।

স্ক্যালা মিডিয়া উপরে রেসনার এর ঝিল্লি ও নিচে বেসিলার ঝিল্লিতে আবদ্ধ। বেসিলার ঝিল্লির উপরের কিছু এপিথেলিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে সংবেদী অর্গ্যান অব কর্টি গঠন করেছে। এগুলোর সংবেদী রোমও ক্যুপুলায় আবৃত। একেবারে শীর্ষে ককলিয়ার উর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠ একটি সরু নলাকার অংশের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত। এর নাম হেলিকোট্রিমা (Helicotrema)।

শ্রবণ অঙ্গের কাজ ঃ

- শ্রবণ অনুভূতি জাগানো।

ভেস্টিবুলো-ককলিয়ার স্নায়ুর শাখা এবং অন্তঃকর্ণের বিভিন্ন অংশের সংবেদী কোষগুলো যুক্ত হয়ে মস্তিষ্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

কানের প্রধান অংশগুলো অবস্থান ও কাজ

কানের অংশ	*অবস্থান*	*কাজ*
১। কর্ণছত্র বা পিনা	মস্তিষ্কের দুপাশে তরুনাস্থি নির্মিত কানের বাইরের প্রসারিত অংশ বিশেষ।	শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কর্ণকুহরে প্রবেশে সাহায্য করে।
২। কর্ণকুহর বা বহিঃঅডিটরি মিটাস	কর্ণছত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এটি কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নালী বিশেষ।	কর্ণপটহ পর্যন্ত শব্দতরঙ্গ প্রেরণ করে।
৩। কর্ণপটহ বা টিমপেনিক পর্দা	কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ ব্যবধায়ক পর্দা বিশেষ।	শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে।
৪। কর্ণাস্থি (ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস)	মধ্যকর্ণে অবস্থিত।	শব্দতরঙ্গ বহিঃ থেকে অন্ত ঃকর্ণে প্রেরণ করে।
৫। ককলিয়া	অন্তঃকর্ণে অবস্থিত শামুকের মতো প্যাঁচানো অস্থিময় প্রকোষ্ঠ বা নালিকা বিশেষ।	শ্রবণ অনুভূতি গ্রহণ করে ও মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
৬। অর্গ্যান অব কর্টি	ককলিয়ার বেসিলার ঝিলির উপর অবস্থিত এবং অডিটরি স্নায়ুর সাথে যুক্ত।	শব্দ–গ্রাহকযন্ত্র রুপে কাজ করে।
৭। ভেস্টিবুলার যন্ত্র	ককলিয়ার উপরের অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ ও মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ দিয়ে গঠিত।	ভারসাম্য রক্ষা করে।
৮। অর্ধবৃত্তাকার নালী	অন্তঃকর্ণে অবস্থিত অর্ধবৃত্তাকার নালী–৩টি ঝিলিরময় ল্যাবিরিন্থের অন্যতম অংশ।	ভারসাম্য নিয়ন্ত্রন করে।
৯। ক্যুপুলা	ক্যুপুলা অন্তঃকর্ণে অবস্থিত এক ধরনের চুন নিমিত কণিকা বিশেষ। এটি মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থের অন্যতম অংশ।	ভারসাম্য রক্ষা করে।
১০। ইউস্টেশিয়ান নালী	মধ্যকর্ণ ও গলবিলের সংযোগনালী।	মধ্যকর্ণ ও গলবিলস্থ বায়ুচাপের সমতা বজায় রাখে।

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা

কর্ণছত্র বা পিনায় সংগৃহীত শব্দতরঙ্গ কর্ণকুহরে বা বহিঃঅডিটরি মিটাসে প্রবেশ করে কর্ণপটহে বা টিমপেনিক পর্দায় আঘাত করলে তা কেঁপে উঠে। কাঁপনে, মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস ইনকাস ও স্টেপিস অস্থি তিনটি এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিম্ফে কাঁপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে কাঁপন হলে ককলিয়ার অর্গ্যান অব কর্টির সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগ অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়।

ভারসাম্য রক্ষা

মানুষের অন্তঃকর্ণের ইউটিকুলাস ও স্যাকুলাসের নানা জায়গায় কতকগুলো সংবেদী কোষগুচ্ছ থাকে। কোষগুলো থেকে সংবেদী রোম বের হয়। রোমগুলোর চারদিকে এণ্ডোলিম্ফে ভাসমান ওটোলিথ নামে অনেকগুলো চুনময় পদার্থ সংবলিত জেলীর মতো কোনাকার ক্যুপুলায় আবৃত থাকে। মানুষের মাথা কোনো এক তলে হেলে গেলে ঐ পাশের ওটোলিথগুলো ক্যুপলার সংবেদী রোমের সংস্পর্শে আসে, ফলে সংবেদী কোষগুলো উদীপ্ত হয়। উদ্দীপনা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছালে মানুষ দেহের আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে পারে। তখন মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রয়োজনীয় পেশির সংকোচনে মাথা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রডকোষ কী?
২। উপযোজন কী?
৩। অক্ষিগোলক বলতে বোঝ?
৪। কনজাংটাইভা কী?
৫। পিউপিল কাকে বলে?
৬। এ্যাকুয়াস হিউমার বলতে কি বোঝ?
৭। চোখের রেটিনায় কি কি কোষ থাকে?
৮। ইমপেনিক পর্দা কী?
৯। ককলিয়া বলতে কি বোঝ?
১০। কর্ণিয়া কাকে বলে?

খ) রচনামুলক প্রশ্ন

১। মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। ।
২। মানুষের কর্ণের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।
৩। শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার কৌশল আলোচনা কর।
৪। মানুষের রেটিনায় প্রতিবিম্ব তৈরির কৌশল আলোচনা কর।
৫। মানুষের কানের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১
(১ম পত্র)
ব্যবহারিক

১। দৈহিক অবস্থা ও দেহের বিভিন্ন তলের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

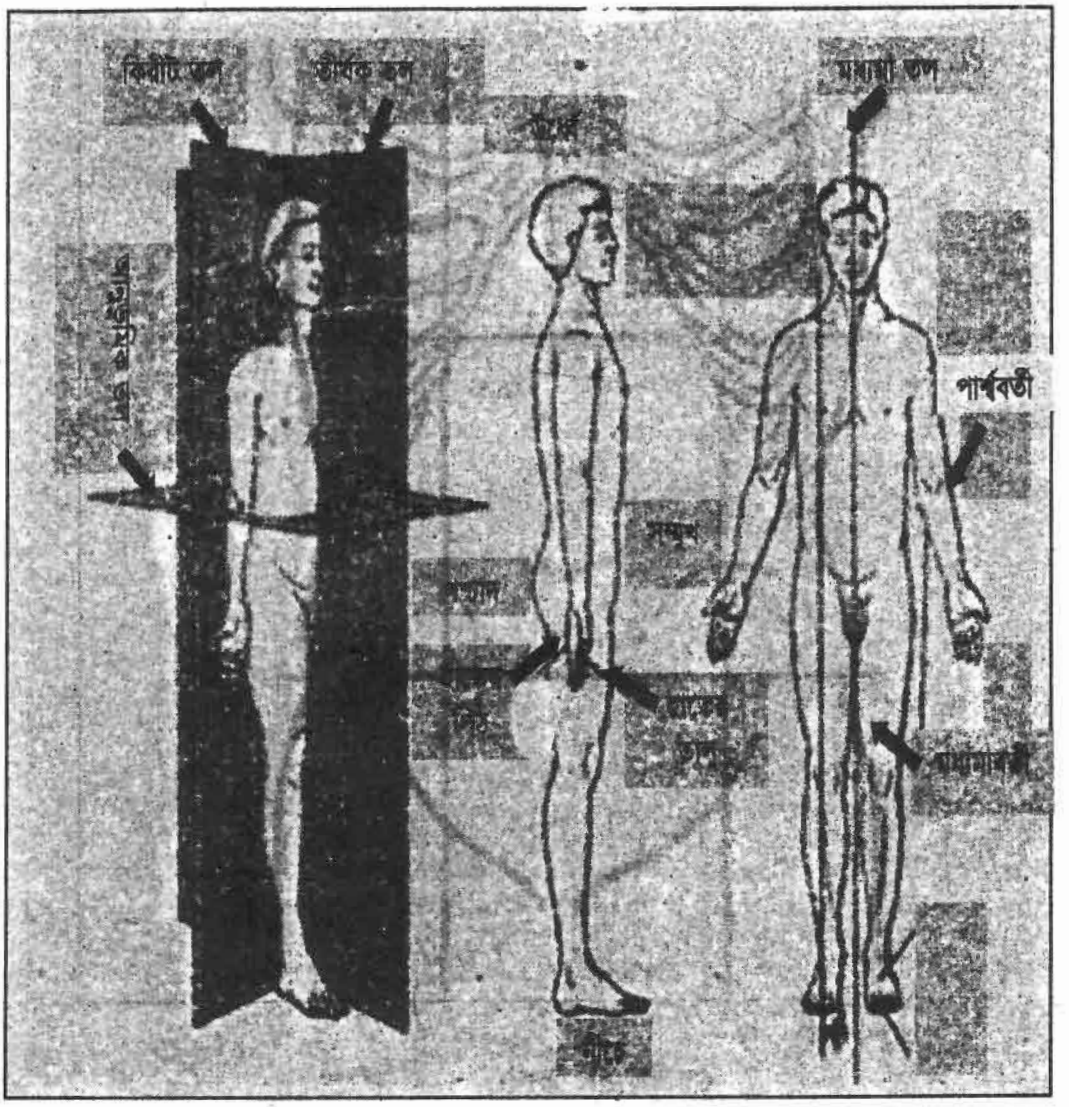

দৈহিক অবস্থা ও দেহের বিভিন্ন তল

২। পেটের ৯টি ভাগ অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

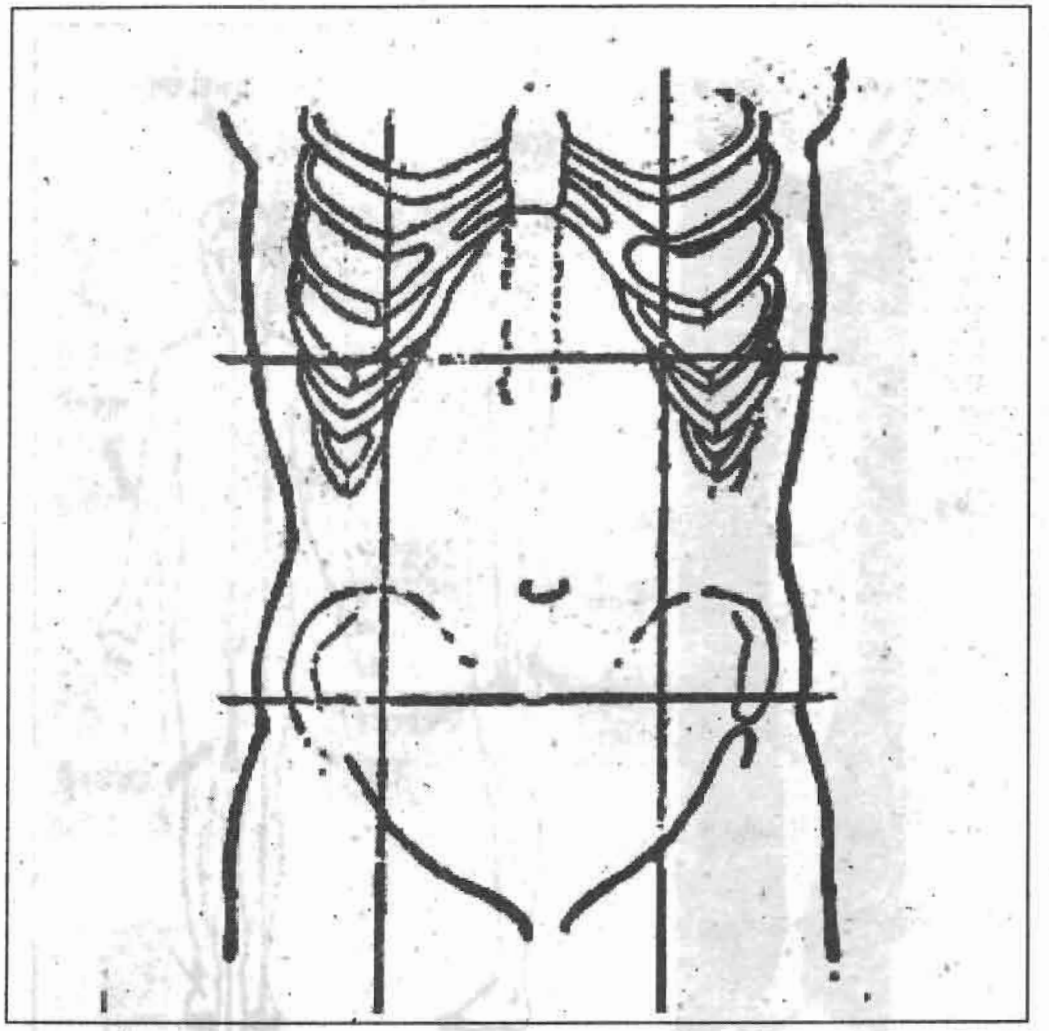

পেটের ৯টি ভাগ

৩। একটি মানব কোষ এঁকে তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

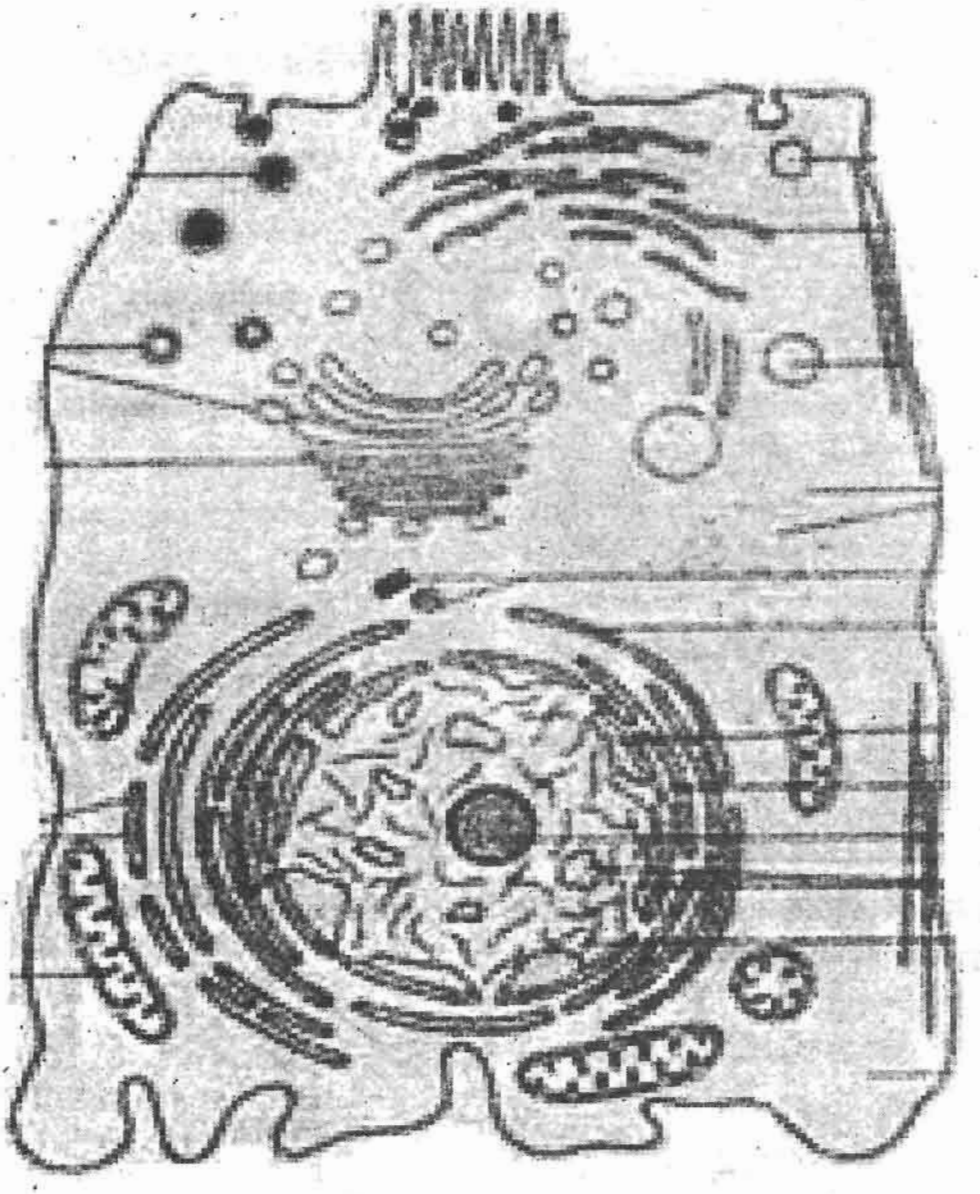

মানব কোষ

৪। মানব দেহকোষের একটি নিউক্লিয়াস অঙ্কন করে ইলেক্ট্রোনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের চিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

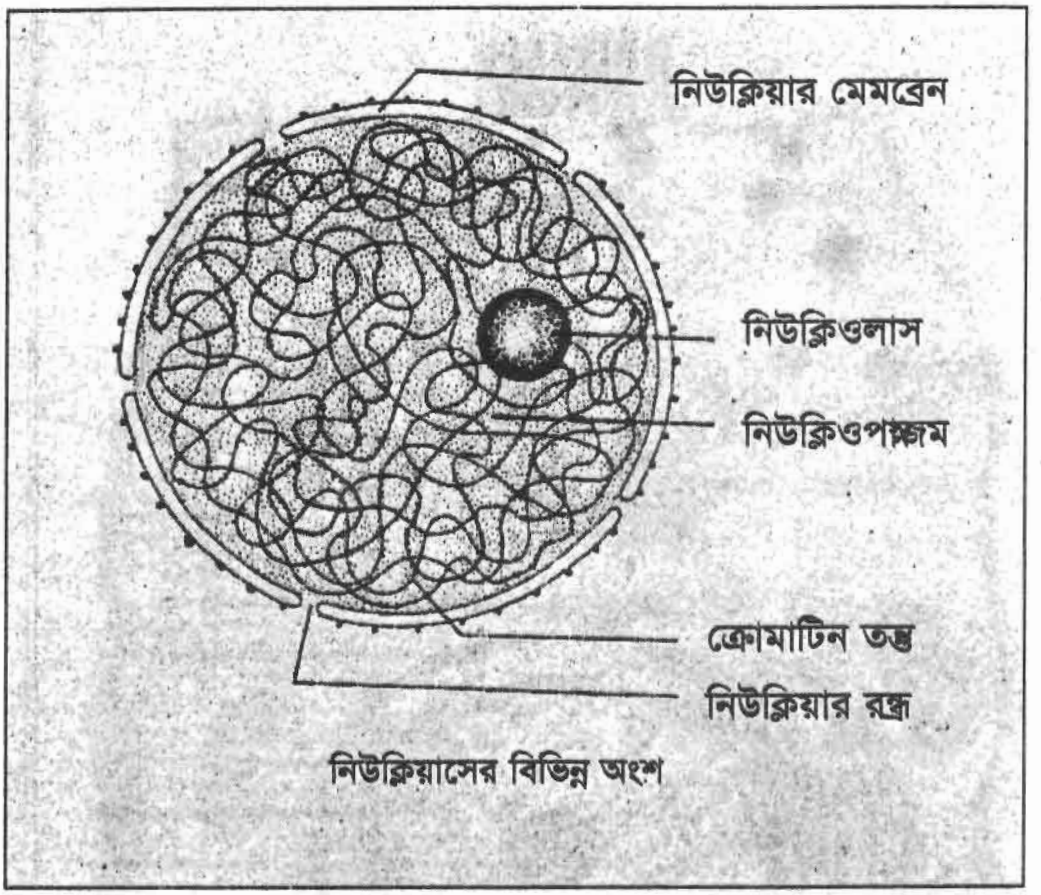

নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ

৫। মানব দেহকোষের একটি মাইটোকন্ড্রিয়া অঙ্কন করে ইলেক্ট্রোনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের চিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

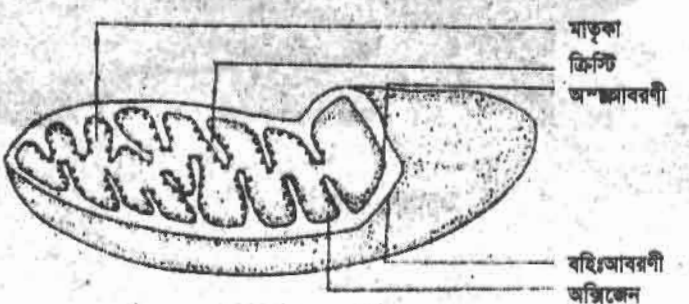

মাইটোকন্ড্রিয়ার রাসায়নিক গঠন

৬। মানব দেহের বিভিন্ন ধরনের পেশি কলা অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

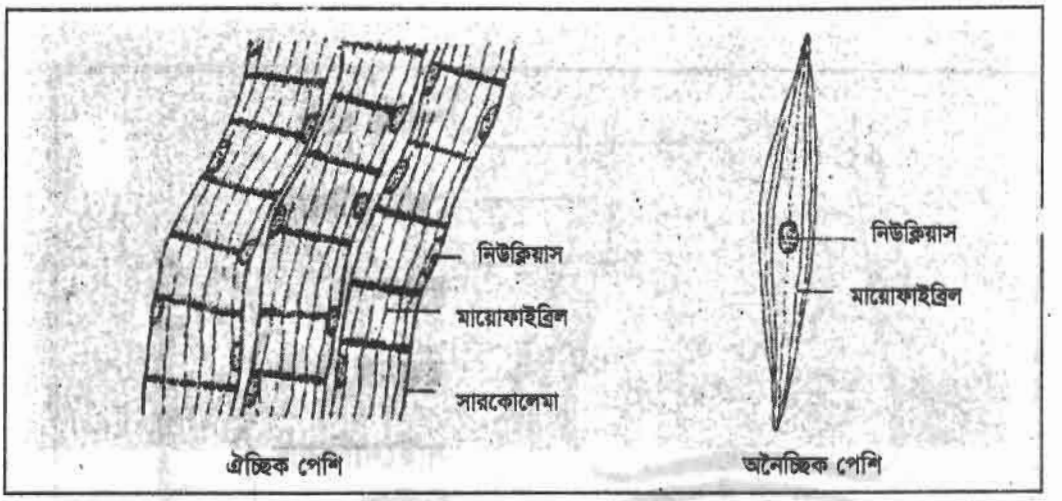

৭। মানব অস্থিতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে ২০৬ টি হাড়ের নাম লেখ এবং চিহ্নিত কর।

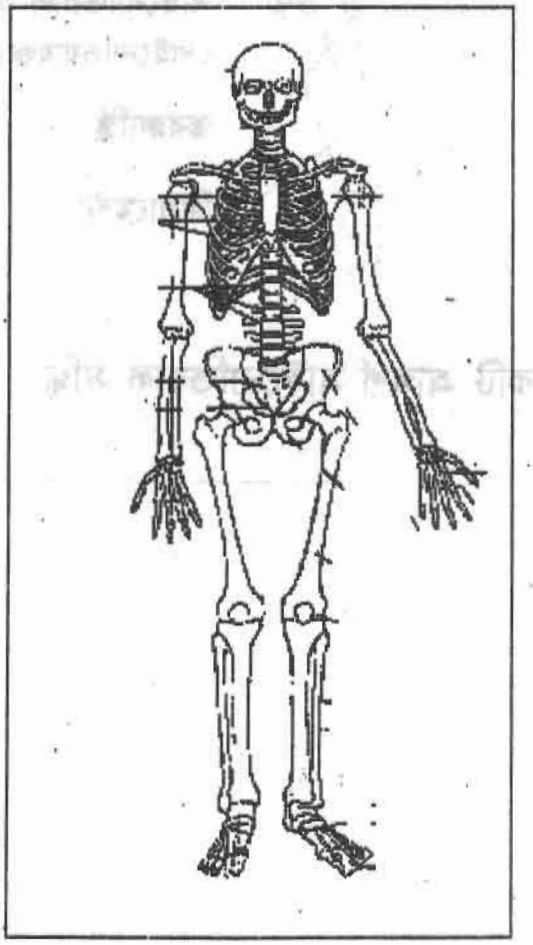

৮। একটি আদর্শ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

একটি আদর্শ সাইনোভিয়াল সন্ধি

৯। রক্ত কণিকাগুলো অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

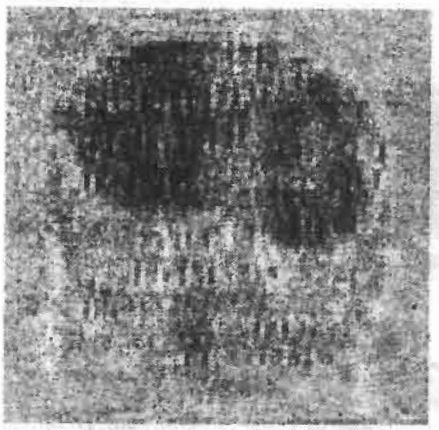

লিম্ফোসাইট

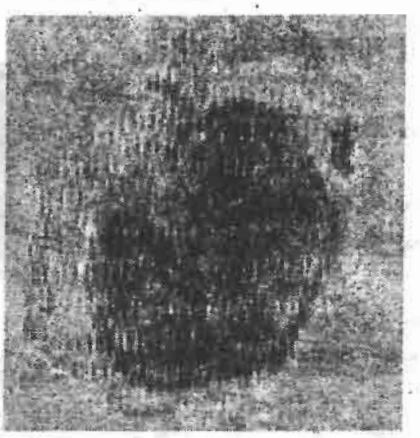

মনোসাইট

নিউট্রোফিল

ইওসিনোফিল

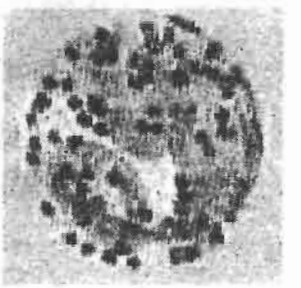

ব্যাসোফিল

১০। একটি মানুষের হৃদপিণ্ড অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

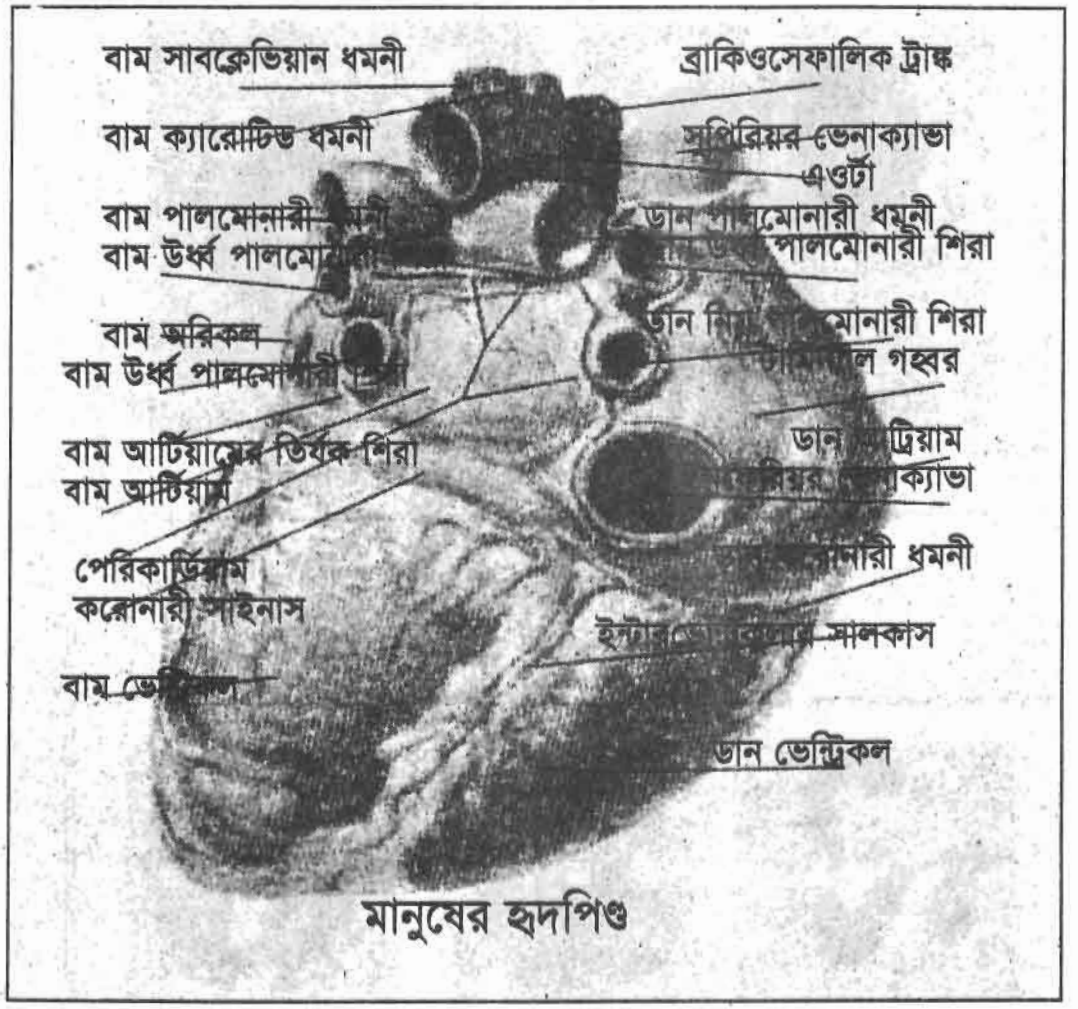

মানুষের হৃদপিণ্ড

১১। হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহনের চিত্রটি অঙ্কন কর।

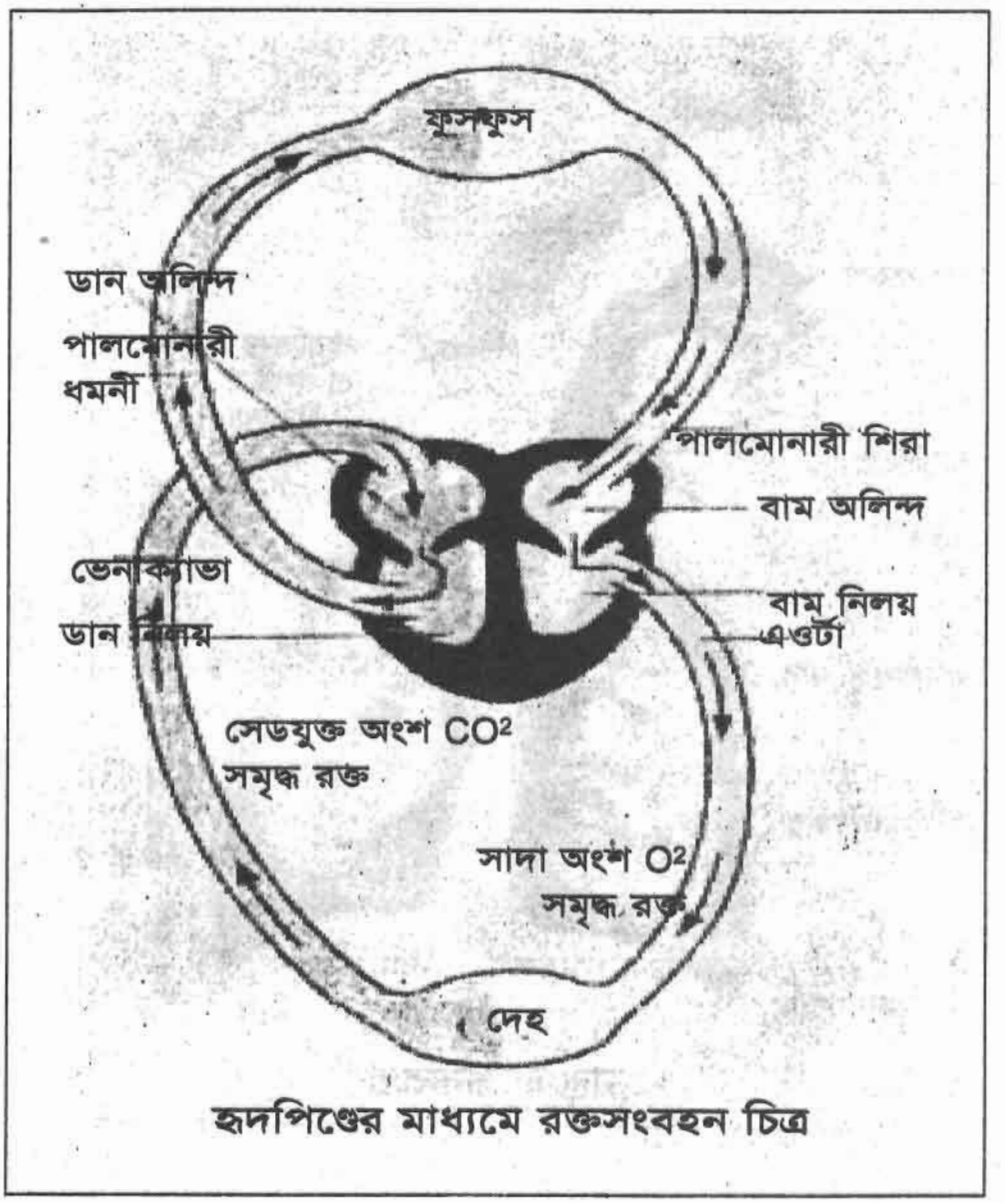

হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন চিত্র

১২। মানবদেহের শ্বসনতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন কর।

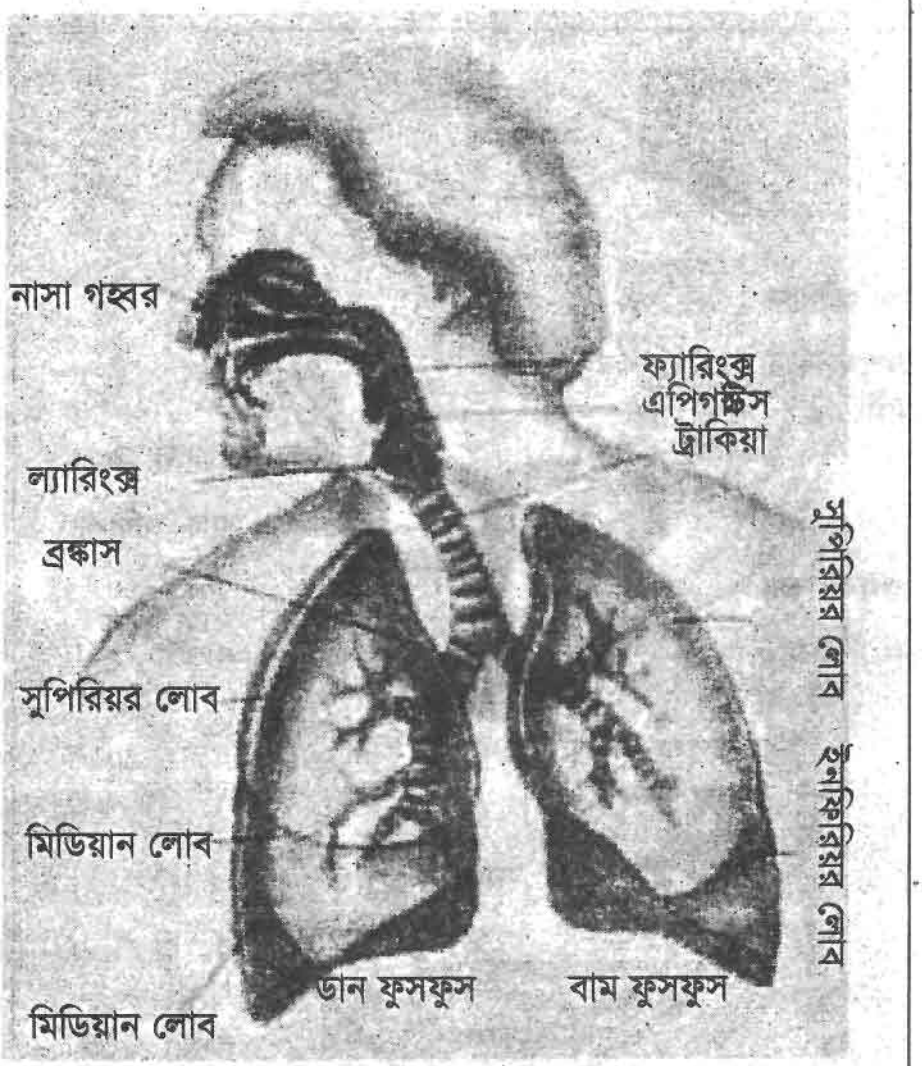

মানুষের শ্বসনতন্ত্র

১৩। পরিপাকতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

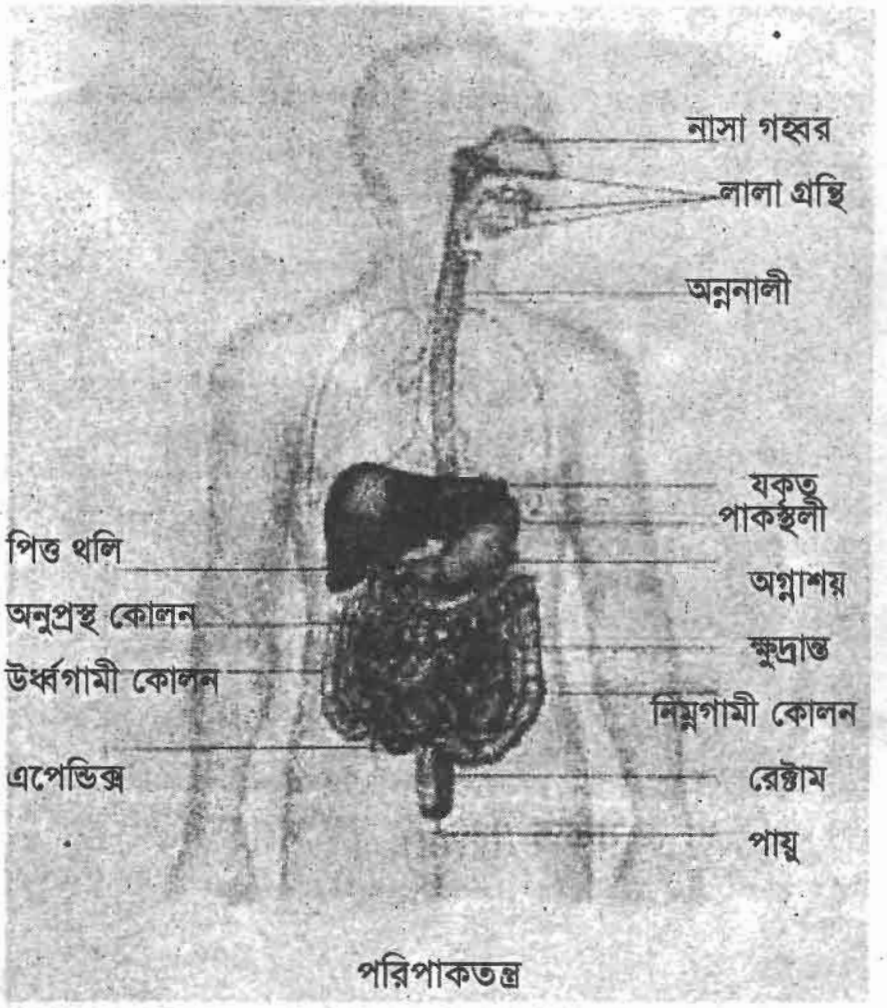

১৪। যকৃত ও পিত্তথলি অঙ্কন কর।

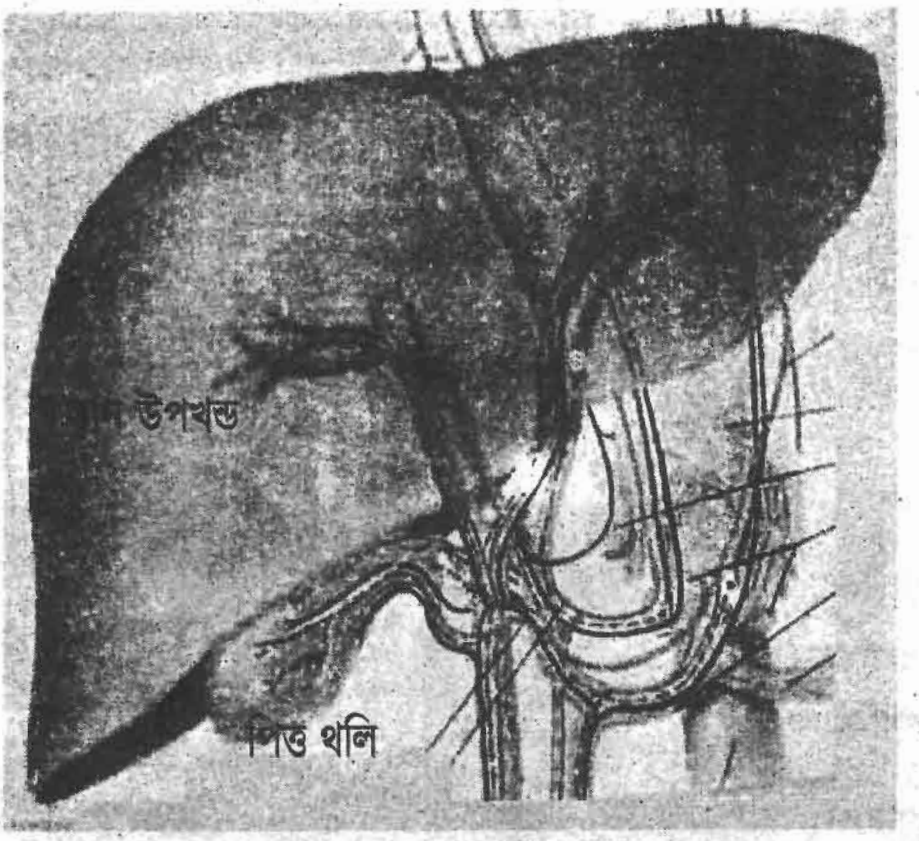

যকৃত (Liver)

১৫। একটি বৃক্ক অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

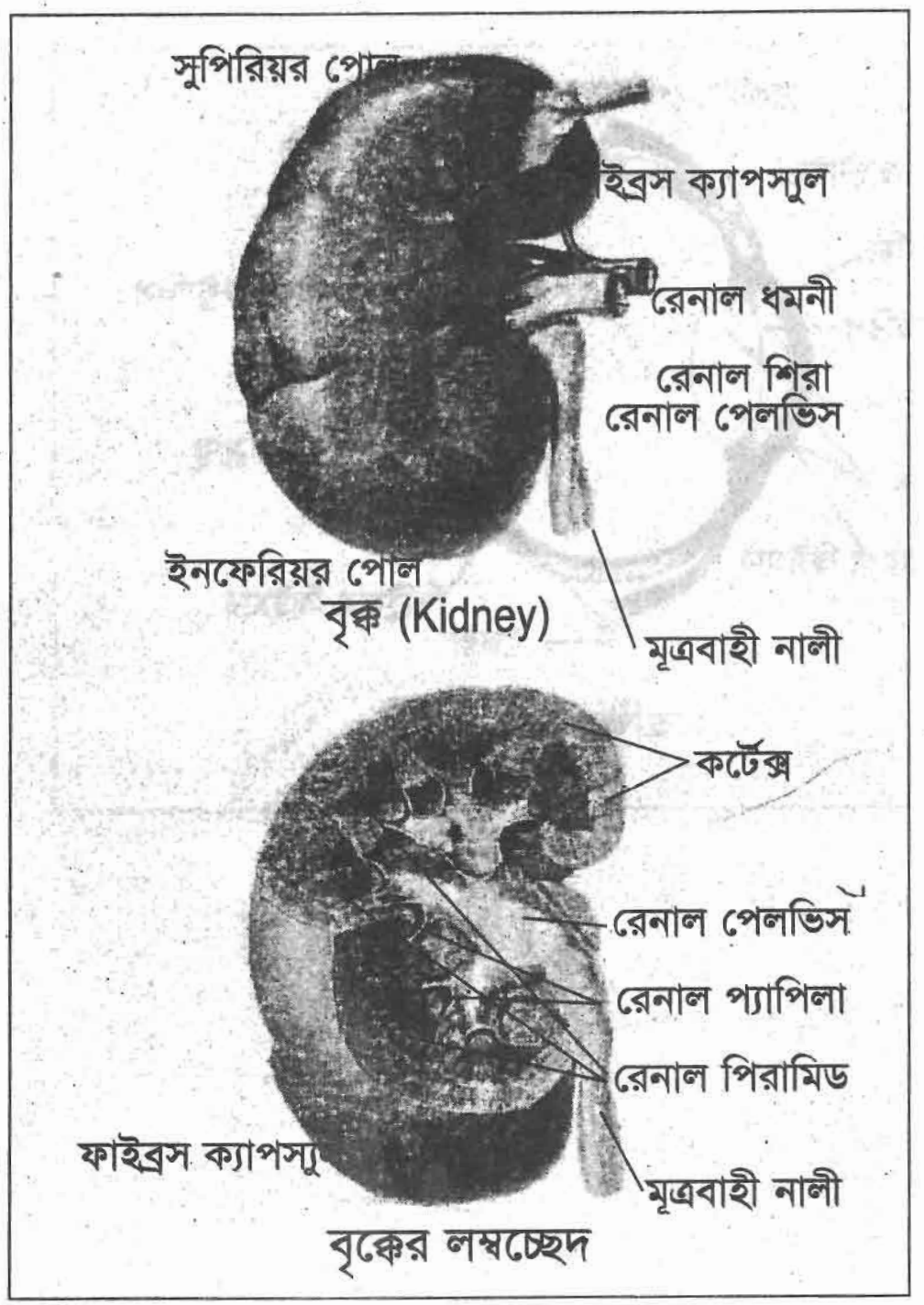

১৬। একটি অক্ষিগোলক অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

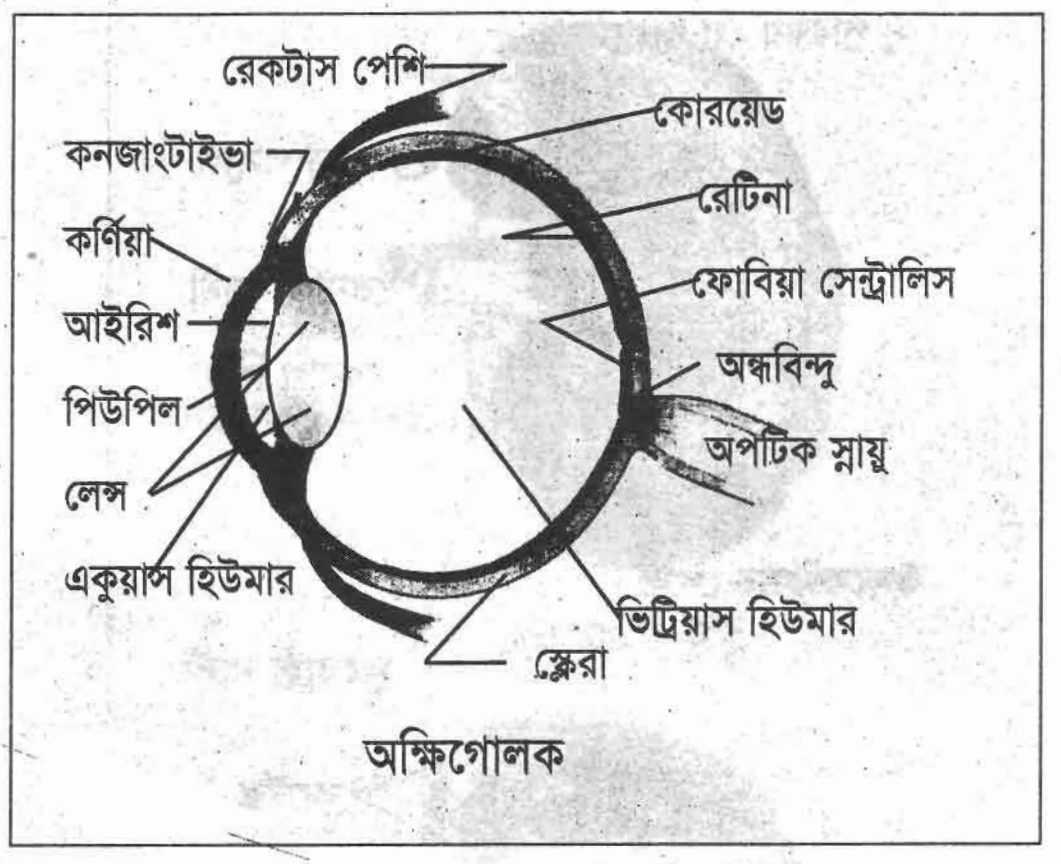

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১
(১ম পত্র)
ব্যবহারিক

প্রথম অধ্যায়

অণুজীব বিদ্যার প্রাথমিক ধারণা

অণুজীব বিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান

অনুজীব বিদ্যা (Microbiologv) ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় অণুজীব বা মাইক্রো-অর্গানিজম (Microorganism) সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে অণুজীব বিদ্যা (Microbiologv) বলে। অণুজীবগুলো অতি ক্ষুদ্র যা অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থায় অনেক অণুজীব শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে বহুবিধ রোগের কারণ সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ অজ্ঞ থাকায় ঐ সব রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে ইলেক্ট্রোন-মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর মাইক্রো-অর্গানিজমসমূহকে সনাক্ত করা সম্ভবপর হয়। যার ফলে অণুজীব বিদ্যা (Microbiologv) চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হিসাবে পরিগণিত হয়।

অণুজীব বা মাইক্রো-অর্গানিজম (Microorganism) ঃ অণুজীব হলো অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু (Organism) যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস, প্রটোজোয়া ইত্যাদি।

মাইক্রো-অর্গানিজমের শ্রেণিবিভাগ ঃ জৈবিক গঠনের উপর ভিত্তি করে মাইক্রো-অর্গানিজমগুলোকে ৩ টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

১) আদিকোষী অণুজীব (Prokaryotic micro-organism), যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ব্লু-গ্রীন এলজি ইত্যাদি।

২) প্রকৃতকোষী অণুজীব (Eukaryotic micro-organism), যেমন- ছত্রাক, প্রেটোজোয়া ইত্যাদি।

৩) উপকোষী অণুজীব (Subcellular micro-organism), যেমন- ভাইরাস, প্রায়নস্ ইত্যাদি।

পরজীবী (Parasite)ঃ যে সকল প্রাণি অন্য প্রাণির উপর বসবাস কওে, ঐ প্রাণী হতে খাদ্য গ্রহণ কওে নিজে উপকৃত হয় কিন্তু আশ্রয়দাতা প্রাণির (Host) ক্ষতি সাধন করে তাকে পরজীবী (Parasite) বলে। যেমন- কৃমি, উকুন, পরাজমোডিয়াম ইত্যাদি।

পরজীবী বিদ্যা (Parasitology)ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় শুধুমাত্র পরজীবী বা প্যারাসাইট নিয়ে আলোচনা কর হয় তাকে পরজীবী বিদ্যা (Parasitology) বলে।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)ঃ ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার এককোষী জীবাণু। এদের নিইক্লিয়াস আছে কিন্তু নিউক্লিয়ার মেমেব্রেণ্ন নেই । যেমন- কক্কাস, ব্যাকসিলাস, স্পাইরো কিটস ইত্যাদি।

ভাইরাস (Virus)ঃ ভাইরাস এরা এক প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু। এরা কখনও জীব আবার কখনও জড় পদার্থের মতো আচরণ করে। যেমন- এইচআইভি; হেপাটাইটিস ভাইরাস, পক্স ভাইরাস ইত্যাদি।

প্রটোজোয়া (Protozoa)ঃ প্রটোজোয়া এক প্রকার এককোষী প্রাণী। এরা একটি মাত্র কোষ দিয়েই তাদর জীবন চক্রের সকল কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন- এমিবা, জিয়ারডিয়া, ট্রাইকোমোনাস ইত্যাদি।

স্পোর (Spore)ঃ ব্যাকটেরিয়ার যখন প্রতিকূল অবস্থায় থাকে তখন এর সাইটোপ্লাজম থেকে এক প্রকার আঠালো রস নিঃসৃত হয়ে ব্যাকটেরিয়া গায়ে লেগে থাকে এবং একে শৈত, তাপ ও বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে তাকে স্পোর বলে। স্পোর ক্যারোটিন জাতীয় আমিষ দ্বারা গঠিত।

জীবাণু শনাক্তকরণ (Identification of Organism)ঃ অণুজীবগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। সুতরায় খালি চোখে জীবাণু শনাক্তকরণ বাস্তবসম্মত নয়। অণুজীবগুলোকে শনাক্তকরণের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা

হলো অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)। গঠন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন–

১। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope),

২। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound microscope),

৩। ইলেক্ট্রোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope),

জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization)ঃ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবিত জীবাণু বা স্পোরগুলিকে ধক্ষংস করা হয় তাকে জীবানুমুক্তকরণ (Sterilization) বলে। চিকিৎসা শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রত্রিয়ায় জীবানুমুক্ত করা হয । তন্মধ্যে নিম্ন বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলো উলেরখযোগ্য।

১। তাপ জীবানুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Sterilization by heat)ঃ শুষ্কতাপ প্রক্রিয়া ও বাষ্পতাপ প্রক্রিয়া।

২। বিকিরণ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Sterilization by radiation)ঃ বিভিন্ন প্রকার বিকিরণ প্রয়োগ।

১। তাপ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে নিচের পদ্ধতিগুলো বিশেষভাবে কার্যকর। যথা :

ক) উচ্চ তাপ (High temparature) পদ্ধতি,

খ) অনুচ্চ তাপ (Low temparature) পদ্ধতি,

গ) শুষক তাপ (Dry heat) পদ্ধতি,

ঘ) আদ্র তাপ (Moist heat) পদ্ধতি,

ঙ) সিদ্ধ তাপ (Boiling heat) পদ্ধতি,

চ) চাপশূন্য উত্তপ্তকরণ (Streaming without pressure) পদ্ধতি,

ছ) চাপসহ উত্তপ্তকরণ Streaming with pressure) পদ্ধতি,

জ) পাস্তরীকরণ (Pasteurization) পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া।

২। বিকিরণ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে নিচের পদ্ধতিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা :

ক) অতি–বেগুনি রশ্মি (Ultra violet ray) প্রয়োগ,

খ) অবলেহিত রশ্মি (Infra red ray) প্রয়োগ,

গ) আলফা রশ্মি (á-ray) প্রয়োগ,

ঘ) বিটা রশ্মি (B-ray) পয়োগ,

ঙ) এক্স রশ্মি (X-ray) প্রয়োগ,

চ) ক্যাথোড রশ্মি (Cathod ray) প্রভৃতি প্রয়োগের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) ঃ সৃষ্টিগতভাবে প্রাণীদেহে বাইরের বিভিন্ন ক্ষতিকারক রোগজীবাণু এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা এবং প্রবেশকারী জীবাণুকে ধক্ষংস করার জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত যে ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে তাকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) বলা হয়।

এন্টিবডি (Antibody)ঃ এন্টিবডি হচ্ছে বহিরাগত পদার্থের প্রতি সাড়া দিয়ে প্লাজমা–কোষ থেকে উৎপন্ন প্রোটিনধর্মী পদার্থ যা এর সমধর্মী এন্টিজেনের সংগে সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে।

এন্টিজেন (Antibody) ঃ লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে অবস্থিত এক জাতীয় পদার্থ যা এন্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়, তাকে টক্সিন বলে।

টক্সিন (Toxin) ঃ বিভিন্ন বিপাকের ফলে ব্যাকটেরিয়া থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে টক্সিন বলে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)

চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগের কারণ নিরূপণের জন্য রোগ জীবাণু সনাক্তকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রোগ জীবাণুগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির যা খালি চোখে দেখা যায় না। সুতরাং রোগ জীবাণু দেখে নিশ্চিত হয়ে রোগের চিকিৎসা করতে হলে ক্ষুদ্রাকৃতির রোগ জীবাণুগুলোকে সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য ৫০ থেকে ১০০গুণ বড় করে দেখতে হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায় তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) বলে।যান্ত্রিক গঠন ও বীক্ষণ ক্ষমতার (Magnification) ভিত্তিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন

১। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope) বীক্ষণ ক্ষমতা ১০ থেকে ২০ গুণ বড়।

২। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound microscope) বীক্ষণ ক্ষমতা ২০ থেকে ১০০ গুণ বড়।

৩। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope) বীক্ষণ ক্ষমতা ২ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বড়।

সকল অণুবীক্ষণ যেন্ত্রেই ২ ধরনের যন্ত্রাংশ রয়েছে। যথা

ক) যান্ত্রিক অংশ Mechanical part) যে সমস্ত যন্ত্রাংশ অন্যান্য যন্ত্রাংশকে উঠা নামা ও নড়া চড়া করতে সাহায্যে করে সেগুলো যান্ত্রিক অংশ।

খ) দর্শন অংশ (Optical part) যে সমস্ত যন্ত্রাংশের সাহায্যে দর্শনীয় বস্তু বড় ও স্পষ্ট করে দেখার ব্যাপারে সহায়তা করে সেগুলো দর্শন অংশ।

একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যন্ত্রাংশসমূহ

ক) যান্ত্রিক অংশ (Mechanical part)

১। টানানল (Draw tube)

২। দেহ নল (Body tube)

৩। সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু (Coarse adjustment screw)

৪। সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু (Micrometer screw)

৫। বাহু (Limb)

৬। মঞ্চ ক্লিপ (Stage clip)

৭। মঞ্চ (Stage)

৮। ডায়াফ্রাম (Diaphragm)

৯। বাকানো স্ক্রু (Inclination screw)

১০। স্বম্ভ (Pillar)

১১। পাদদেশ (Microscope base)

খ) দর্শন ক অংশ (Optical part)

১২। অভিনেত্র (Eye piece)

১৩। নাসিকা স্ক্রু (Nose piece screw)

১৪। অভিলক্ষ (Objectives)

১৫। দর্পণ (Mirror)

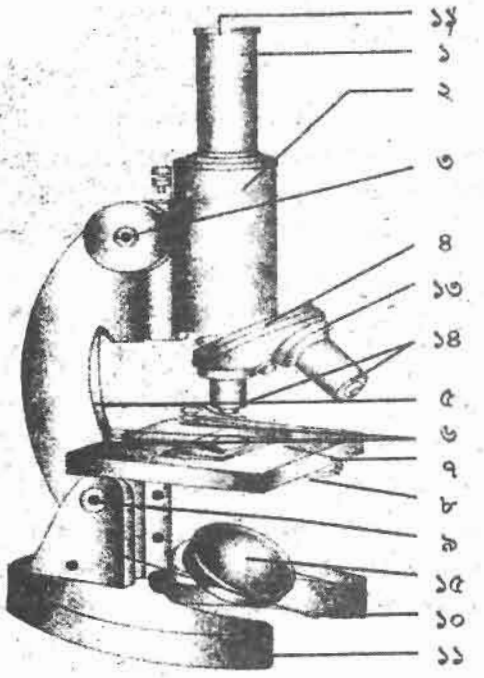

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার

সাধারণত রোগ নিরূপণের জন্য রোগের কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়। আর সকল রোগই কোন না কোন জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়াপর কারণেই হয়। সুতরাং রোগ নিরূপণের জন্য জীবাণু সনাক্ত করা অপরিহার্য কাজ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রাথমিক ভাবে রোগ জীবাণু সনাক্ত করার কাজেই ব্যবহৃত হয়। রোগের চিকিৎসার জন্য পরবর্তী পর্যয়ে রোগীর শরীরের বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষার কাজে অণুবীক্ষণ যন্ত্রও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন রক্তের উপাদানসমুহ পরিমাপ করা, প্রস্রাবের উপাদানসমূহ যাচাই করা, পায়খানার উপাদানসমূহ পরীক্ষা করা প্রভৃতি কাজে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। নিচে মানুষের পায়খানায় পরজীবীর উপস্থিতি নিরূপক্ষপণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি পরীক্ষার বিবরণ উদ্ধৃত করা হলোঃ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরজীবী পরীক্ষা

প্রথমে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহার উপযোগী কয়েকটি কাঁচের স্লাইড (Slide) সংগ্রহ করে স্লাইডগুলো জীবাণমুক্ত কর। এ কাজের জন্য বিশুদ্ধ পানি (Distilled water) ও রেক্টিফায়েড স্পিরীট (Rectifed spirit) বা ইথাইল এলকোহল ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন জীবাণুমুক্ত স্লইডে পরজীবী কদ্বারা আক্রান্ত রোগী অর্থাৎ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত রোগীর পায়খানার নমুনা থেকে পানি মিশ্রিত তরল নমুনা স্লইডের উপরে লেপে দাও। এই প্রক্রিয়াকে মেয়ার (Smear) তৈরি করা বলা হয়। এবার নমুনাসহ স্লাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মঞ্চে স্লাইড সেট করার জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে মঞ্চ ক্লিপ নিয়ে ভালভাবে সেট কর। অণুবিক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ (Objectives) বিভিন্ন বীক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন– ১০ গুণ বীক্ষণ অভিলক্ষকে 10x, ২০ গুণ বীক্ষণ অভিলক্ষকে 20x, ১০০ গুণ বীক্ষণ অভিলক্ষকে 100*, বলে। প্রথমে অল্প বীক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন অভিলক্ষ সেট করে অভিনেত্রের (Eye piece) সাহায্যে পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রয়োজনবোধে বেশি বীক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে পর্যবেক্ষণ কর। পর্যবেক্ষণের এই পর্যায়ে অভিনেত্রে (Eye piece) চোখ রেখে স্থুল সন্নিবেশক স্ক্রু (Coarse abjustment screw) ও সুক্ষ সন্নিবেশক স্ক্রু (Micromerer screw) ঘুড়িয়ে অভিলক্ষকে উঠা সামা করে স্লাইডে রক্ষিত নমুনা যাতে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় সে জন্য সঠিক অবস্থানে অভিলক্ষকে সেট কর। পর্যবেক্ষণের এই পর্যায়কে ফোকাস ঠিক করা (Adjustment of focus) বলা হয়। ফোকাস ঠিক করে অভিলক্ষকে সেট করা সঠিক হলে স্লাইডের উপরে রক্ষিত নমুনার মধ্যে কৃমির বাচ্চা অথবা কৃমির ডিম স্পষ্ট ভাবে দেখা যাবে। নমুনাটি ভালভাবে পর্যবেক্ষন করে আর যা কিছু দেখা যায় তার ফলাফল একটি কাগজে লিপিবদ্ধ কর। এখন পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও নমুনাসহ স্লাইডটিতে একটি কোড নং দুয়ে এমন ভাবে সংরক্ষণ কর যাতে সহজেই বোঝা যায় যে স্লাইডটি কোনো রুগীর পায়খানার নমুনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। পর্যবেক্ষণটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপরের নিয়মে আরও কয়েকটি পর্যবেক্ষণ স্লাইড ও কাগজ তৈরি কাজ সম্পন্ন কর।

এভাবেই অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহসে অণুজীব ও পরজীবীর উপস্থিতি নিরূপণ করা হয় তবে বিভিন্ন প্রকার অণুজীবের আঙ্গিক গঠন এবং পরজীবীর বাচ্চা ডিম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এ ব্যাপারে সুষ্ঠ মাধ্যমে অণুজীব ও পরজীবীর ভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে অণুবিক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার ভালভাবে শিখে নিতে হবে। যেমন– রক্তের লোহিত কণিকা, শ্বেত কিণিকা, অণুচক্রিকার পরিমাণ নিরূপণসহ কফ, কাশি, বির্য, সিস্ট ও ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং অন্যান্য বিভিন্ন রোগের রোগ জীবাণু পর্যবেক্ষণের কাজ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা যায়।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অণুজীব কাকে বলে?
২। পরজীবী কাকে বলে?
৩। অণুজীব বিদ্যা বলতে কি বোঝ?
৪। পরজীবী বিদ্যা বলতে কি বোঝ?
৫। ভাইরাস কাকে বলে?
৬। ব্যাকটেরিয়া কী?
৭। প্রটোজোয়া কী?
৮। এন্টিবডি কাকে বলে?
৯। এন্টিজেন কী?
১০। স্পোর বলতে কি বোঝ?
১১। টক্সিন কাকে বলে?
১২। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বোলতে কি বোঝ?
১৩। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কি?
১৪। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কয় প্রকার কি কি?
১৫। মেয়ার কাকে বলে?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। জীবাণুমুক্তকরণ কাকে বলে? কি কি পদ্ধতিতে জীবণুমুক্ত করা হয় বর্ণনা কর।
২। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।
৩। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরজীবী শনাক্তকরণ কাজের বর্ণনা দাও।
৪। অণুজীব বিদ্যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে' কথাটির তাৎপর্য বিশেরষণষ কর।
৫। অণুবীক্ষণ যন্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোকবর্তিকা স্বরূপ' উক্তিটির যথার্থতা আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অণুজীব ও অণুজীবের প্রকারভেদ

অণুজীব ও অণুজীবের প্রকারভেদ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অণুজীব (Microorganism) একটি অতি পরিচিত নাম। মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষসহ যত প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে অণুজীব সৃষ্টির বিষয়টি আজও কুয়াশাচ্ছন্ন। এই বিশাল সৃষ্টি জগতে এমন কোটি কোটি অণুজীব রয়েছে যাদের সৃষ্টি কৌশল এবং জীবণ চক্র আজ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানের পরিধীর বাইরে। যার প্রাণ আছে তারই রোগে ভোগান্তি আছে। আর পৃথিবীতে যত প্রকার সংক্রামক রোগ আছে তা কোন না কোন অণুজীবের কারণেই হয়ে থাকে। সুতরাং অণুজীব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা প্রতিটি মানুষের জন্যই অপরিহার্য বিষয়। অণুজীব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই মানুষের রোগ, শোক ও ভোগান্তির সীমা পরিসীমা নেই।

এ অধ্যায়ে সাধারণত যে সমস্ত রোগ–ব্যাধিতে মানুষ সচরাচর আক্রান্ত হয় এবং ঐ সব রোগ যে সমস্ত অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত হয় তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে সর্বস্তরের মানুষ অণুজীব সম্পর্কে নূনতম জ্ঞান লাভ করে তাদের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করত নিরোগ দেহে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

মানুষের যে সকল রোগ–ব্যাধি হয়ে থাকে তার মধ্যে অধিকাংশ রোগের জনস্য ব্যাকটেরিয়া দায়ী। বিশেষ করে পানিবাহিত রোগসমুহ মহামারি আকার ধারন করে ব্যাকটেরয়ার সংক্রমনের ফলে। ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার এককোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু। এরা এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না। এদের কোষে নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাই নাই। তবে ব্যাকটেরিয়ার দেহে কোষপ্রচীর থাকে। এরা দ্বি–বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। অনুকূল পরিবেশ পেলে এরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে বংশ বৃদ্ধি করে । সুতরাং নিরোগ দেহে সুস্থ জীবন যাপন করার জন্য প্রতিটি মানুষের ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের চিকিৎসা ও সংক্রমন রোধ করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার জীবনচক্র সম্বন্ধে বিষদভাবে জ্ঞান লাভ করা প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকের জন্য অপরিহার্য।

ব্যাকটেরিয়ার গঠন: যে সকল উপাদান নিয়ে একটি ব্যাকটেরিয়ার (Bacteria) কোষ গঠিত হয় তা হচ্ছেঃ

১। সেল এনভেলাপ (Cell envelop) সেল এনভেলাপ। হচ্ছে কোষের বহিঃরাবরণ। এর মধ্যে আছে

ক) সাইটোপরাজমিক মেমব্রেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভিতরের আবনন যা সাইটোপ্লাজমের চার পাশে থাকে।

সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনের কাজ:

এটা ব্যাকটেরিয়ার দেহে পানি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

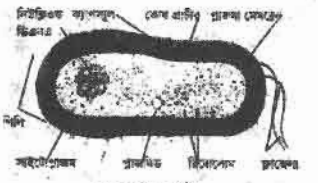

ব্যাকটেরিয়ার গঠন

খ) কোষ পর্দা (Cell wall) এটা সাইটোপ্লাজমের বাইরে ও ক্যাপসুলের ভেতরের শক্ত আবরণ।

কোষ পর্দার কাজ:

বাইরের বিভিন্ন প্রকার তাপ, চাপ ইত্যাদি থেকে রক্ষ করা।

কোষ পর্দা অপেক্ষাকৃত শক্ত হওয়ায় এটা ব্যাকটেরিয়ার আকার দিয়ে থাকে।

গ) ক্যাপসুল Capsule) ক্যাপসুল হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার সবচেয়ে বাইরের আবরন। এটা খুব পাতলা।

ক্যাপসুল Caplule) ক্যাপসুল হচেছ ব্যাকটেরিয়ার সবচেয়ে বাইরের আবরন। এটা খুব পাতলা।

ক্যাপসুলের কাজ

ব্যাকটেরিয়ার ভেতরের সজীব অংশকে রক্ষা করা।

ব্যাকটেরিয়ার বহিঃ ও অন্তঃমাধ্যমের মধ্যে অভিস্রবণীয় প্রতিবন্ধক রূপে কাজ করা।

২। **ফ্লাজেলা** (Flagella) ঃ ব্যাকটেরিয়া সাইটোপ্লাজম হতে কোষ প্রাচীর ভেদ করে দীর্ঘ সুতার মতো পদার্থ থাকে। একে ফ্লাজেলা বলে।

ফ্লাজেলার কাজ ঃ

এরা ব্যাকটেরিয়াকে চলাচলে সাহায্য করে।

৩। **ফিম্ব্রিয়া** (Fimbria) ফিম্ব্রিয়া ফ্লাজেলা থেকে ছোট। যা ব্যাকটেরিয়ার সারা পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়। এদের কে পিলি (Pilli) বলা হয়।

ফিম্ব্রিয়ার কাজ ঃ

এরা ব্যাকটেরিয়ার জনন অঙ্গ হিসাবে কাজ করে।

৪। **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm) প্রত্যেক ব্যাকটেরিয়াতে সাইটোপ্লাজম থাকে। এই সাইটোপ্লাজম এর মাঝে ডিএনএ, রাইবোসম, পানি, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও বিভিন্ন দানাদার পদার্থ বিদ্যমান।

সাইটোপ্লাজমের কাজ ঃ

বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে সহায়তা করা।

ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য প্রস্তুতিতে সহায়তা করা।

৫। **নিউক্লিয়াস** Nucleus) প্রত্যেক ব্যাকটেরিয়াতে নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু এদের নিউক্লিয়াসে কোন নিউক্লিয়ার পর্দা থাকে না।

নিউক্লিয়াসের কাজঃ

এরা বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৬। **স্পোর** (Spore) ব্যাকটেরিয়া প্রতিকূল অবস্থায় থাকলে এর সাইটোপ্লাজম থেকে এক প্রকার আঠালোঃ রস নির্গত হয়। যা ব্যাকটেরিয়ার গায়ের সাথে আটকে থাকে। একে স্পোর বলে।

স্পোর (Spore) **এর বৈশিষ্ট ঃ**

ক) এরা প্রতিকূল পরিবেশে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে পারে।

খ) এরা অনেক দিন না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

গ) স্পোরকে অল্প তাপ দিয়ে ধ্বংস করা যায় না।

স্পোর এর কাজ ঃ

ব্যাকটেরিয়াকে শুষ্ক, তাপ, ঠান্ডা থেকে রক্ষা করা।

বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করা।

ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General characteristics of bacteria)ঃ

১। ব্যাকটেরিয়া খালি চোখে দেখা যায় না।

২। ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীর ফ্লাজেলা, ফিম্ব্রিয়া ও ক্যাপসুল আছে।

৩। এদের নিউক্লিয়াস আছে।

৪। এদের দেহে কোন ক্লোরোফিল নেই।

৫। এদের নিউক্লিয়াস এর মাঝে ক্রোমজম আছে।

৬। এদর মাইটোকন্ড্রিয়া ও এন্ডোপরাজমিক রেটিকুলাম নেই।

৭। এরা যৌন ও দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে।

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ

অঙ্গসংস্থান এর উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) কক্কাই (Cocci)
খ) ব্যাসিলাস (Bacillus)
গ) ভিব্রিয়স (Vibrios)
ঘ) স্পাইরোকিটস (Spirochaetes) প্রভৃতি।

ক) **কক্কাই** (Cocci): কক্কাই দেখতে গোলাকার বা ডট (.) আকৃতির। চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রধানত ৩ প্রকার কক্কাই এর বর্ণনা পাওয়া যায়। যথাঃ স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus), স্টেফাইলোকক্কাস (Staphylococcus) ও নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) ।

i) স্ট্রেপটোক্কাস (Streptococcus) স্ট্রেপটোকক্কাই এমন এক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া যার দ্বারা বহুবিধ রোগের সংক্রমন ঘটে। এর দ্বারা মানব কোষে বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ হয়ে থাকে। তন্মধ্যে বাতজ্বর (Rheumatic fever), গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস (Glomerulonephritis) ও মেনিনজাইটিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্ট্রেপটোকক্কাই সর্পিলাকার গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া। এরা শিকিল আকারে অথবা জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের গলা, ত্বক ও অন্ত্রে স্ট্রেপটোকক্কাই অবস্থান করে। কিন্তু যখন টিস্যু ও রক্তে প্রবেশ করে তখন এরা রোগের সৃষ্টি করে।

ii) স্টেফাইলোকক্কাস (Staphylococcus) ঃ স্টেফাইলোকক্কাই ব্যাকটেরিয়াও বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ করে থাকে। তাদের মধ্যে খাদ্যে বিষক্রিয়া, টক্সিক শক সিনড্রোম, প্রস্টেটিক প্রদাহ, মূত্রনালীতে প্রদাহ প্রভৃতি প্রধান। স্টেফাইলোকক্কাই সর্পিলাকার গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া। এরা এলোমেলোভাবে আঙ্গুরের থোকার মত অবস্থান করে। প্রাথমিকভাবে এরা মানুষের দেহে যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে তবে ত্বক, মিউকাস মেমব্রেণ ও নাকের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে।

iii) নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) ঃ নিউমোকক্কাই সাধারণত নিউমোনিয়া, মিনিনজাইটিস, ওটাইটিস মিডিয়া, সাইনুসাইটিস প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। এরা দেখতে দুই দিকে ধারালো ছুরির মত। এরা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। এরা ছোট শিকলের মত অথবা জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষের শরীরেই এদের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়।

খ) ব্যাসিলাস (Bacillus) ব্যাসিলাই দেখতে লম্বা আকৃতির। সাধারণত প্রায় সকল ব্যাসিলাই গ্রাম নেগেটিভ। তবে কিছু ব্যাসিলাম গ্রাম পজিটিভও দেখা যায়। এরা মানুষের অন্ত্রে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে থাকে। ই–কোলাই (E.coli), সালমোনেলা টাইফি (Salmonella typhi) ইত্যাদি ব্যাসিলাই এর উদাহরণ।

গ) ভিব্রিয়স (Vibrios) ভিব্রিয়স সাধারণত দেখতে 'কমা'র (,) মত। কলেরা ও রক্তের বিভিন্ন রোগ এই অণুজীবের দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন–ভিব্রিয়ি কলেরা (Vibrio cholerae), ভিব্রিয় প্যারা হেমোলাইটিকাস (Vibrio Parahamolylicus) ঃ প্রভৃতি ভিব্রিয়স অণুজীবের উদাহরণ।

ঘ) স্পাইরোকিটস (Spirochetes) এরা দেখতে সর্পিলাকার (Spiral) এবং মোচড়ানো (Twisted) । যথা–ট্রিপোনিমা পার্টিনিউ (Triponema pertenue), ট্রিপোনিমা পেলিডাম Treponema poallidum) । ট্রিপোনিমা পার্টিনাট (Treponema pertenut), ট্রিপোনিমা কেরাটিয়াম (Triprnema carateum), ইত্যাদি স্পাইরোকিটস অণুজীবের উদাহরণ। ট্রিপোনিমা পেলিডাম সিফিলিস ও ট্রিপোনিমা কেরাটিয়াম ধরনের চর্ম রোগের কারণ।

রঞ্জিন বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া (Gram positive Bacteria), ২। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া (Gram nrgative gacteria), ৩। অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই (Acid first bacilli), ।

১। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া (Gram positive Bacteria), যে সকল ব্যাকটেরিয়াকে ক্রিস্টাল ভায়োলেট (Crystalviolate) দিয়ে রং করে এলকোহল দিয়ে ধৌত করার পরও রং পরিবর্তন (Decolourize) হয় না তাদের গ্রাম পজিটিভ (Gram positive) ব্যাকটেরিয়া বলে। যেমন: স্টেপটোকক্কাস (Streptococcus), স্টেফাইলোকক্কাস (Stephylococcus), নিউমোকক্কাস Pneumococcus) প্রভৃতি।

২। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া (Gram negative bacteria), যে সকল ব্যাকটেরিয়াকে কার্বল ফুক্সিন দ্রবণ (Carbol fuchsin solution), দিয়ে রং করে অ্যালকোহল দিয়ে ধৌত করলে রং পরিবর্তন (Decolourize), হয় তাকে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া বলে। যেমন- নাইসেরিয়া গণরিয়া (Neisseria gonorrhoeae), ই-কোলাই (E.coli), সালমোনেলা টাইফি (Salmonella typhi), প্রভৃতি।

৩। অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই (Acid Fast bacilli) যে সকল ব্যাকটেরিয়াকে সাধারণত অ্যাসিড দিয়ে বার বার ধৌত করলেও রং পরিবর্তন হয় না তাকে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই (Acid fast bacilli) বলে।যেমন- মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারক্লোসিস Myucobacterium tuberclosil) মাইকোব্যাকটেরিয়াম ল্যাপরি (Mycobacterium laprae) প্রভৃতি।

টক্সিন (Toxin)

ব্যাকটেরিয়ার দেহে জীবন ধারনের জন্য নানা ধরনের বিপাক সংগঠিত হয়। এই বিপাকের ফলে এর থেকে এক জাতীয় রস নিঃসরিত হয়। সেই রস গুলোকেই বলা হয় টক্সিন। টক্সিন নিঃসরণে যে ধরনের বিপাকীয় কার্যাবলী সংঘটিত হয় তার উপর ভিত্তি করে টক্সিন কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। এক্সেটক্সিন (Exotoxin)

২। এন্ডোটক্সিন Endotixin)।

১। **এক্সোটক্সিন** (Exotoxin): জীবিত ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে যে বিপাকীয় রস নিঃসরণ হয় তাকে এক্সোটক্সিন বলে। যেমন- স্ট্রেপটোকক্কাস এক্সোটক্সিন (Streptococcus exotoxin)

২। **এন্ডোটক্সিন** (Exotoxin): ব্যাকটেরিয়া মারা গেলে তাদের দেহ থেকে যে বিপাকীয় রস নিঃসসরণ হয় তাকে এন্ডোটক্সিন বলে। যেমন- সালমোনেলা টাইফি এন্ডোটক্সিন (Salmonella tayphi endotoxin) ।

ব্যাকটেরিয়ার জীবন প্রক্রিয়া

ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করে দ্বি-মাত্রিক বৃদ্ধি (Binary fission) হরে। এরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বংশবৃদ্ধির কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে। এদের বংশবৃদ্ধির পর্যায় বাদ ধাপগুলো হল-

ক) খাদ্য গ্রহণ পর্যায় (Lag phase),
খ) বংশ বৃদ্ধি পর্যায় (Log phase),
গ) স্থির অবস্থা (Stationary phase),
ঘ) হ্রাস পর্যায় (Phase of decline)

ক) খাদ্য গ্রহণ পর্যায় (Lag phase), এই পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া যুগপৎভাবে খাদ্য গ্রহণ ও বিপাকের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রথম পর্যায়ে কোষ বিভাজন হয় না। তবে এই অবস্থা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। যেহেতু ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে সম্পন্ন হয়। সেই জন্য বংশ বৃদ্ধিকে বহু গুণে বৃদ্ধি পাওয়া

(Multiplication) বলা হয়। এই পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া খাদ্য গ্রহণ করে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বহু গুণে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

খ) বংশবৃদ্ধি পর্যায় (Log phase), এই পর্যায় খাদ্য গ্রহণ পর্যায়ের পরবর্তী ধাপ। খাদ্য গ্রহণের পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি আরম্ভ করে থাকে। ব্যাকটেরিয়া দ্বি-বিভাজন প্রাক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে। একটি কোষ বিভক্ত হয়ে দুইটি কোষে পরিণত হয়। দুইট নতুন কোষ হতে আরও দুইটি কোষ সৃষ্টি হয়। সুতরাং কয়েক মিনিট থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ গাণিতিক হারে বংশবৃদ্ধির হিসাব '১+২+৩+৪+৫+... ...+ অসংখ্য' এই নিয়মে করা হয় এবং জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধির এই হিসাব ১+২+৪+৮+১৬+... ... +অসংখ্য' এই নিয়মে করা হয়। কিন্তু দ্বি-মাত্রিক (Binary fission) হারে বংশবৃদ্ধির হিসাব '১+২+৮+৩২+.. ... +অসংখ্য' এই নিয়মে করা হয়। ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি দ্বি-বিভাজন প্রাক্রিয়ায় দ্বি-মাত্রিক (Binary fission) হারে সম্পন্ন হয়। ফলে জীবন চক্রের এই ধাপে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ গুণে বৃদ্ধি পায়।

গ) স্থির অবস্থা (Staionary phase): এই ধাপে ব্যাকটেরিয়ার জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান থাকে। জন্ম ও মৃত্যু হার সমান থাকার জন্য ব্যাকটেরিয়ার জীবন চক্রের এই পর্যায়কে স্থির অবস্থা বলা হয়া।

ঘ) হ্রাস পর্যায় (Phase of decline): এই ধাপে ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু হার জন্ম হারের চেয়ে অনেক বেশি। তাই এই ধাপে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা হ্রাস পায়।

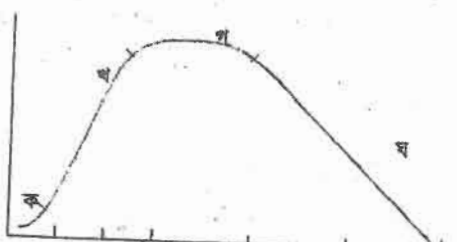

ব্যাকটেরিয়ার জীবন চক্রকে ডান পাশের লেখা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। চিত্রে 'ক' খাদ্য গ্রহণ, 'খ' বংশবৃদ্ধি, 'গ' স্তির অবস্থা এবং 'ঘ' হ্রাস পর্যায় সূচিত করছে।

ফ্লাজেলা (Flagella): ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজম হতে কোষ প্রাচীর ভেদ করে দীর্ঘ বা লম্বা সুতার মত যে অংশ বের হয় তাকে ফ্লাজেলা বলে। ফ্লাজেলা ব্যাকটেরিয়া চলন অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। এটির সাহায্যে এরা চলাচল করতে সক্ষম হয়। ফ্লাজেলার উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক) পেরিট্রাইকাস (Peritrichous),
খ) এমফিট্রাইকাস Amphirrichous),
গ) লফোট্রাইকাস (Lophotrichous),
ঘ) মনোট্রাইকাস Monotrichous) ।

ক) পেরিট্রাইকাস (Peritrichous),

যে সব ব্যাকটেরিয়ার চার পাশে ফ্লাজেলা থাকে তাদের পেরিট্রাইকাস বলে। যেমন- সালমোনিলা টাইফি Salmonella typhi)

খ) এমফিট্রাইকাস Amphirrichous), যে সব ব্যাকটেরিয়ার দুই পাশে একটি করে ফ্লাজেলা থাকে তাদের এমফিট্রাইকাস বলে। যেমন স্পিরিলাম সারপেনস (Spirillum serpens) ।

গ) লফোট্রাইকাস (Lophotrichous), যে সব ব্যাকটেরিয়ার এক পাশে অথবা উভয় পাশে এক গুচ্ছ ফ্লাজেলা থাকে তাদের লফোট্রাইকাস বলে। যেমন– স্পিরিলাম মাইনাস (Spirillum minus)।

ঘ) মনোট্রাইকাস Monotrichous) ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়ার এক পাশে একটি মাত্র ফ্লাজেলা থাকে তাদের মনোট্রাইকাস বলে। যেমন– ভিব্রিত্ত কলেরি (Vibrio cholerae)।

ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির উপকরণ : ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য কিছু উপাদান প্রয়োজন হয়। এগোলো হলো

১। শক্তির উৎস (Sorce of energy)ঃ কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড।

২। বৃদ্ধির উপকরণ (Growth factor)ঃ নিকোটিনিক অ্যাসিড, ফলিক অ্যাসিড, থায়ামিন, প্যারাএমিনো বেনজয়িক এসিড।

৩। প্রয়োজনীয় উপাদান (Essintial elements)ঃ ম্যাগনেসিয়াম, ফেরাস ইত্যাদি।

৪। অক্সিজেন (Oxygen)ঃ কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যাদের বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয় আবার কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না।

৫। কার্বন–ডাই–অক্সাইড (Co2)ঃ কিছু ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির জন্য শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ কার্বন–ডাই–অক্সাইড প্রয়োজন।

৬। তাপমাত্রা (Temperature)ঃ ব্যাকটেরিয়ার পুষ্টির জন্য ন্যূনতম তাপমাত্রা ৩৭° সেলসিয়াস।

৭। অন্যান্য উপাদান (Oter fector)ঃ ব্যাকটেরিয়ার পুষ্টির জন্য জলীয় চাপ এবং লবণাক্ততার প্রয়োজন হয়।

ভাইরাপস (Virus)

ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রাণী। এদের দেখতে ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ভাইরাস এর মাঝে ডিএনএ বা আরএনএ বিদ্যমান থাকে। নিইক্লিয়াস না থাকায় গঠনের দিক থেকে ভাইরাস একটি পরিপূর্ণ কোষ নয় বলে ভাইরাসকে সাবসেলুলার বা ননসেলুরার বলা হয়। আবার ভাইরাসকে আন্তঃকোষীয় পরজীবীও (Intercellulur parasite) বলা হয়। ভাইরাস দেখতে এতো ক্ষুদ্র যে এদের সনাক্ত করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। ভাইরাস কখনও জীব আবার কখনও জড় পদার্থের ন্যায় আচরন করে। ভাইরাস একটি পরিপূর্ণ কোষ নয় বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভাইরাস সনাক্ত করা, তাদের প্রতিরোধ করা এবং সর্বোপরি ধ্বংস করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। ভাইরাস সংক্রমিত রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কথিত আছে যে, 'ঔষধ খেলে সাত দিন আর না খেলে এক সপ্তাহ'। বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির সংরক্ষণ ভাইরাস–এর কারণে হয়ে থাকে। যেমন– এইডস, হেপাটাইটিস, ইনফ্লুলেঞ্জা প্রভৃতি।

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of virus)ঃ

১। ভাইরাস অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবাণু।

২। ইলেক্ট্রণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এটা দেখা যায় না।

৩। এদের কালচার মিডিয়াতে বংশবৃদ্ধি করা যায় না।

৪। এদের বংশবৃদ্ধি হয় রেপ্লিকেশন (DNA বা RNA এর যৌন গঠনের দ্বি–করণ)–এর মাধ্যমে

৫। ভাইরাস এ রাইবোজম অনুপস্থিত থাকে।

ভাইরাসের আকার ও আকৃতি (Shape & size of virus)ঃ

ভাইরাসের আকার সাধারণত ২০ থেকে ৩০০ ন্যানো মিটার। ভাইরাস বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে এবং এদের আকারেরও বিভিন্নতা রয়েছে। এরা লম্বাকৃতি, বুলেট আকৃতি অথবা ইট এর আকৃতির মতো হয়ে থাকে। এদরে গঠন প্রণালি অত্যন্ত জটিল। ভাইরাস–এর আকৃতি ক্যাপসিড–এর উপর নির্ভির করে। ক্যাপসিড ভাইরাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন ভাইরাসের ক্যাপসিড বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে । নিচে ভাইরাসের আঙ্গিক গঠনের উপাদানসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

ভাইরাসের অঙ্গসংস্থান (Morphology of virus)ঃ

১। নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid),

২। ক্যাপসিড (Capsid),

৩। ভাইরাস প্রোটিন (Virus protein),

৪। এনভেলপ (Envelope),

৫। রাসায়নিক মিশ্রণ (Chemical composition)

১। নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)ঃ নিউক্লিক অ্যাসিড ভাইরাসের ভেতরে অবস্থিত। নিউক্লিক অ্যাসিড–এর মধ্যে এক–সূত্রক অথবা দ্বি–সূত্রক ডিএনএ অথবা দ্বি–সূত্রক বা এক–সূত্রক আরএনও থাকে। শুধুমাত্র ভাইরাসের বংশগতির উপকরণ এক–সূত্রক ডিএনএ অথবা এক–সূত্রক বা দ্বি–সূত্রক আরএনএ দিয়ে গঠিত। নিউক্লিক অ্যাসিড কখনও লম্বাকৃতি আবার কখনও গোলাকার হতে পারে। ডিএনএ সর্বদাই একক অণু কিন্তু আরএনএ কখনও একক অথবা কয়েকটি অণু একসাথেও হতে পারে। বেশিরভাগ ভাইরাসের জীনিসে একটিমাত্র কপি থাকে। এদের হ্যাপলয়েড (Haploid) বলে।

২। ক্যাপসিড (Capsid)ঃ নিউক্লিক অ্যাসিডের চারপাশে যে প্রোটিন আবরণ থাকে তাকে ক্যাপসিড বলে। ক্যাপসমিয়ার (Capsomer) নামক পদার্থ দিয়ে ক্যাপসিড গঠিত। প্রত্যেক ক্যাপসমিয়ার এক বা একাধিক প্রোটিন দিয়ে গঠিত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এদের গোলকের ন্যায় দেখায়। কখনও আবার একটি গর্তের মতো দেখায়। ক্যাপসিড-এর বিভিন্ন ধরনের আকার আছে। ক্যাপসিডগুলো কমপক্ষে ২০ ধরনের কোণাকৃতি হতে পারে। এর বিভিন্ন প্রান্ত রয়েছে। আবার ক্যাপসিডগুলো বড় আকৃতির বা লম্বা আকৃতিরও হয়ে থাকে। এর প্রান্তগুলি শক্ত বা নমনীয় হয়।

৩। ভাইরাল প্রোটিন (Viral proteins)ঃ ভাইরাল প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। বাইরের ক্যাপসিড প্রোটিন ভাইরাসের ভেতরের বংশগতির উপাদানগুলোকে রক্ষা করে। বাইরের প্রোটিনগুলো এর দেহে এন্টিবডি তৈরি করে। এন্টিবডিগুলো ভাইরাসের প্রোটিনগুলোর সাথে মিলিত হয় এবং এরা বংশবৃদ্ধি করে। বাইরের প্রোটিনগুলো এভাবে প্রতিরোধের (Immune) কাজ করে। কিছু ভাইরাস প্রোটিনগুলো তৈরি করে এবং এগুলো সুপার এন্টিজেন-এর মতো কাজ করে।

৪। এনভেলাপ (Envelop)ঃ এনভেলাপ হলো একপ্রকার লিপোপ্রোটিন, যা লিপিড দিয়ে গঠিত। সাধারণভাবে এনভেলাপ ভাইরাসে অস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে। যে সব ভাইরাসের এনভেলাপ আছে তারা তাপ, ডিটারজেন্ট, এলকোহল এবং ইথারের প্রতি সংবেদনশীল।

ভাইরাসের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Virus)ঃ নিউক্লিক অ্যাসিডের উপর ভিত্তি করে ভাইরাসকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) ডিএনএ ভাইরাস (DNA Virus),
খ) এরএনএ ভাইরাস (RNA Virus)।

ক) ডিএনএ ভাইরাস (DNA Virus)ঃ যে সকল ভাইরাস-এর নিউক্লিক এসিডের মাঝে ডিএনএ বিদ্যমান তাকে ডিএনএ ভাইরাস বলে। এ সকল ভাইরাসের গঠন প্রণালি অত্যন্ত জটিল। যথা-

i) পারভোভাইরাস (Parvovirus), ii) পাপোভাইরাস (Papovavirus), iii) এডিনোভাইরাস (Adenovirus), iv) হার্পিসভাইরাস (Herpesvirus), v) পক্সভাইরাস (Pox virus) প্রভৃতি।

i) পারভোভাইরাস (Parvovirus)ঃ এই ভাইরাস অত্যন্ত ছোট। এদের ব্যাসার্ধ ২২ ন্যানমিটার। এদের এক-সূত্রক বিশিষ্ট ডিএনএ আছে। এরা সিকেল সেল এনিমিয়া ও ইরাইথ্রিমা ইনফেক্টিওসাম রোগ সৃষ্টি করে।

ii) পাপোভাইরাস (Papovavirus)ঃ এই ভাইরাসের ব্যাসার্ধ ৫৫ ন্যানোমিটার এদের দ্বি-সূত্রক বিশিষ্ট গোলাকার ডিএনএ আছে। ইমিউনোসাপ্রেসড কিডনী ট্রান্সপরান্ট রোগীদের মূত্রে এ ধরনের ভাইরাস দেখা যায়।

iii) এডিনোভাইরাস (Adenovirus)ঃ এই ভাইরাসের ব্যাসার্ধ ৭৫ ন্যানোমিটার। এদের দ্বি-সূত্রক লম্বা রেখার মতো ডিএনএ আছে। ফ্যারিংজাইটিস (Pharyngitis), শ্বসনতন্ত্রের প্রদাহের জন্য এডিনোভাইরাস দায়ী।

iv) হার্পিসভাইরাস (Herpesvirus)ঃ হার্পিসভাইরাস-এর ব্যাসার্ধ ১০০ ন্যানমিটার। এদের ডিএনএ দ্বি-সূত্রক বিশিষ্ট এবং দেখতে লম্বা রেখার মতো। এরা বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করে।

v) পক্সভাইরাস (Pox virus)ঃ এরা হলো সবচেয়ে বড় ভাইরাস। এরা দেখতে ইটের মতো। এই ভাইরাসের উপর এনভেলাপ রয়েছে এবং এদের ক্যাপসিড অত্যন্ত জটিল। পক্স ভাইরাস ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি করে ও পক্স তৈরি করে। গুটিবসন্ত এই ভাইরাস-এর জন্য হয়।

খ) আরএনএ ভাইরাস (RAN virus)ঃ যে সব ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডে এরএনএ বিদ্যমান তাকে এরএনএ ভাইরাস বলে। এরএনএ ভাইরাস এক–সূত্রক হতে পারে আবার দ্বি–সূত্রকও হতে পারে। আরএনএ ভাইরাস গুলো হলো–
i) ক্যালিসিভাইরাস (Calicivirus), ii) রিওভাইরাস (Reovirus), iii) ফিলোভাইরাস (Filovirus), iv) করোনা ভাইরাস (Coronavirus) ইত্যাদি।

i) ক্যালিসিভাইরাস (Calicivirus)ঃ এই ভাইরাস এর ব্যাসার্ধ ৩৮ ন্যানোমিটার। ক্যালিসি ভাইরাস এর আরএনএ এক–সূত্রক বিশিষ্ট এবং আকৃতি সোজা রেখার মতো।

ii) রিওভাইরাস (Reovirus)ঃ রিওভাইরাসের ব্যাসার্ধ ৭৫ ন্যানোমিটার। এদের আরএনএ দ্বি–সূত্রক বিশিষ্ট এবং এতে ১০টি ভাগ রয়েছে। রিওভাইরাস শিশুদের ডাইরিয়া সৃষ্টি করে।

iii) ফিলোভাইরাস (Filovirus)ঃ এই ভাইরাসগুলোর এনভেলাপ রয়েছে। এদের এরএনএ এক–সূত্রক লম্বা এবং আকৃতি রেখার মতো। এদের আরএনএ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত নয়। এদের ব্যাসার্ধ ৮০ ন্যানোমিটার।

iv) করোনা ভাইরাস (Coronavirus)ঃ এই ভাইরাসগুলোর এনভেলাপ রয়েছে এবং এদের নিউক্লিওক্যাপসিড প্যাঁচানো। এদের আরএনএ এক–সূত্রক এবং আকৃতি রেখার মতো। এরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত নয়। করনা ভাইরাস মানুষের শ্বসনতন্ত্রে (Respiratory tract) প্রদাহ সৃষ্টি করে।

এ ছাড়াও মিজলস ভাইরাস (Measles virus) দ্বারা হাম জ্বর, মামস ভাইরাস (Mumps virus) দ্বারা মামস্ রোগ, হান্টা ভাইরাস (Hanta virus) দ্বারা নিউমোনিয়া, রোটা ভাইরাস (Rota virus) দ্বারা ডাইরিয়া, র‍্যাবিস ভাইরাস (Rabies virus) দ্বারা জলাতংক, ডেঙ্গু ভাইরাস (Dengue virus) দ্বারা ডেঙ্গু জ্বর প্রভৃতি হয়ে থাকে।

ছত্রাক (Fungi)

ছত্রাক বহুকোষী অণুজীব। অনেক ছত্রাক মানুষের রোগ সৃষ্টি করে থাক। কিছু কিছু ছত্রাক মানুষের রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়। আবার কিছু ছত্রাক মানুষের উপকার করে থাকে। যেমন পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়। এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বড় সাফল্য। এই এন্টিবায়োটিক দিয়ে বহুবিধ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা হয়। ছত্রাক স্পোর–এর মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে।

ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of fungi):

১। এরা সাধারণত বহুকোষী এবং দেখতে সুতার মতো।
২। এরা বেশির ভাগই রোগ সৃষ্টি করে না।
৩। এরা বাডিং বা স্পোর এর মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে।
৪। অধিকাংশ ছত্রাকই গ্রাম পজিটিভ।
৫। এদের দেহে কোন ক্লোরোফিল নেই।
৬। এদের দ্বারা অ্যান্টিবায়োটিক ও বিভিন্ন ঔষধ তেরি করা হয়।

ছত্রাকের গঠন (Structure)

ছত্রাক হলো আদিকোষ প্রাণী। ছত্রাকের রয়েছে সুগঠিত কোষ প্রাচীর। এদের কোষ প্রাচীর লম্বা পলিপেপটাইড চেইন দ্বারা গঠিত। ছত্রাকের কোষ পর্দায় (Cell membrene) আর্গোসটেরল বিদ্যমান। মানুষের কোষ পর্দায় যেখানে কোলেস্টেরল থাকে, ছত্রাকের সেখানে আর্গসটেরল (Ergosterol) থাকে। বিভিন্ন তাপমাত্রায় ছত্রাক বিভিন্ন আকৃতি ধারন করে।

ছত্রাকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of fungi :

১। অঙ্গসংস্থান এর উপর ভিত্তি করে ছত্রাককে ৪টি শ্রেণিতে বিভাক্ত করা হয়। যথা :–
ক) মোল্ড ছত্রাক (Mould fungi), খ) ইস্ট ছত্রাক (Yeast fungi), গ) ইস্ট সদৃশ ছত্রাক, (Yeast like fungi এবং ঘ) ডিমরফিক ছত্রাক (Dimorphic fungi)।

ক) মোল্ড ছত্রাক (Mould fungi) মোল্ড ছত্রাকগুলো দেখতে সুতার মত। এইগুলি শাখা–প্রশাখা যুক্ত হতে পারে। শাখা–প্রশাখা যুক্ত মোল্ড ছত্রাককে হাইফে (Hyphae) বলে। মোল্ড ছত্রাকগুলি স্পোর এর মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে যা অযৌন কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

খ) ইস্ট ছত্রাক (Yeast fungi) : ইস্ট ছত্রাকগুলো সাধারণত এককোষী হয়ে থাকে। এরা ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার আকৃতির হয়। ইস্ট ছত্রক বাডিং প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে।

গ) ইস্ট সদৃশ ছত্রাক (Yeast like fungi) : এরা বাড এবং সিউডেহাইফি তৈরি যা বাডিং (Buddiing) কোষ কে লম্বালম্বি ভাবে বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

ঘ) ডিমরফিক ছত্রাক (Dimorfhic fungi) : যে সব ছত্রাকের দুইটি আকার রয়েছে, যেমন :– হাইফি এবং ইস্ট, তাদের ডিমরফিক ছত্রাক বলে। যথা :– হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটাম (Histoplasma capsulatum), কক্সিডিওইডিস ইমিটিস (Coccidioides immitis)।

২। বংশবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে ছত্রাককে ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন :–
ক) ইমপারফেক্ট ছত্রাক (Imperfect fungi) ও খ) পারফেক্ট ছত্রাক (Perdect fungi)।

ক) ইমপারফেক্ট ছত্রাক (Imperfect fungi)ঃ যে ছত্রাকের বংশবৃদ্ধিতে কোন যৌন ধাপ নেই তাকে ইমপারফেক্ট ছত্রাক বলে।

খ) পারফেক্ট ছত্রাক (Perfect fungi)ঃ যে সব ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি যৌন প্রক্রিয়ার সংঘটিত হয় তাকে পারফেক্ট ছত্রাক বলে।

৩। স্পোর গঠনের উপর ভিত্তি করে ছত্রাককে ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

ক) অযৌন স্পোর ছত্রাক (Asexual spore fungi), ও খ) যৌন স্পোর ছত্রাক (Sexual spore fungi)।

ক) অযৌন স্পোর ছত্রাক (Asexual spore fungi) ঃ সে সমস্ত স্পোর গঠনের জন্য ছত্রাকের যৌন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না ঐ সমস্ত স্পোরকে অযৌন স্পোর বলে। অযৌন স্পোর আবার কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন–

i) অর্থোস্পোর ছত্রাক (Arthrospore fungi) ঃ অর্থোস্পোরগুলি তৈরি হয় হাইফি বিভক্ত হয়ে।

ii) বরাস্টোস্পোর ছত্রাক (Blastospore fungi) ঃ বরাস্টোস্পোরগুলি বাডিং–এর মাধ্যমে তৈরি হয়।

খ) যৌন স্পোর ছত্রাক (Sexual spore fungi) ঃ যে সমস্ত স্পোর গঠনের জন্য ছত্রাকের যৌন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় ঐ সমস্ত স্পোরকে যৌন স্পোর বলে। যৌন স্পোর কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন–

i) এসকোস্পোর ছত্রাক (Ascospore fungi)ঃ এই প্রক্রিয়ায় ছত্রাক একপিট কোষের মাঝে চার থেকে আটটি স্পোর তৈরি করে। মিয়োসিস বিভাজনের ফলে এসকোস্পোর তৈরি হয়।

ii) ব্যাসিডিওস্পোর ছত্রাক (Basidiospore fungi)ঃ এই প্রক্রিয়ায় ছত্রাক একটি কোষের উপরিভাগে চারটি স্পোর তৈরি করে। মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ব্যাসিডিওস্পোর তৈরি হয়ে।

iii) জাইগোস্পোর ছত্রাক (Zygospore fungi) ঃ এই প্রক্রিয়ায় ছত্রাক বড় ও পূর্ব পর্দাবিশিষ্ট স্পোর তৈরি করে। এই ধরনের স্পোরকে জাইগোস্পোর বলা হয়। একটি হাইফি ভাঙ্গানের ফলে এই ধরনের স্পোর তেরি হয়।

৪। রোগ সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে ছত্রাককে ৫টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

ক) সুপারফিসিয়াল মাইকোসিস ছত্রাক (Super ficial mycoses fungi),

খ) সাবকিউটেনাস মাইকোসিস ছত্রাক (Subcutameous mycoses fungi),

গ) সিস্টেমিক মাইকোসিস ছত্রাক (Sysctmic mycoses fungi),

ঘ) অপরটিনিষ্ট মাইকোসিস ছত্রাক (Opportunist mycoses fungi) ও

ঙ) মাইকোটক্সিন প্রস্তুতকারী ছত্রাক (Mycotcxin producing fungi)।

ক) সুপারফিসিয়াল মাইকোসিস ছত্রাক (Super ficial mycoses fungi) ঃ চুল, মিউকাস মেমব্রেন, চোখ প্রভৃতির উপর ছত্রাকের সংক্রমণকে সুপারফিসিয়াল মাইকোসিস বলে। ছত্রাকের সংক্রমণ–এর ফলে ত্বকে ক্ষত ও চুলকানি (Allergy) দেখা দেয়। ক্যান্ডিডা (Candida), এসপারজিলাস (Aspergillus), ক্রিপটোকক্কাস (Crypto coccus) প্রভৃতি প্রজাতির ছত্রাক মানুষের প্রদাহসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এরা মিউকোকিউটেনার কেন্ডিডায়াসিস, ভেজাইনাটিসসহ ত্বক, চোখ, কান ও অন্যান্য অঙ্গের প্রদাহ সৃষ্টি করে। এছাড়া রিং ওয়ার্ম (Ring worm) নামাক ছত্রাক মানুষের নখ, চুলের গোড়া ও ত্বকে চুলকানিসহ প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ব্যাকটেরিয়ার ক্যাপসুল কাকে বলে?

২। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে?

৩। ফ্লাজেলা বলতে কি বোঝ?

৪। ব্যাপসিড কাকে বলে?

৫। নিউক্লিক অ্যাসিড কাকে বলে?

৬। এনভেলাপ কী?

৭। ডিএনএ ভাইরাস কাকে বলে?

৮। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে?

৯। আরএনএ ভাইরাস কাকে বলে?

১০। মোল্ড কী?

১১। ইস্ট কাকে বলে?

১২। সুপারফিসিয়াল মাইকোসিস বলতে কি বোঝ?

১৩। হাইফি কাকে বলে?

১৪। বাডিং কাকে বলে?

১৫। দ্বি-মাত্রিক বৃদ্ধি (Binary fission) কাকে বলে?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্টগুলো উল্লেখ কর।

২। রঞ্জক বৈশিষ্টের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

৩। ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ও স্থিতাবস্থা লেখচিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

৪। চিত্রসহ ফ্লাজেলার ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর?

৫। ছত্রাকের গঠন প্রণালি বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবাণুমুক্তকরণ ও নির্বীজকরণ

জীবাণুমুক্তকরণ ও নির্বীজকরণ

জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization) : জীবাণুমুক্তকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্ত জীবাণুগুলোকে স্পোরসহ ধ্বংস করা বা সরিয়ে ফেলা হয়। স্পোর সহজে ধ্বংস হয় না। জীবাণুমৃক্তকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবাণূ এবং স্পোরকে ধ্বংস করা হয। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবিত জীবাণু বা স্পোরগুলিকে ধ্বংস করা হয় তাকে জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization) বলে।

নির্জীবকরণ (Disinfection) ঃ নির্জীবকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীবণুগুলোর সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হয় যাতে এরা প্রদাহ সৃষ্টি করতে না পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক জীবাণু ধ্বংস হয় কিন্তু সব জীবাণু ধ্বংস হয় কিন্তু সব জীবাণু ধ্বংস হয়না। এতে কিছু জীবাণু ও স্পোর বেঁচে থাকে।

নির্জীবকারক (Disinfectants): নির্জীবকারক হলো বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন ভাবে জীবাণু ধ্বংস করে থাকে।

জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি (Methods of sterilization): চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রধানত দুই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয়। যেমনঃ–

ক) ভৌতিক জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Phsical sterilization)

খ) রাসায়নিক ঝীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Chemical sterilization),

ক) ভৌতিক জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Phsical sterilization), এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুইটি পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্তকরণ করা হয়। যেমনঃ–

১। তাপ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Sterilization buy heat): শুষ্কতাপ প্রক্রিয়া ও বাষ্পতাপ প্রক্রিয়া।

২। বিকিরণ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Sterrilization by radiation): বিভিন্ন প্রকার বিকিরণ প্রয়োগ।

খ) রাসায়নিক জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Chemical sterilization): এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে জীবাণুমুক্তকরণ করা হয়। যেমনঃ–

১) এলকোহল (Aocohol),

২। ফিনল এবং ডেটল (Phenol and dettol)

৩। হ্যালোজেন Halogen)

৪। ফরমালিন বা ফরমালডিহাইড (Formalodehyde)

৫। ইথিলিন অক্সাইড Etheline oxide)

৬। ডিটার্জেন্ট Detergent) ইত্যাদি।

জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতির ব্যবহার (Use of sterilization)

শৈল্য চিকিৎসায় জীবাণুমুক্তকরণ : অস্ত্রপচারের সময় শৈল্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও অন্যান্য বিভিন্ন জিনিষ জীবাণুমুক্ত করতে হয়।

অণুজীব বিদ্যায় জীবাণুমুক্তকরণ: অণুজীব বিদ্যার বিভিন্ন কাজে যন্ত্রপাতি,উপকরণও অন্যান্য বিভিন্ন জিনিস জীবাণুমুক্ত করতে হয়। যেমনঃ– কালচার মিডিয়া প্রস্তুতিতে বিকারক (Reagent) ও ল্যাবরেটরীর বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের সময় জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন হয়।

জীবাণুমুক্তকরণের শ্রেণিবিভাগ (Classification of sterilization): জীবাণুমুক্তকরণ নির্জীবকরণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় করা হয়। তার মধ্যে তাপ প্রয়োগ, রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, বিকীরণ প্রয়োগ এবং ছাকন পদ্ধতি অন্যতম। তাপ (Heat), রাসায়নিক দ্রব্য (Chemical), বিকীরণ (Radia;tion), ছাকন (Filtration) প্রভৃতি প্রক্রিয়া শুধু জীবাণুমুক্তকরণ (Disinfection) অথবা উভয় কাজে ব্যবহার করা হয়। নিচে এদের প্রক্রিয়াগুলো দেয়া হলো।

তাপ প্রয়োগে জীবণুমুক্তকরণ (Steriliztaion by heat): তাপ হলো জীবাণুমুক্তকরণের সবচেয়ে দ্রুত ও ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় কোষের প্রোটিন গুলো জমাট বেধে যায়। ফলে অণুজীবগুলি মারা যায়। অল্প তাপমাত্রা অণুজীব কক্ষগুলোর বিপাকীয় কাজে বাধা দেয়। ফলে জীবাণুগুলো দমন করা সম্ভব হয়। অণুজীব ধ্বংস করার জন্য কখনও অল্প তাপের প্রয়োজন হয় আবার কখনও বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। এই তাপমাত্রার তারতম্য জীবাণুগুলোর ধরনের উপর নির্ভর কলে।

তাপ প্রয়োগের ধরন:

ক) কম তাপে জীবনুমুক্তকরণ (Sterilization at low temperature): ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে।

খ) উ'চ তাপে জীবাণুমুক্তকরণ (Serilization at high temperature): ১০০° সেলসিয়স তাপমাত্রার বেশি।

ক) কম তাপে জীবাণুমুক্তকরণ (Sterioizetion at low temperature):

১। **পাস্তুরীকরণ** (Pasteurization): পাস্তুরীকরণ হলো দুধকে একটি নির্দিষ্ট তাপে গরম করা। যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে করা হয় যাতে দুধে অবস্থিত সকল জীবাণু মারা যায়। এই প্রক্রিয়া এমনভাবে করা হয় যেন দুধের রং গন্ধ, পুষ্টিগত মান সব বিছু অপরিবর্তিত থাকে। এই প্রক্রিয়ায় দুধের জীবাণুমুক্ত করাকে পাস্তুরাইজেশন বলে মায়োব্যাকটেরিয়াম বোভিস (Myobacterium bovis), ই-কোলাই (E.coli) ব্রুসিলা (Brucella) প্রভৃতি প্রজাতীর অণুজীব দুধে উপস্থিত থাকে। পাস্তুরীকরণ প্রক্রিয়ায় এই সব অণুজীবগুলো ধ্বংস করা সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়ায় তরল দুধের প্যাকেট বাজারজাত করা হয়ে থাকে। এই সব প্যাকেটকৃত তরল দুধ দীর্ঘ্যদিন জীবাণুমুক্ত থাকে।

পাস্তুরীকরণ পদ্ধতি (Method of Pasteurization):

i) ফ্লাস পদ্ধতি (Flash method): এটা করা হয় উচ্চ তাপমাত্রায় অল্প সময় ধরে। পদ্ধতিতে তাপ দেওয়া হয় ৭২° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড ধরে।

ii) হোল্ডিং পদ্ধতি (Holding method): এই পদ্ধতিতে তাপ দিতে হয় ৬৩° সেলসিয়াস থেকে ৬৬° সেলসিয়াস তাপমাত্র পর্যন্ত এবং ৩০ মিনিট ধরে।

২) সিরাম ইন্সপিসেসন (Serum inspissation): এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় ৭৫° সেলসিয়াস থেকে ৮৫° সেলসিয়াস এর মধ্যে। ইন্সপিসেসন অর্থ হলো জমাট বাঁধা ছাড়াই প্রোটিণগুলো শক্ত হয়ে যাওয়া। যে সব কালচার মিডিয়াতে সিরাম থাকে তাদের এই প্রক্রিয়ায় জীবাণযুমুক্ত করা হয়।

খ) উচ্চ তাপে জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization at high emperature): সাধারণত নিচে বর্ণিত ২টি প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপে জীবাণুমুক্ত করা হয়। যেমন- ১। শুষ্ক তাপ (Dryu heat) ২। আদ্র তাপ (Moist heat) ।

১। শুষ্কতাপে জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization by dry heat):

শুষ্কতাপের কলাকৌশল: শুষ্কতাপ প্রক্রিয়ায় নিচে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা

যেমন-i) প্রোটিন ডিন্যাচারেশন (Protien denaturation) ii) অক্সিডেটিভ ডেমেজ (Oxidativer damage) iii) টক্সিক ইফেক্ট কঅফ ইলেক্ট্রোলাইট (Toxic effect of elecrolyte) ।

শুষ্ক তাপে সাধারণত ১৬০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেওয়া হয়। অণুজীবগুলি ও এদের স্পোরকে ধ্বংস করার জন্য এক ঘন্টা ধরে তাপ দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় যেখানে তাপ দেওয়া হয় সেখানে শুষ্ক থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

ফ্লেমিং (Fleming): যে বস্তুকে জীবাণু মুক্ত করা হবে তা শিক্ষার উপর রাখা হয়। এবং এটি আস্তে আস্তে গরম হয়ে লাল রং ধারনা করে। এভাবে ফ্লেম (Flame) বা শিখার মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

হট এয়ার ওভেন (Hot air oven): কাচের জিনিষ পত্র, কাঠি কাঁচের সিরিঞ্জ, পাউডার ও তৈলাক্ত জিনিষপত্র হট এয়ার ওভেন এর মাধ্যমে জীবাণু মুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করার জন্য এক ঘন্টা ধরে ১৬০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা ঠিক রাখা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে যায়। হট এয়ার ওভেন হলো এক ধরনের যন্ত্র যেটা দুইটি ধাতুর শক্ত দেয়াল দিয়ে গঠিত এবং এর একটি দরজা আছে। দুইটি দেয়ালের মাঝে বাতাস প্রবেশের জায়গা আছে। এই যন্ত্রটি বিদ্যুৎ বা গ্যাসের সাহায্যে গরম করা হয়। তাপের ফলে ভিতরের বাতাস গরম হয়ে দুই দেয়ালের মাঝখানে এবং গন্তের সবগুলো প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। ১৬০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য এইট থার্মোমিটার বসানো থাকে।

ইনফ্রারেড ইরেডিয়েসন (Infrared irradiadiation): এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয় তাপ এর সাহায্যে। ধাতব সিরিঞ্জ এবং ধাতব পাত্র এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয়।

২। **আদ্র তাপে জীবাণুমুক্তকরণ** (Steriliztion by moist heat): আদ্র তাপে জীবাণুগুলির প্রোটিন ভেঙ্গে দেয় ও জমাট বাঁধায়, ডিএনএ সুত্রক গুলিকে ভেঙে দেয়, ফলে জীবাণু ধ্বংস হয়। আদ্র তাপে অণুজীবের কোষ পর্দাও নষ্ট করে দেয়।

ওয়াটার বাথ (Watar bath)ঃ ওয়াটার বাথ এর মাঝে ১০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে সিদ্ধ করা হয়। ওয়াটার বাথ এর মাধ্যমে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া ও এদের স্পোরগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

১০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পীভবন (Steaming at 100°C) ঃ একই তাপমাত্রায় শুষ্ক তাপের চেয়ে বাষ্পীভবন (Steaming) বেশি কার্যকর। বাষ্পে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয় বেশি। কারণ বাষ্পের জীবাণু বিধংসী শক্তি বেশী রয়েছে। তাই জীবানু ধ্বংসের ব্যাপারে এটি বেশী কার্যকর।

বাষ্পীয় জীবাণুমুক্তকরণ (Stream sterilizer)ঃ স্টীম স্টেরিলাইজার কাপ করে ১০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীর চাপে। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত চাপের প্রয়োজন হয় না। জীবাণুমুক্ত করার জন্য এটি একটি আদর্শ প্রক্রিয়া। যন্ত্রটি একটি ধাতব পাত্র যার দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রকোষ্টের মাঝে সিদ্ধ পানি থাকে। বিদ্যুৎ বা গ্যাসের সাহায্যে পানি সিদ্ধ করা হয়। এবং বাষ্প উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বাষ্প বের করে দেয়ার জন্য যন্ত্রে উপরে একটি ছিদ্র থাকে।

৩। **অটোক্লেভ** (Autocleve) ঃ এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয় বায়ু এবং চাপ প্রয়োগ করে। অটোক্লেভের মধ্যে ১০০ সেলসিয়াসতাপমাত্রার বেশি তাপ দেওয়া হয়। সিদ্ধ করার তাপমাত্রা নির্ভর করে এর চারপাশের বায়ুমণ্ডলের চাপের উপর। উচ্চ তাপমাত্রার বায়ু তখনই পাওয়া সম্ভব যখন বাতাসের চাপ খুব বেশি থাকবে। যখন অটোক্লেভের মুখ বায়ু নিরোধক (Sir-tigt) করে বন্ধ করা হয়, তখন পানি সিদ্ধ হতে শুরু করে। তার পর পানির তামাত্রা ০১০০ সেলসিয়াস এর বেশি হলে অটোক্লেভের ভিতরে বাষ্পীভবন শুরুয হয়। বাষ্পের তাপে এবং চাপে অটোক্লেভের সাহায্যে অতি সহজে জীবাণুমুক্ত করা হয়ে থাকে। সাধারণত ১২১ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড পারদ স্তম্ভ চাপে (15 ib per squarc inch) ১৫ থেকে ৩০ মিনিট রেখে অটোক্লেবের মধ্যে জীবাণুমুক্ত করা হয়। অটোক্লেভ হলো একটা ধাতব পাত্র। এটা প্রেসার কুকারের মতো কাজ করে। এর

ঢাকনার উপরিভাগে রয়েছে একটি নিরাপত্তা ভালব (Safety valve) । বাষ্পের চাপ বেশি হলে নিরাপত্তা ভালবের সাহায্যে অতিরিক্তবাষ্প বের করে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এই যন্ত্রের মধ্যে একটি ডায়াফ্রাম আছে। পানি এই ডায়াফ্রাম এর নিচে থাকে। বিদ্যুৎ বা গ্যাস এর মাধ্যমে পানি গরম করা হয়। পানি বাষ্প হতে অশক্ত করলে ডায়াফ্রামে চাপ বাড়তে থাকে।

অটোক্লেভের সাহায্যে কাজ করার পদ্ধতি

১। যে সমস্ত উপকরণ, শৈল চিকিৎসার যন্ত্রপাতি অথবা যে জিনিসের জীবাণুমুক্ত করতে হবে সেইগুলি অটোক্লেভের ভিতরে রাখ।

২। এবার অটোক্লেভের ঢাকনাটা বন্ধ কর।

৩। সেফটি ভালব ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা কর এবং আভ্যন্তরীন চাপ নির্ধারন কর।

৪। অটোক্লেভে তাপ দাও। তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে অটোক্লেভের ভিতরের বাতাস সজোড়ে বের হয়ে আসতে থাকবে।

৫। বাষ্প বের হতে শুরু করলে এর ট্যাপ (Tap) বন্ধ কর।

৬। ভিতরে বাষ্পের চাপ বাড়তে থাকবে। নির্দিষ্ট পরিমান চাপ বৃদ্ধি পর্যন্ত তাপ দিতে থাক।

৭। নির্দিষ্ট চাপে পৌছার পর ১৫ থেকে ৩০ মিনিট রেখে দাও।

৮। তারপর তাপ দেওয়া বন্ধ কর।

৯। এবার ১০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে এটাকে ঠান্ডা কর।

১০। ধীরে ধীরে ঢাকনা খোল এবং ভেতরে বাতাস প্রবেশ করতে দাও।

এখন অটোক্লেভের ভেতরে রক্ষিত উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র জীবাণুমুক্ত হয়েছে। এইগুলো প্রয়োজন মোতাবেক কাজে ব্যবহার করা যাবে। হাসপাতাল, মাতৃসদন ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রে শৈল চিকিৎসার প্রয়োজনে সাধারণত অটোক্লেভের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা হয়ে থাকে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical method) ঃ

রাসায়নিক দ্রব্যাদি হলো নির্বিজকারক (Disinfectant) । রাসায়নিক নির্বিজকারক দুই ধরনের হতে পারে। যেমনঃ–

১। ব্যাকটেরিসিডাল (Bactericidal) ঃ যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে তাদের ব্যাকটেরিসিডাল বলে।

২। ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক (Bacteriostatic) ঃ যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি জীবাণুগুলো বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের বাকটেরিওস্ট্যাটিক বলে।

শৈল চিকিৎসা ও অস্ত্রপচারের উপকরণ, স্লাইড, কালচার মিডিয়া প্রভৃতির জীবণুমুক্তকরণে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ জীবাণুমুক্তকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়। নিচে জীবাণুমুক্তকরণ কাজে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের পর্মাডায়ক্রমিক বর্ণনা দেয়া হলো:

১) ইথাইল এলকোহল (Ethyl alcohol) ঃ রেক্টিফায়েড স্পিরীট বা ৭০% ইথাইল এলকোহল জীবাণুমুক্তকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়। ইথাইল এলকোহল জীবাণুগুলোর প্রোটিন জমাট বেঁধে দেয় যার ফলে জীবাণুগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২। ফিনল এবং ডেটল (Phenol and dettol)ঃ ফিনল এবং ডেটল জীবানু নাশক হিসাবে বহুল ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটা কম ব্যবহৃত হয়। ফিনল এবং ডেটল জীবাণুর প্রোটিনকে জমাট বাঁধায়। বর্তমানে জীর্বাণুমুক্তকরণ কাজে শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ ফিনল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩) হ্যালোজেন (Halogen)ঃ ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনকে রাসায়নিক পরিভায়ায় হ্যালোজেন বলা হয়।

সব রাসায়নিক দ্রব্যে কোন কোন জীবাণু ধ্বংস হয়। বিশেষ করে বিরচিং পাউডারে ক্লোরিন থাকায় জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে বিরচিং প্যাউডারে ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। আবার আয়োডিন এবং ব্রোমিনও কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্তকরণ কাজে সরাসরি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪) ফরমালিন বা ফরমালিডিহাইড (Formalodehyde)ঃ ফরমালিন বা ফরমালডিহাইড স্পোরকে ধ্বংস করে থাকে। বাষ্পীয় ফরমালডিহাইডের জীবাণু ধ্বংসকরার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। ঘর বিছানা এবং কাপড় জীবাণুমুক্ত করতে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। ৪০% ফরমালিডিহাইড জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৫। ইথিলিন অক্সাইড (Ethyline oxide) ঃ এটা গ্যাসীয় জীবাণু ধ্বংস কারক। এটা প্লাষ্টিক, রবারের জিনিস, জটিল যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

৬) ডিটার্জেন্ট (Dertergent) ডিটার্জেন্ট জীবাণুর কোষ পর্দা নষ্ট করে এবং বাকটেরিয়া ধ্বংস করে। বিভিন্ন ধরনের ডিটারর্জেন্ট রয়েছে। এরা জীবাণু ধ্বংস করে থাকে।

বিকিরণের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করণ (Steriliztion bhy radiation)ঃ

বিভিন্ন রশ্মির বিকিরণ জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এরা জীবাণুর ডিএনএ এর উপর কাজ করে। এই রশ্মিগুলো ডিএনএ ধ্বংস করতে পারে। গামা রশ্মি (Gamma ray), আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultraviolet rey), এক্স-রে (x-ray) প্রভৃতি রশ্মি জকীবাণু ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে গামা রশ্মির বেশি ক্ষমতা রয়েছে।

গামা রশ্মি (Gamma ray) ঃ সাধারণত নিচের জিনিস গুলি জীবাণুমুক্ত করার কাজে গামা রশ্মি ব্যবহার করা হয়। যেমন-

ক) ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ
খ) নিড্‌ল
গ) ট্রান্সফিউশন উপকরণ
ঘ) বায়োলজিকেল দ্রব্যাদি।

আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultraviolet ray)ঃ

এই রশ্মি সাধানত ঔষধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও কোন কোন শৈল চিকিৎসায় অপারেশন থিয়েটার জীবানুমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ছাকন (Filtration) ঃ নিচে উল্লেখিত ক্ষেত্রসমুহে জীবাণুমুক্তকরণ কাজে ছাকন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ-

১। খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ কাজে।
২। দ্রবীভূত পদার্থ জীবাণু থেকে আলাদা করতে।
৩। ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়া আলাদা করতে।
৪। ভাইরাসের আকার সনাক্ত করতে।
৫। পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বা মিডিয়া জীবাণুমুক্তকরণ কাজে।

প্রশ্নমালা

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। জীবাণুমুক্তকরণ কাকে বলে?

২। নির্জীবকরণ কাকে বলে?

৩। পাস্তুরীকরণ কাকে বলে?

৪। ফ্লেমিং কি?

৫। ওয়াটার বাথ কাকে বলে?

৬। হট এয়ার ওভেন কি?

৭। অটোক্লেভ বলতে কি বোঝ?

৮। ফরমালিন কি?

৯। আদ্র তাপ বলতে কি বোঝ?

১০। ইনফ্রারেড রেডিয়েশন কী?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। একটি অটোক্লেভের গঠণপ্রণালি বর্ণনা কর।

২। জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়ার ব্যবহার উল্লেখ কর।

৩। হট এয়ার ওভেনের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া কর।

৪। বিকিরণের সাহয্যে কি ভাবে জীবাণু ধ্বংস করা যায় বর্ণনা কর।

৫। রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে কি ভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয় বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রদাহ ও প্রদাহের প্রকারভেদ

প্রদাহ ও প্রদাহের প্রকারভেদ

প্রদাহ (Inflammtion)ঃ

আঘাত অথাবা সংক্রমণের ফলে কোন রক্তরনালত সমৃদ্ধ টিস্যুতে যে জটিল বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তাকে প্রদাহ বলে। প্রদাহ টিস্যুকে ধ্বংস করেনা তবে প্রদাহ মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। প্রদাহের ফলে মানুষের দেহে হাইপারসেন্সিটিভিটি রি-একশন হয়।

মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার প্রদাহ হয়। সাধারণত প্রদাহের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রদাহের নাম করণ করা হয়ে থাকে। প্রদাহের অবস্থান যে অঙ্গে তার নামের শেষে আইটিস (Itis)কথাটি যোগ করে প্রদাহের নাম উল্লেখ করা হয়। যেমনঃ- এপেন্ডিড সাইটিস (Appendicitis), টনসিলাইটিস (Tonsilitis) ইত্যাদি। এ ছাড়া এর ব্যাতিক্রমও রয়েছে। যেমনঃ-দগ্ধ ক্ষত (Boil), নিউমোনিয়া (Pneumonia) ইত্যাদি। প্রদাহের ইংরেজি পরিভাষা Inflammation শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ ইনফ্লামেয়ার (Inflammare), থেকে, যার অর্থ পুড়ে যাওয়া। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রদাহ বলতে শুধু মাত্র দগ্ধ ক্ষতই বুঝায় না বরং প্রদাহের অনেক ব্যপকতা রয়েছে।

প্রদাহের প্রকারভেদ (Types of inflammation) ঃ

১। **তীব্র প্রদাহ ইনফ্লামেশন** (Acute inflammation) : আঘাত, অস্ত্রপচার অথবা সংক্রমনের ফলে যখন ফ্লুইড, প্লাজমা প্রোটিন, লিউকোসাইট ও নিউট্রোফিল ইত্যাদির ক্ষরণ হয় তখন তীব্র প্রদাহ হয়। আঘাতের ফলে অতিরিক্ত প্রোটিন এবং মৃত কোষযুক্ত তরল পদার্থ ক্ষরণ হয়। যা প্রদাহের জন্য রক্তনালী থেকে বেরিয়ে টিস্যুতে জমা হয়। তীব্র প্রদাহে আঘাত করা হলে তৎক্ষনাত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। এই প্রদাহ কয়েক মিনিট, ঘন্টা অথবা কয়েক দিন স্থায়ী হয়।

২। **স্থায়ী প্রদাহ** (Chronic inflammation) : সংক্রমনের ফলে যখন টিস্যুগুলো নষ্ট হয়ে যায় তখন একই সাথে প্রদাহ এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়। তীব্র প্রদাহ দীর্ঘ স্থায়ী হলে স্থায়ী প্রদাহের রূপ নেয়।

তীব্র প্রবাহের (Acute inflammation) চিহ্ন :

২) তাপ (Heat), ২) লাল হয়ে যাওয়া (Red ness), ৩) ফুলে যাওয়া (Swelling), ৪) ব্যাথা (Pain), ৫) কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া (Loss of function)।

তীব্র প্রবাহের কারণ (Cause of acute inflammation) :

প্রায় সকল ধরনের প্রদাহই কোষের ক্ষতি সাধন করে থাকে। যে সকল সাধারন কারণে তীব্র প্রদাহ হয় তা হলো ঃ

ক) ইনফেক্টাস এজেন্ট (Infectus agent) : ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি অণুজীব প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে। ব্যাকটেরিয়ার কারণেই সাধারনত বেশি প্রদাহ হয়ে থাকে।

খ) ইমিউনোলজিক ইনজুরি (Immunologic injury) : এটি সংবেদনশীলতার বিক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে। যেমনঃ- এলার্জিক রাইনাইটিস (Allergic rhinitis)।

গ) ফিজিক্যাল এজেন্ট (Physical agent) : বিভিন্ন ধরনের আঘাতে থেতলে যাওয়া, কেটে যাঁওয়া, ঠান্ডা, তাপ এবং বিকিরণের ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

ঘ) কেমিক্যাল এজেন্ট (Chemical agent) : শক্তিশালী অ্যাসিড, ক্ষার ও অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে।

ঙ) ন্যাক্রোসিস (Necrosis) : ন্যাক্রোসিস হলো কোষগুলো মৃত হয়ে যাওয়া। টিস্যুতে কোষগুলো মারা গেলেও প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে।

স্থায়ী প্রদাহের কারণ (Causes of chronic inflammation) :

স্থায়ী প্রদাহ সাধারনত তীব্র প্রদাহ থেকে সৃষ্টি হয়। যে সকল কারণে স্থায়ী প্রদাহ হয় তা হলো ঃ

ক) ইনফেক্টাস এজেন্ট (Infectious agent) : মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (Mycobacterum tuberculosis), মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরি (Mycobacterium leprae) প্রভৃতি জীবানুর সংবেদনশীলতার ফলে স্থায়ী প্রদাহ হয়। হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি (Helicobacter pylori) হলো স্থায়ী প্যাস্ট্রাইটিস (Gastritis) এর প্রধান কারণ। এরা গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসার সৃষ্টি করে থাকে।

খ) ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল এজেন্ট (Physical or chemical agent) : দীর্ঘ সময় বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে থাকলে স্থায়ী প্রদাহ হতে পারে। যেমন:- ধূমপান স্থায়ী ব্রংকাইটিস সৃষ্টি করতে পারে, সিলিকা বা বালি ফুসফুসের সিলিকোসিস সৃষ্টি করে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তীব্র প্রদাহ আস্তে আস্তে স্থায়ী প্রদাহের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। অটোইমিউন ডিজিস (Autoimmune desease) এর ফলেও স্থায়ী প্রদাহ হতে পারে। যেমন:- রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (Rheumatiod arthritis)। এটি একটি অটোইমিউন ডিজিস।

এছাড়া, কিছু অজানা কারণেও স্থায়ী প্রদাহ হতে পারে। যেমন:- ক্রহনস ডিজিস (Crohns desease), আলসারেটিভ কোলাইটিস (Ulcerative colitis) ইত্যাদি।

নিরাময় বা পুনঃস্থাপন (Repair) :

ক্ষতিগ্রস্থ কোষসমুহ নতুন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় মেরামত হওয়াকে নিরাময় বা পুনঃস্থাপন (Repair) বলে। প্রদাহের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কোষগুলো অকেজো হয়ে গেলে নতুন টিস্যুর সৃষ্টি হয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। প্রতিস্থাপিত টিস্যুই পূর্বের টিস্যুর স্থান দখল করে। এই প্রক্রিয়াকে পুনঃস্থাপন বা নিরাময় বলা হয়ে থাকে। আবার কখনও কখনও আঘাত অথবা অস্ত্রপ্রচার জনিত কারণে দেহের অভ্যন্তরে অথবা উপরিভাগে কিছু টিস্যু স্থায়ী ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে টিস্যুর পুনঃউৎপত্তির মাধ্যমে উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান পুনরায় সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে পুনঃউৎপত্তি বা রিজেনারেশন (Regeneration) বলে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনঃস্থাপন বা পুনঃউৎপত্তি সংগঠিত হয়। যেমন:-

ক) নিরাময় বা পুনঃস্থাপন (Repair): চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোজক কলা নিরাময় বা পুনঃস্থাপন হয়:

১) নিওভাস্কুলারাইজেশন (Neovascularizaton) : এই প্রক্রিয়ায় নতুন রক্তনালী সৃষ্টি হয়,

২) ফিব্রোব্লাস্ট (Fibroblast) : এই প্রক্রিয়ায় নতুন রক্তনালীর বৃদ্ধি হয়,

৩) ডিপোজিশন (Deposition) : এই প্রক্রিয়ায় কোষের বাইরে নতুন ম্যাট্রিক্স সৃষ্টি হয়,

৪) মিউচুরেশন (Muturation) : এই প্রক্রিয়া তন্তুময় কলা সুগঠিত হয়।

খ) পুনঃস্থাপন বা পুনঃউৎপত্তি (Regeneration) : একই ধরনের নতুন কলা বা কোষ দিয়ে সাধারনতঃ ক্ষতিগ্রস্থ কলার পুণঃস্থাপন হয়ে থাকে। কলা বা কোষের পুণঃস্থাপন সাধারনত তিন প্রক্রিয়ায় হয়। যথা :- লেবায়েল, স্টেবল ও পারমানেন্ট। লেবায়েল ও স্টেবল সেলগুলো পুণরায় তৈরি হতে পারে ও পুণঃস্থাপন হতে সক্ষম যদি ক্ষতিগ্রস্থ কলা বা কোষে কোষ ঝিল্লির উপস্থিতি থাকে।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রদাহ কাকে বলে?

২। প্রদাহের প্রকারভেদ লেখ।

৩। তীব্র প্রদাহের চিহ্নগুলো কি কি?

৪। ন্যাক্রোসিস কী?

৫। নিরাময় কাকে বলে?

৬। ইনফেক্টাস এজেন্ট কী?

৭। প্রদাহের নামকরণ কীভাবে করা হয়?

৮। স্থায়ী প্যাসট্রাইটিসের কারণ কি?

৯। ইমিউনোলজিক ইনজুরি বলতে কি বোঝ?

১০। স্থায়ী প্রদাহ কী?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১১। প্রদাহের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

১২। প্রদাহের কারণগুলো বর্ণনা কর।

১৩। হট এয়ার ওভেনের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

১৪। বিকিরণের সাহায্যে কী ভাবে জীবাণু ধ্বংস করা যায় বর্ণনা কর।

১৫। রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে কী ভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয় বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

পরজীবী ও পরজীবীর প্রকারভেদ

পরজীবী ও পরজীবীর প্রকারভেদ

পরজীবী (Parasite) ঃ যে সকল প্রাণি অন্য প্রাণির উপর বসবাস করে, ঐ প্রাণি হতে খাদ্য গ্রহণ করে নিজে উপকৃত হয় কিন্তু পোষক প্রাণির (Host) ক্ষতিসাধন করে তাকে পরজীবী (Paradite) বলে। যেমন- কৃমি, উকুন, প্লাজমোডিয়াম ইত্যাদি। পরজীবী নিরবে নিভৃতে পোষাক প্রাণির শরীরের এমন ক্ষতিসাধন করতে থাকে যে পোষক প্রাণি বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে না। কখনও কখনও ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, পোষক প্রাণির জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

পরজীবীবিদ্যা (Parasitology) ঃ পরজীবী বিদ্যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি শাখা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় শুধু পরজীবী নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে পরজীবী বিদ্যা বলে।

পরজীবীর শ্রেণিবিভাগ (Classification of parasite) ঃ পরজীবী কখনও এককোষী আবার কখনও বহুকোষী হয়। কোষের ভিত্তিতে অঙ্গসংস্থান মোতাবেক পরজীবীকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। এককোষীদের বলা হয় প্রোটোজোয়া এবং বহুকোষীদের বলা হয় মেটাজোয়া। এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকা, জিয়ারডিয়া ইত্যাদি প্রোটোজোয়া এবং হেলমিন্থস (Helminths) বা ওয়ার্মস (Worms) মেটাজোয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। নিচে পরজীবীর শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো ঃ

১) প্রোটোজোয়া (Protozoa);
২) মেটাজোয়া (Metazoa)।

১। প্রোটোজোয়া (Protozoa) ঃ প্রোটোজোয়া এককোষী প্রাণি। প্রত্যেক প্রোটোজোয়ার একটি একক কোষ রয়েছে যার মধ্যে তার জীবনের সকল কাজ সম্পাদন হয়। প্রোটোজোয়া পরজীবী হয়েও বসবাস করতে পারে আবার একাকী মুক্ত হয়েও চলতে পারে।

প্রোটোজোয়ার শ্রেণিবিভাগ ঃ প্রোটোজোয়াকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ-

ক) রাইজোপোডা (Rhizopoda),
খ) মাসটিগোফোরা (Mastigophora),
গ) স্পোরোজোয়া (Sporozoa),
ঘ) সিলিয়াটা (Ciliata)।

ক) রিজোপোডা (Rhizopoda) ঃ রিজোপোডা শ্রেণির পরজীবীর মধ্যে এককোষী এমিবা অন্তর্ভুক্ত। জীবনচক্রের ভিত্তিতে এমিবা প্রধানত ঃ ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন-

i) অন হ্যাবিটেট (On habitat) ও
ii) সিস্টেমিটিক (Systematic)।

i) অন হ্যাবিটেট (On habitat)ঃ অন হ্যাবিটেট শ্রেণির এমিবা আবার ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন-

ক) আন্ত্রিক এমিবা (Intestinal amoeba),
খ) মুখের এমিবা (Oral amoeba)।

ক) আন্ত্রিক এমিবা (Intestinal amoeba) ঃ এই শ্রেণির এমিবা ৫টি প্রজাতিতে বিভক্ত। যেমন-

১) এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকা (Entamoeba histalytica),
২) এন্টামোইবা কোলাই (Entamoeba coli),

৩) এন্ডোলিম্যাক্স নানা (Ebdolimax nana),
৪) লোডামোইবা বাট্সলি (Lodamoeba butschiii),
৫) ডিনটামোইবা ফ্রাজিলিস (Dientarnoeba fragilis),

ii) সিস্টেমিটিক (Systematic)ঃ চার প্রজাতির সিস্টেমিটিক শ্রেণির এমিবা মানুষের দেহে পরজীবী হিসাবে বসবাস করে। এদের নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। নিচে তাদের বর্ণনা দেয়া হলো:

১) এন্টামোইবা (Entamoeba),
২) এন্ডোলিম্যাক্স (Endolimax),
৩) লোডামোইবা (Lodamoeba),
৪) ডিনটামোইবা (Dientamoeba)।

এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকা (Entamoeba histolytica) ঃ এন্টামোইবো হিস্টোলাইটিকার ব্যাপ্তি পৃথিবী জুড়ে। এটা মানুষের ডাইরিয়া, আমাশয় ও যকৃত রোগ সৃষ্টি করে। এরা বৃহদান্ত্রের মিউকাস ও সাবমিউকাস স্তরে অবস্থান করে এবং এই স্তরের কোষ-কলা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এন্টামোইবা রক্ত স্রোতের সাথে যকৃত, ফুসফুস এবং এমনকি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এ সকল অঙ্গের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে জটিল এমিবিয়াসিস (Amoebiasis) রোগের সৃষ্টি করে।

এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকার জীবনচক্র

(Life cycle of Entamoeba histlytica) ঃ এই পরজীবীর জীবন চক্রে চারটি অবস্থা রয়েছে।
যেমন--
১) সংখ্যাবৃদ্ধি বা ট্রোফোজয়িট ধাপ (Trofozoite stage),
২) প্রাক-আবরণী বা প্রি-সিসটিক ধাপ (Pre-cystic stage),
৩) আবরণ বা সিসটিক ধাপ (Cystic stage) ও
৪) পরিণত বা মেটাসিসটিক ধাপ (Metacystic stage)

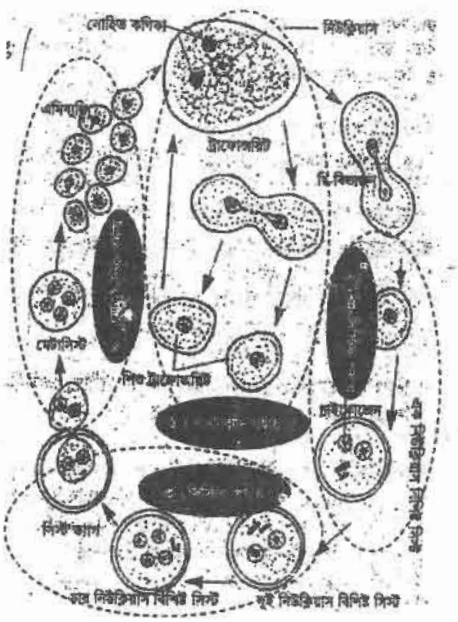

১) **সংখ্যাবৃদ্ধি বা ট্রোফোজয়িট**

(Trofozoite stage) এই পর্যায়ে এন্টামোইবো হিস্টোলাইটিকা চলাচলের উপযোগী হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। তখন এদের আকার থাকে ২০ মাইক্রোমিটার থেকে ৩০ মাইক্রোমিটার।

এই পর্যায়ে এদের কোষে সাইটোপ্লাজম উপস্থিত থাকে। ট্রোফোজয়িট ধাপে নিউক্লিয়াস থাকে ৪ মাইক্রোমিটার থেকে ৬ মাইক্রোমিটার। স্বাভাবিক অবস্থায় এদের নিউক্লিয়াস দেখা যায় না। রঞ্জিত বা স্টেইনিং করলে নিউক্লিয়াস দেখা সম্ভব হয়। এদের নিউক্লিয়াস বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে এরা দেখতে ছোট ডট-এর মতো।নিউক্লিয়াসের উপর একটি পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত হয়ে থাকে।

২। প্রাক–আবরণী বা প্রি–সিসটিক ধাপ (Pre-cystic stage) ঃ এটা সিস্ট তৈরির পূর্বের অবস্থা। এ অবস্থায় দ্বি–বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি পেয়ে বেশ কিছু পরজীবী এদের চারদিকে আবরণ দিয়ে আবৃত হয়ে সিস্ট গঠন করার প্রস্তুতি নেয়। সিস্ট গঠন করার প্রথম অবস্থায় কতগুলো ট্রোফোজয়িট বৃহদান্ত্রের অন্তঃস্থ গহবরে মুক্ত হয়।এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকা দেখতে গোল অথবা সামান্য ডিম্বাকৃতি হয়। এ পর্যায়ে তাদের চলাফেরার তেমন উন্নতি হয় না।এটার একটি নিউক্লিয়াম গ্লাইকোজেন মাস ও ক্রোমাটয়েড আছে। এ অবস্থায় এরা লোহিত রক্ত কণিকা বা হজমকৃত খাদ্য কণিকা পরিত্যাগ করে । ক্রমে এরা সিসটিক পর্যায়ে প্রবেশ করে।

৩। আবরণীবদ্ধ বা সিসটিক ধাপ Cystic stage) ঃ সিসটিক ধাপে এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। এই পর্যায়ে ট্রোফোজয়িটের দেহ নিঃসৃত রসের সাহায্যে চারপাশে একটি অতি সূক্ষ্ম, বর্ণহীন স্বচ্ছ কিন্তু প্রতিরোধক্ষম আবরণী প্রাচীর সৃষ্টি হয়। এ সময় এর ভেতরে একটি নিউক্লিয়াস থাকে বলে একে এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সিস্ট বলে। সিস্টের নিউক্লিয়াস পর পর দুইবার বিভাজনের ফলে চার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট সিস্ট গঠন করে। আবরণীবদ্ধ হতে এদের মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় লাগে। মানবদেহে এদের আর কোন পরিবর্তন ঘটে না। এ অবস্থায় মলের সাথে দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়। এটার আকৃতি গোলাকার এবং এর সিস্ট পর্দা থাকে। সিস্টগুলোর ব্যাসার্ধ ১০ মাইক্রোমিটার থেকে ১৫ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সিস্ট প্রায় এক মাস বেঁচে থাকে।

৪। পরিণত বা মেটাসিসটিক ধাপ (Metacystic stage) ঃ পরিণত সিস্টগুলো এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে স্থানান্তর হ । মলের সাথে যে সব সিস্ট বেরিয়ে আসে তা নানাভাবে খাদ্য দ্রব্য, শাক–সবজি, কিংবা পানিতে মিশতে পারে। শুষ্ক পরিবেশে এরা তাড়াতাড়ি মরে যায়। কিন্তু আর্দ্র পরিবেশে অনেক দিন বেঁচে থাকে। পানীয় অথবা খাদ্যের সাথে সিস্টগুলো মানুষের পৌষ্টিকনালীতে প্রবেশ করলে অবিকৃত অবস্থায় পাকস্থলী অতিক্রম করে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে যায়। সেখানে ট্রিপসিন নামক এনজাইমের প্রভাবে সিস্ট–আবরণ দ্রবীভূত হলে প্রতিটি সিস্ট থেকে চার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট একটি এন্টামোইবা বেরিয়ে আসে।এ অবস্থায় এন্টামোইবার পরিনত বা মেটাসিসটিক ধাপ বলে। ইতোমধ্যে নিউক্লিয়াস ও সাইটাপ্লাজম দ্বি–বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে আটটি অতিক্ষুদ্র এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পাবিশিষ্ট শিশু পরজীবী বা এমিবুলি (Amoebulae) সৃষ্টি হয়। এদের মেটাসিসটিক ট্রোফোজেয়েট বলে। প্রতিটি এমিবুলা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে ট্রোফোজয়ট পর্যায়ে পৌছায় এবং অন্ত্রের সাবমিউকোসা স্তরে বসবাস করে। ট্রোফেজয়ট থেকে সিস্টে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে এন্সিস্টমেন্ট (Encystment) বলে। এটি দ্বি–বিভাজন প্রক্রিয়ায় পুনরায় বংশবৃদ্ধি করে জীবনচক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এন্টামোইবা হিস্টোলইটিকা তাদের জীবনচক্র মানুষের দেহে অতিবাহিত করে। মানুষই তাদরে একমাত্র আশ্রয়দাতা বা ..াষাক (Host)। পরিণত সিস্ট (Cyst) মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। যখন চার নিউক্লিয়াসযুক্ত সিস্ট, খাদ্য বা পানির সাথে মানুষ গ্রহণ করে তখন তারা নিজেরাই বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত হয়। পরিণত সিস্টগুলো পেটের এসিড দ্বারা ধ্বংস হয়না। যখন এরা মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করে তখন তারা বংশবৃদ্ধি শুরু করে। সিস্টগুলো সিকাম বা ইলিয়ামের নিচের অংশে অবস্থান করে। ক্ষুদে পাবিশিষ্ট এমিবুলি (Amoebulae) বৃহদান্ত্র অতিক্রম করতে পারে। এরা চালাফেরা করতে সক্ষম। ট্রোফজ য়েটগুলো আবার প্রি–সিস্টক আকৃতিতে ফিরে আসে। এরপর এরা দুই নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং পরে চার নিউক্লিয়াস যুক্ত সিস্টে পরিণত হয়। অতঃপর এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে ঘটতেই থাকে।

এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকা সংক্রমণের মাধ্যম ঃ সিস্টগুলো সাধারনত দূষিত খাবার এবং পানীয় জলের মাধ্যমে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকা সংক্রমণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরিষ্কার নোংরা পরিবেশের মাধ্যমেও সিস্টগুলো সংক্রমিত হয়ে থাকে।

অন্ত্র, মুখ ও যৌনতন্ত্রে রোগ সৃষ্টিকারী প্রটোজোয়া ঃ নিচে উল্লেখিত প্রোটোজোয়াগুলো মানুষের অন্ত্র, মুখ ও যৌনতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটিয়ে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

ক) জিয়ারডিয়া লামব্রিয়া (Giardia lambria),

খ) সিলোমাস্টিকস ম্যাসনিলি (Vhilomastix mesnili),

গ) ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস (Trichomonas vaginalis)।

ম্যালেরিয়ার পরজীবী বা প্লাজমোডিয়াম (Plasmodium) ঃ পতঙ্গবাহিত রোগগুলোর মধ্যে ম্যালেরিয়া সবচেয়ে মারাত্মক রোগ। প্রতিবছর এ রোগে পৃথিবীতে মোট ১ মিলিয়ন থেকে ৩ মিলিয়ন লোক মারা যায়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪০% মানুষ এখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় রয়েছে। আর এ রোগটি যেহেতু মশার দ্বারা সংক্রমণ হয় তাই 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (World Health Organization) ম্যালেরিয়াকে 'এক নম্বর গণশত্রু' (Public enemy number one) রূপে ঘোষণা দিয়েছে।

ম্যালেরিয়া হচ্ছে এনোফেলিস মশা বাহিত এবং প্লাজকমোডিয়াম শ্রেণিভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির পরজীবী সৃষ্ট মানুষ ও অন্যান্য মেরুদন্ডি প্রণির এক ধরনের মারাত্মক জ্বর। প্রটোজোয়া পর্বের অন্তর্গত স্পোরোজোয়া (Sporozoa) শ্রেণির প্লাজমোডিডিই (Plasmodiidae) গোত্রের প্লাজমোডিয়াম (Plasmodiidae) গোত্রের প্লাজমোডিয়াম (Plasmodium) পরজীবীদের ম্যালেরিয়া পরজীবী বলে।

প্লাজমোডিয়াম প্রকৃতির পরজীবীর মধ্যে প্রায় ৬০টি প্রজাতির পরজীবী আছে যারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এদের মধ্যে চারটি প্রজাতি মানুষের দেহে ম্যালেরিয়ার পরজীবী সৃষ্টিতে সক্ষম। নিচে এদের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১) প্লাজোমোডিয়াম ভাইভেক্স (Plasmodium vivax),

২) প্লাজোমোডিয়াম ফেলসিপেরাম (Plasmodium falciparum),

৩) প্লাজোমোডিয়াম ম্যালেরিয়া (Plasmodium malariae) ও

৪) প্লাজোমোডিয়াম ওভালি (Plasmodium ovale)।

প্লাজমোডিয়াম এর জীবনচক্র ঃ প্লাজোমোডিয়ামের জীবনচক্র ব্যতিক্রম ধর্মী। চক্রটি সম্পন্ন হতে দুটি ধাপে দুটি পোষকের প্রয়োজন লক্ষ করা যায়। যেমনঃ-

ক) মানুষ (Sohizogony) এবং খ) মশকী (Gametogony)।

ক) মানবদেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র (Schizogony)

মানবদেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। মানবদেহের যকৃত ও লোহিত রক্তকণিকায় সংঘটিত প্লাজমোডিয়াম (Plasmdium) এর অযৌন চক্রকে সিজোগনি (Schizogony) বলে। সিজোগনি নিম্নোক্ত দুটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

১) যকৃত সিজোগনি বা হেপাটিক সিজোগনি (Hepatic schizogony) এবং

২) লোহিত রক্তকণিকা সিজোগনি বা এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি (Erythrocytic schizogony)।

১) হেপাটিক সিজোগনি বা যকৃত সিজোগনি ঃ মানুষের যকৃতকোষে সংঘটিত ম্যালেরিয়ার পরজীবীর বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় অযৌন প্রজননকে যকৃত সিজোগনি বা হেপাটিক সিজোগনি বলে। এটি নিম্নোক্ত তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারেঃ

১) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি (Pre-erythrocytiic schizogony),

২) এক্সো-এরিথ্রেসাইটিক সিজোগনি (Exo- erythrocytic svhizogony) এবং

৩) পেস্ট-এরিথ্রোসইটিক সিজোগানি (Post-erythrocytic schizogony)।

নিচে পর্যায়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

i) প্রি–এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি (pre-erythrocytiic schizogony)

এনোফিলিস মশকীর লালাগ্রন্থিতে (Plasmodium) এর স্পোরোজয়েট অবস্থাটি পরিণত অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। এজাতীয় মশকীর দংশনের ফলে স্পোরোজয়েটগুলো লালারসের সাথে মানুষের দেহে কৈশিক নালিকায় রক্তরসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতের মাধ্যমে বাহিত হয়ে কেমোট্যাক্সিস Chemotaxis) এর কারণে যকৃতে এসে আশ্রয় নেয়। এতে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে দেখা যায়।

১) স্পোরোজয়েট Sporozoite) ঃ এগুলো সঞ্চালনক্ষম, অতি ক্ষুদ্র (১৪ um লম্বা ও ১ um চওড়া)ঃ সামান্য বাঁকানো, উভয় প্রান্ত সুঁচালো দেহবিশিষ্ট। এদের দেহ স্থিতিস্থাপক পর্দায় আবৃত। ৪৫ মিনিট পর স্পোরোজয়েটগুলো রক্তরস থেকে যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২) ক্রিপ্টোজয়েট (Cryptozoite) ঃ যকৃত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে স্পোরোজয়েটগুলো গোলাকার ধারণ করে। এ অবস্থায় এদের ক্রিপ্টোজয়েট বলে।

৩) সিজন্ট (Schizont) ঃ প্রতিটি ক্রিপ্টোজয়েটের নিউক্লিয়াস ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে অসংখ্য (প্রায় ১২০০) ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস গঠন করে। বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত এ অবস্থার নামই সাইজন্ট।

৪) ক্রিপ্টোমেরোজয়েট (Cryptomerozoite) ঃ সাইজন্টের প্রতিটি নিউকিণয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজমা হয় এবং নতুন কোষের সৃষ্টি করে। এদের ক্রিপ্টোমেরোজয়েট বলে। পরিণত ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ণ করে যকৃতের সাইনুসয়েড (Sinusoid) যকৃতের অভ্যন্তরে ফাঁকা স্থানে আশ্রয় নেয়। মানবদেহে প্রবেশের পর ম্যালেরিয়ার পরজীবীর প্রথম অযৌন প্রজননকে প্রি–এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি বলে। এসময় একেকটি সিজয়েন্ট থেকে ৮,০০০ থেকে ২০,০০০ মেরোজয়েট সৃষ্টি হয়।

ii) এক্সো–এরিথ্রো সিজোগনি (Exo-erythrocytic) : এক্সো–এরিথ্রো সিজোগনিতে উৎপন মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এবং এক্সো–এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনির সূচনা করে। এতে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো দেখা যায়।

১) সিজোন্ট ঃ পরিণত ক্রিপটোমোরোজয়েটের নিউক্লিয়াস বারংবার বিভক্ত হয়ে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস গঠন কর। বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এ অবস্থাকে সাইজোন্ট বলে।

২) মেটা–ক্রিপ্টোমেরোজয়েটঃ সাইজোন্টের প্রত্যেক নিউক্লিয়াসের চারপাশে সাইটাপ্লাজম জমা হয়ে যে সব নতুন কোষ সৃষ্টি করে সেগুলোকে মেট–ক্রিপোটামেরোজয়েট বলে। আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ হলে এগুলো পুনরায় নতুন যকৃত কোষের ভেতরে প্রবেশ করে এবং একই চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

ii) পোস্ট–এরিথ্রোসাইটিক সিজগনি (Post-eruythrocytic schizogony) যকৃত কোষে সিজোগনি ঘাটানোর পর অধিকাংশ পরজীবীই তরুণ লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে এবং সেখানেই বারংবার সিজোগনি ঘটাতে থাকে। তবে মাঝে মাঝে দেখা যায় এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি ঘটানোর পর কিছু পরজীবী লোহিত কণিকাকে আক্রমণ না করে রক্ত স্রোতের মাধ্যমে পুনরায় যকৃতকোষে এসে পৌছে এবং হেপাটিক সিজোগনি ঘটায়। লোহিতকণিকা ছেড়ে পুনরায় যকৃতকোষে ফিরে এসে পরজীবীর এ ধরনের সিজোগনিকে পোস্ট–এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি বলে। এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি বা লোহিত কণিকায় সংঘটিত সিজোগনি মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় ম্যালেরিয়ার পরজীবীর বহু বিভাজন প্রক্রিয়ায় অযৌন প্রজননকে এরিথ্রোসাইটিক সাজোগনি বলে। এতে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে দেখা যায়।

১) ট্রোফোজয়েট (Trofozite) ঃ হেপাটিক সিজোগনি সম্পন্নের পর সৃষ্টি মেরোজয়েটগুলো লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে খাদ্য গ্রহণ করে স্ফীত ও গোল হয়ে ট্রফোজয়েটে পরিণত হয়।

২) সিগনেট রিং (Signet ring) ঃ পরিণত ট্রফোজয়েটের অভ্যন্তরে একটি গহবর সৃষ্টি হয়ে ক্রমশ তা বড় হয়ে সাইটোপ্লাজমকে পিরিধির দিকে সরিয়ে দেয়, নিউক্লিয়াস ও এক পাশে অবস্থান নেয়। পরজীবীকে তখন পাথর বসানো আংটির মতো দেখায়, একে সিগনেট রিং বলে।

৩) এমিবয়েড ট্রোফোজয়েট (Amoeboid trophzoite) ঃ আট ঘন্টার মধ্যে পরজীবীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্থ গহবর অদৃশ্য হয়ে যায়, ফলে পরজীবীকে অনিয়ত ও ক্ষণপদযুক্ত এমিবার মতো দেখায়। পরজীবীর এ অবস্থাকে এমিবয়েড ট্রফোজয়েট বলে। এর সাইটোপ্লাজমে সাফনার এর কণা (Schuffners dots) দেখা যায়।

৪) সিজোন্ট (Schizont) ঃ ক্ষণপদ বিলিন হয়ে গেলে চলার ক্ষমতা হারিয়ে পরজীবী গোল বা লম্বাকার, প্রায় ৬ থেকে ৭ আকার বিশিষ্ট সাইজন্টে পরিণত হয়। ৩৬ ঘন্টা পর এটি লোহিত রক্তকণিকার প্রায় সবটুকু স্থান দখল করে নেয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোপ্রজয়েন (Hacmozoin) নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়।

৫) মেরোজয়েট (Merozoite) ঃ পরিণত সাইজোন্টে ৪৫ ঘন্টা পর বহু বিভাজন ঘটে ১২ থেকে ১৮টি গোল বা ডিম্বাকার মেরোজয়েট সৃষ্টি করে। এগুলো পাঁপড়ির মতো দুইটি স্তরে সাজানো থাকে। পরজীবীর এ অবস্থাকে রোজেট (Rosctte) বলে। মেরোজয়েট পরিণত হলে রক্তকণিকার আবরণ বিদীর্ণ করে রক্তরসে এসে নতুন লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে এবং বেশ কিছু মেরোজয়েট গ্যামিটোসাইটে পরিণত হয়। গ্যামিটোসাইট সিজোগনি চক্রটি ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়।

৬) গ্যামিটোসাইট (Gametocyte) ঃ পরপর কয়েকটি এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি ঘটবার পর বেশ কিছু মেরোজয়েট লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে এবং পুনঃবিভাজন না ঘটিয়ে দুই ধরনের গ্যামিটোসাইটে পরিণত হয়। কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসযুক্ত স্ত্রী বা ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট ৭ দিনের বেশি বাঁচে না।

খ) মশকীরদেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র (Gametogony)

মশকীর দেহে সংঘটিত ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথাঃ–

১) গ্যামিটোগনি (Gametogony) ও ২) স্পোরোগনি (Sporogony) ।

১) গ্যামিটোগনি (Gametogony) দংশনের মাধ্যমে এনোফেলিস মশকী (Anopheles) ম্যালেরিয়ার পরজীবীবাহি অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে পরজীবীর বিভিন্ন ধাপসহ রক্ত শোষণ করে। ক্রপের পাচক রসের ক্রিয়ায় গ্যামিটোসাইট ছাড়া পরজীবীর অন্য ধাপগুলো হজম হয়ে যায়। যে প্রাক্রিয়ায় গ্যামিটোসাইট থেকে পুরুষ গ্যামিট্র স্ত্রীগ্যামিটর নিষেকের ফলে উও সিস্ট সৃষ্টি হয় তাকে গ্যামিটোগনি বলে। গ্যামিটোগনি দুইটি দুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথাঃ–

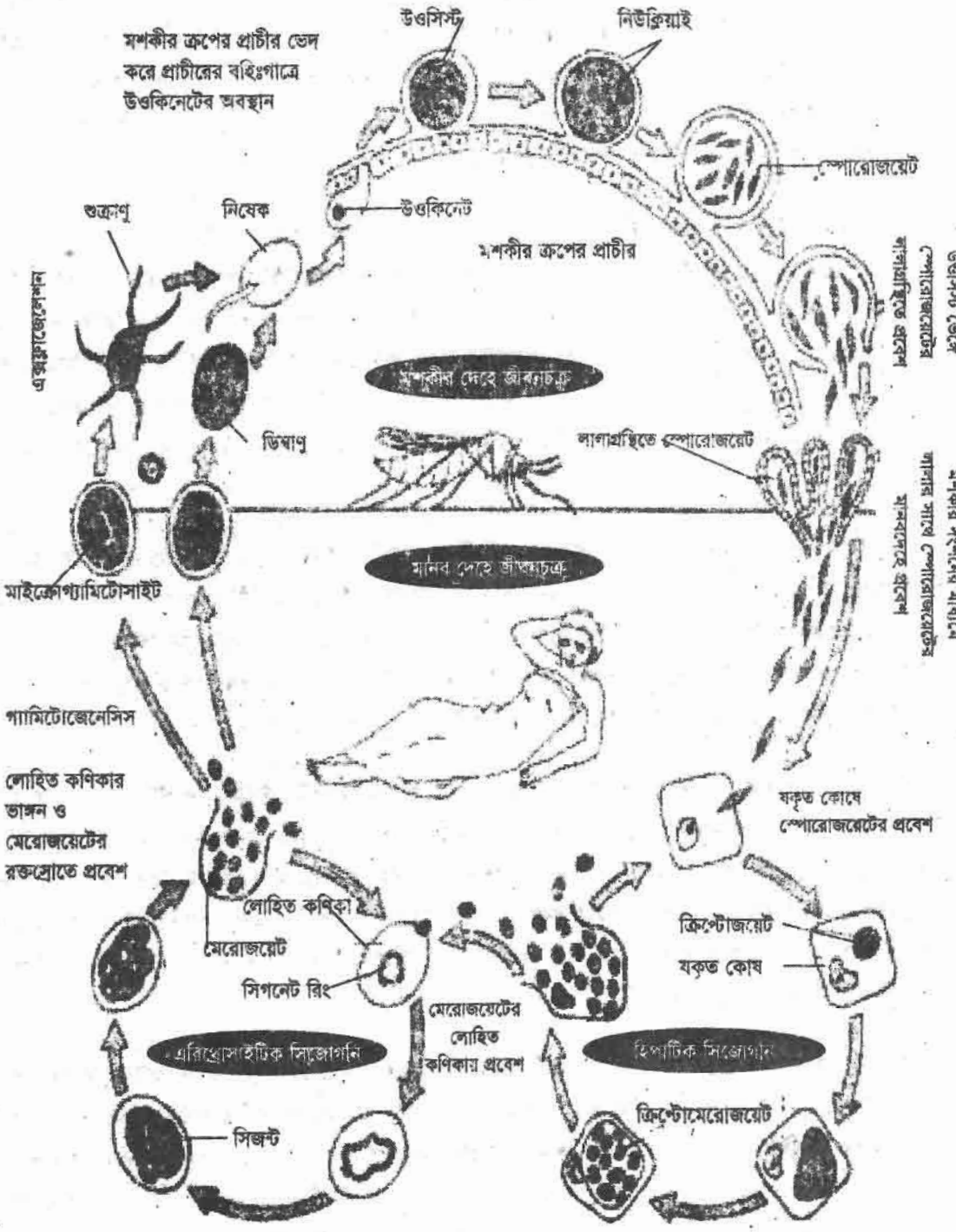
মশকীর ক্রপের প্রাচীর ভেদ করে প্রাচীরের বহিঃগাত্রে উওকিনেটের অবস্থান
উওসিস্ট
নিউক্লিয়াই
স্পোরোজয়েট
উওকিনেট
মশকীর ক্রপের প্রাচীর
শুক্রাণু
নিষেক
এক্সফ্লাজেলেশন
মশকীর দেহে জীবনচক্র
ডিম্বাণু
লালাগ্রন্থিতে স্পোরোজয়েট
মানব দেহে জীবনচক্র
মাইক্রোগ্যামিটোসাইট
গ্যামিটোজেনেসিস
লোহিত কণিকার ভাঙ্গন ও মেরোজয়েটের রক্তস্রোতে প্রবেশ
লোহিত কণিকা
মেরোজয়েট
সিগনেট রিং
এরিথ্রোসাইটিক সিজোগনি
সিজন্ট
মেরোজয়েটের লোহিত কণিকায় প্রবেশ
যকৃত কোষে স্পোরোজয়েটের প্রবেশ
ক্রিপ্টোজয়েট
যকৃত কোষ
হিপাটিক সিজোগনি
ক্রিপ্টোমেরোজয়েট

i) জননকোষ সৃষ্টি (Gametogenesisi) ঃ ফ্লাজেলা সৃষ্টি (Extlagellation) নামে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক মাইক্রোগ্যামিটোসাইট ৪ থেকে ৮ টি মাইক্রো বা পুরুষ গ্যামেট সৃষ্টি করে। এই পক্রিয়ায় প্রথমে মাইক্রোগামিটোসাইটের নিউক্লিয়াস ৪ থেকে ৮টি অপত্য নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়ে পরিধিতে গমন করে। এসময় সাইটোপ্লাজমও ৪ থেকে ৮টি ফ্লাজেলার মত অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে। পরে প্রত্যেক নিউক্লিয়াস এককটি অভিক্ষেপে প্রবেশ করে ৪ থেকে ৮টি লম্বাটে শুক্রাণু (Microgamete) বা পুংগ্যামিট সৃষ্টি করে। এগুলো মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্যও সাঁতার কাটতে থাকে।

অন্যদিকে ম্যাক্রোগামিটোসাইটে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না। এটি স্ফিত হয়ে উঠে এবং পরিপক্কতা লাভের সময় নিউক্লিয়াসটি প্রান্তের দিকে সরে যায়। পত্যেক ম্যাক্রোগামিটোসাইট থেকে একটি ম্যাক্রোগামিট বা স্ত্রীগ্যামিট সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পোলার বডি নামে আরেকটি কোষেরও আবির্ভাব ঘটে তবে তা শিঘ্রই ধবংসপ্রাপ্ত হয়। নিষেকের উদ্দেশ্যে মাইক্রোগামিটক গ্রহণ করার জন্য ম্যাক্রোগামিটের প্রান্তসীমায় একটি অংশ সামান্য ফুলে উঠে কোণ (Cone) সৃষ্টি করে। ম্যাক্রোগামিটোসাইটের সাইটোপ্লাজম ঘন, উজ্জ্বল, নীল রঙের নিউক্লিয়াস ছোট ও ঘনসংবদ্ধ। মাইক্রোগ্যামিটোসাইটের সাইটোপ্লাজম ধুসর নীল, নিউক্লিয়াস বড় ও ছড়ানো।

ii) নিষেক (Fartilization) ঃ পরিণত প্রতিটি ম্যাক্রোগামিটের (স্ত্রী গ্যামিট) চতুর্দিকে অনেক মাইক্রোগ্যামিট (পুরুষ গ্যামিট) এসে ভীড় জমালেও একটিমাত্র মাইক্রোগ্যামিটই অবশেষে নিষেকের সুযোগ পায়। মাইক্রোগ্যামিট প্রথমে ম্যাক্রোগামিটের প্রান্তসীমার ফোলা স্থানের অর্থাৎ কোণ–এর সংলগ্ন হয় এবং পরে ভেতরে প্রবেশ করে। উভয়ের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একীভূত হলে নিষেক সম্পন্ন হয় এবং কোণটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। নিষেকের ফলে ম্যাক্রোগামিট জাইগোট (Zygote)-এ পরিণত হয়।

মশকীর রক্ত শোষণের ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা পর গোল ও নিশ্চল জাইগোটটি কীটের মত লম্বাটে ও সচল হয়ে উঠে। তখন একে উওকিনেট (Ookinete) বলে। এটি লম্বায় ১৮ um থেকে ২৪ um এবং চওড়ায় ৩ um থেকে ৫ um পর্যন্ত হয়। ২৪ ঘন্টার ভেতরেই এটি ক্রপের অন্তঃপ্রাচীর ভেদ করে বহিঃপ্রস্থ পেশীস্তরের মাঝখানে উওকিনেট মশকীর কলা নিঃসৃত রসে তৈরি একটি পাতলা, নমনীয় সিস্ট (Cyst)-এ আবদ্ধ হয়ে গোল আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় পরজীবীকে উওসিস্ট (Oosyst) বলে। এর গায়ে সোনালী–বাদামী দানা ছড়িয়ে থাকে।

উওসিস্টের ভেতরে একটি বড় গহববের সৃষ্টি হয়। বিভক্তিরত নিউক্লিয়াসগুলোও গহবরের চতুর্দিক ঘিরে অবস্থান করে। উওসিস্ট পরিণত হলে তাকে স্পঞ্জের মত দেখায় এবং ক্রপের প্রাচীর থেকে মশকীর দেহগহবরে উদ্গত থাকে। পরিণত উওসিস্টের আকার প্রথমাবস্থা হতে ৪ থেকে ৫ গুণ বড় হয়। অর্থাৎ ৫০ um থেকে ৬০ um পর্যন্ত হয়। একটি মশকী ক্রপের প্রাচীর প্রায় ৫০ থেকে ৫০০ টি উওসিস্ট থাকতে পারে। ক্রপকে তখন ছোট ছোট গুটিময় দেখায়। উওসিস্ট পরিণত হতে ১০ থেকে ২০ দিন সময় লাগে।

২) স্পোরোগনি (Sprofgony) ঃ মশকীর ক্রপের প্রাচীরে উওসিস্টের অযৌন প্রজননকে স্পোরোগনি বলে। মশকী রক্ত শোষণের ৪৭ থেকে ৭৯ ঘন্টার মধ্যে উওসিস্ট প্রথমবার মায়োসিস বিভাজন এবং পরে মাইটোটিক বিভাজনে বারংবার নিউক্লীয় বিভক্তির ফলে বহুকোষী উওসিস্টের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমে বেষ্টিত হয়ে স্পোরোজয়েট্ এ পরিণত হয়। এগুলো হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোজমবাহী। স্পোরোজয়েটগুলো গহবরের চারদিকে বিন্যস্ত থাকে। একটি উওসিস্টে প্রায় দশ হাজার স্পোরোজয়েট থাকতে পারে।

স্পোরোজয়েট পরিণত হলে উওসিস্টের প্রাচীর ফেটে যায় এবং ওরা মশকীর হিমোসিলে মুক্ত হয়। দেহের যে সব কলার সাথে হিমোসিলের মুক্ত সংযোগ রয়েছে স্পোরোজয়েট রক্তবাহিত হয়ে সে সব কলায় প্রবেশ করে। অবশেষে মশকীর লালা গ্রন্থির কোষ গহবরে এসে জমা হয়। এখান থেকে পরে মানুষকে একেকবার কামড়ানোর সময় এগুলোর প্রায় ১০% মানবদেহে প্রবেশ করে। মশকীর লালাগ্রন্থিতে স্পোরোজয়েটগুলো প্রায় দুই মাস অবস্থান করে। এই সময়ের ভেতর এরা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সক্রিয় হয়ে উঠে।

কৃমি বা হেলমিন্থ (Helminth)

কৃমি বা হেলমিন্থ (Helminth) ঃ যে সমস্ত পরজীবী খালি চোখে দেখা যায় তাদের মধ্যে কৃমি বা হেলমিন্থ অন্যতম। সকল কৃমিই মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করে তবে পরিপাকতন্ত্রের সকল অঙ্গে এর অবাধ বিচরণ রয়েছে। আঙ্গিক গঠনের ভিত্তিতে কৃমিকে প্রধানতঃ ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন–

ক) নেমা কৃমি (Nama Helminth) ঃ এরা গোলাকার ও নলাকার কৃমি।
খ) প্লাটি কৃমি (Platy Helminth) ঃ এরা চ্যাপ্টা ও ফিতাকার কৃমি।

ক) নেমা কৃমি (Nama Helminth) ঃ বাংলাদেশে প্রধানতঃ ৪ প্রকার নেমা কৃমি দেখা যায়। যেমন–

i) কেঁচো কৃমি (Round worm or Ascaris lumbricoides),
ii) বক্র কৃমি (Hook worm or Ankylostoma duodenale),
iii) সুতা কৃমি (Thread worm or Enterobius vermicularis) ও
iv) ট্রাইচুরী কৃমি (Trichuris trichuria) ।

খ) প্লাটি কৃমি (Platy Helminth) ঃ বাংলাদেশে প্রধানতঃ ৩ প্রকারের প্লাটি কৃমি বা ফিতা কৃমি (Tape worm or Cestodes) দেখা যায়। যেমন–

i) টেনিয়া সাজিনাটা (Beef tape worm or Taenia soginata)
ii) টেনিয়া সোলিয়াম (Pork tape worm or Taenia solium)
iii) হাইমেনোলেপিস নানা (Dwarf tape worm or Hymenolepis nana) ।

১) কেঁচো কৃমি বা (Round worm)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় কেঁচো কৃমিকে এসকারিস লুমব্রিকয়েডস বলা হয়। এই ধরনের পরজীবীকে সাধারণত পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখা যায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই পরজীবী বেশি হয়ে থাকে। পরিণত কৃমি মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে জেজুনামে বাস করে এবং বংশবৃদ্ধি করে।

অঙ্গসংস্থান ঃ যখন এরা অন্ত্রে থাকে তখন এদের দেখতে বাদামী বা গোলাপী রং এর দেখায়। শরীরের বাইরে থাকলে এরা দেখতে সাদা দেখায়। এরা গোলাকার এবং দুই প্রান্ত চ্যাপ্টা। পিছনের দিকের চেয়ে এদের সামনের দিক পাতলা। পুরুষ কৃমি ১৫ সেন্টিমিটার থেকে ২৫ সেন্টিমিটার ও স্ত্রী কৃমি ২৫ সেন্টিমিটার থেকে ৪০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। পুরুষ কৃমি সাধারণতঃ বাঁকা থাকে এবং স্ত্রী কৃমি দেখতে সোজা আকৃতির।

জীবনচক্র (Life cycle) ঃ কেঁচো কৃমি তাদের জীবনচক্র অন্য জীবের উপর অতিবাহিত করে। মানুষও এদের আশ্রয় দাতা বা পোষক (Host) । সুতরাং মানুষের শরীরেই এদের জীবনচক্র অতিহিত হয়। জীবনচক্রের ধাপগুলো হলো ঃ

ধাপ–১ ঃ মানুষের অন্ত্রে পরিণত কৃমি এবং পায়খানায় এদের ডিম থাকে। স্ত্রী কৃমি প্রতিদিন ২,০০,০০০ডিম পাড়ে। পরিণত ও অপরিণত ডিম মানুষের পায়খানার মাধ্যমে বের হয়।

ধাপ–২ ঃ পরিণত ডিম মানুষের দেহের বাইরে মাটিতে প্রস্ফুটিত হয়। ১০ থেকে ১৪ দিনের মাঝে এরা লার্ভায় পরিণত হয়। লার্ভায় পরিণত হওয়া তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। এই পর্যায়ে ডিমগুলো মানুষের দেহে সংক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়।

ধাপ–৩ঃ মানুষের দেহে এই ডিমগুলো খাদ্য গ্রহণ, পানীয় এবং সবুজ শাকসজীর মাধ্যমে প্রবেশ করে। বিপাকীয় জুসের মাধ্যমে অন্দ্রের মধ্যে এই ডিমগুলো ভেঙ্গে যায়।

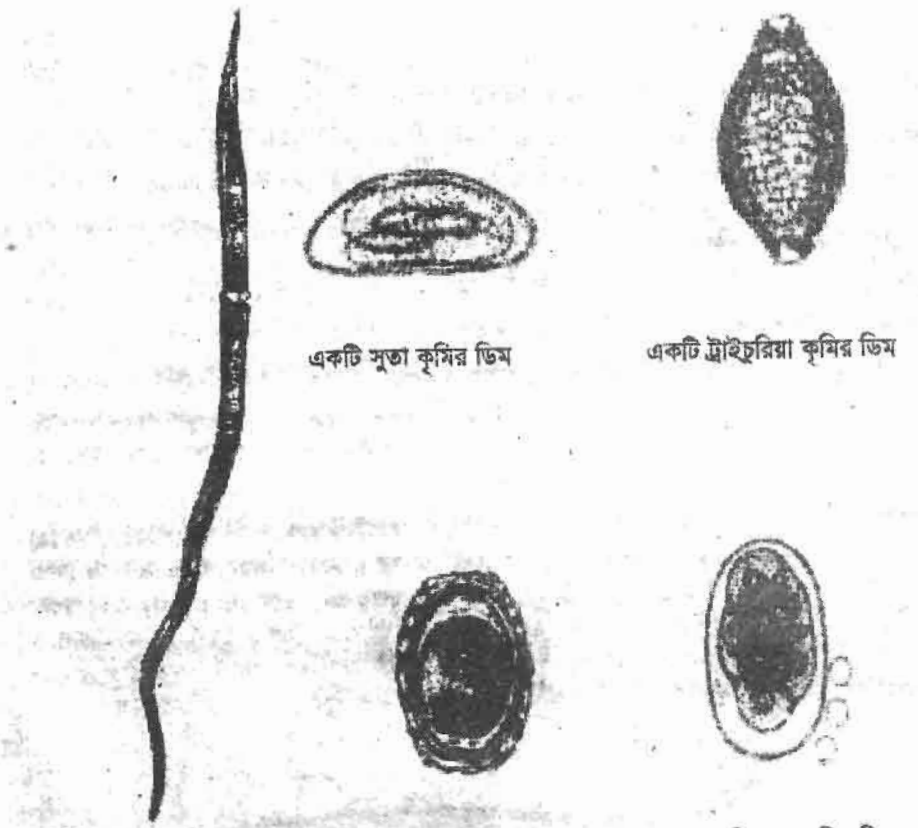

একটি সুতা কৃমির ডিম

একটি ট্রাইচুরিয়া কৃমির ডিম

একটি পরিণত স্ত্রী কেঁচো কৃমি

একটি কেঁচো কৃমির ডিম

একটি বক্র কৃমির ডিম

ধাপ–৪ ঃ এরপর লার্ভাগুলো অন্দ্রের মিউকাস মেমব্রেন–এর মধ্যে দিয়ে পোর্টাল সার্কুলেশন (Portal circulation)-এর মাধ্যমে যকৃতে প্রবেশ করে। এখানে এরা তিন থেকে চার দিন অবস্থান করে। এরপর এরা ইন্ট্রাহিপাটিক শিরার মাধ্যমে ইনফেরিয়র ভেনাক্যাভা হয়ে হৃদপিন্ডের ডান দিক হয়ে ফুসফুসের পালমোনারী সার্কুলেশনে প্রবেশ করে। ফুসফুসে এরা দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসের ভেতরে প্রবেশ করতে এদের প্রায় ৭ দিন লাগে।

ধাপ–৫ঃ এরপর লার্ভাগুলো ফুসফুসের এলভিওলাই থেকে ব্রংকাই, ট্রাকিয়া এবং ল্যারিংক্সে প্রবেশ করে। ল্যারিংক্স ও ফ্যারিংক্স হয়ে এরা খাদ্য নালীতে প্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত এরা পুণরায় ক্ষুদ্রান্তের উপরিভাগে প্রবেশ করে। পূর্ণ বয়ষক হওয়া পর্যন্ত এরা এখানেই অবস্থান করে।

ধাপ–৬ ঃ পূর্ণ বয়ষক কৃমিগুলো ৬ থেকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে পুণরায় যৌন উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়। আবার দুই মাসের মধ্যে ডিম দেয়া শুরু করে। এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ চক্র সম্পাদন হয় এবং নতুন একটি চক্র শুরু হয়।

২) বক্র কৃমি (Hook worm or Ankylostoma duodenale) চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় বক্র কৃমিকে এনকাইলোসটোমা ডিওডেনালি বলা হয়। এই ধরনের পরজীবীকে সাধারণত পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখা যায় তবে উষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলে এই পরজীবী বেশি হয়ে থাকে। পরিণত বক্র কৃমি মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে।

অঙ্গসংস্থান ঃ এরা আকারে ছোট, বাঁকানো এবং দেখতে ধূসর-সাদাটে বর্ণের। পুরুষ বক্র কৃমির চেয়ে স্ত্রী বক্র কৃমি আকারে বড়। এরা চোঙ্গাকৃতির এবং পুরুষ বক্র কৃমির পিছনের দিকটা ছাতার মত ছড়ানো কিন্তু স্ত্রী বক্র কৃমির আকৃতি স্বাভাবিক। পুরুষ বক্র কৃমি প্রায় ৮মিলিমিটার লম্বা ও স্ত্রী বক্র কৃমি প্রায় ১২ মিলিমিটার লম্বা গহ।

জীবনচক্র (Life cycle) ঃ বক্র কৃমি তাদের জীবন চক্র অন্য জীবের উপর অতিবাহিত করে। মানুষই এদের একমাত্র আশ্রয় দাতা বা পোষক (Host) । সুতরাং মানুষের শরীরেই এদের জীবনচক্র অতিবাহিত হয়। এদের জীবনকাল ৩ বছর থেকে ৪ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। জীবনচক্রের ধাপগুলো হলোঃ

ধাপ-১ঃ আক্রান্ত মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিণত বক্র কৃমি বসবাস করে। স্ত্রী বক্র কৃমি পরিণত বয়সে মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে অসংখ্য ডিম পাড়ে। এদের ডিম ৪টি ব্লাস্টোমিয়ারে পরিণত হয় এবং মানুষের পায়খানার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।

ধাপ-২ঃ এই পর্যায়ে এরা মাটিতে বড় হয়। তারপর র‍্যাবডিটিফরম লার্ভা (Rhabditiform larva) আকারে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মাটিতে প্রস্ফুটিত হয়। র‍্যাবডিটিফরম লার্ভা আকারে ২৫০ um হয়। উষ্ম ও আদ্র মাটি এদের প্রস্ফুটিত হবার জন্য উপযোগী। তৃতীয় এবং পঞ্চম দিনে র‍্যাবডিটিফরম লার্ভা একটি থেকে দুটিতে পরিণত হয়। তখন এদেরকে ফিলারীফরম লার্ভা (Filariform larva) বলা হয়। ফিলারীফরম লার্ভা আকারে ৫০০ um হয়। এ পর্যায়ে বক্র কৃমির ডিমগুলো মানুষের দেহে সংক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়।

বক্র কৃমি (Hook worm or Ankylostoma duodenale)

ধাপ-৩ঃ ফিলারীফরম লার্ভা মানুষের পায়ের মোটা চামড়া সহজেই ভেদ করতে পারে ফলে এরা খালি পায়ের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহে সরাসরি প্রবেশ করে।

ধাপ-৪ঃ এরপর ফিলারীফরম লার্ভাগুলো লিম্ফেটিকস্ (Lymphatics) বা সাবকিউটেনাস টিস্যুতে (Subcutaneous tissue) প্রবেশ করে। এরা হৃদপিন্ডের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে পালমোনারী শিরাতে প্রবেশ করে অতঃপর শিরা থেকে এরা ফুসফুসে প্রবেশ করে। এরপর ফিলারীফরম লার্ভাগুলো ফুসফুসের ব্রংকাই এবং ট্রাকিয়া অতিক্রম করে অন্ন নালীর মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রান্তে প্রবেশ করে।

ধাপ-৫ঃ ক্ষুদ্রান্তে লার্ভাগুলো পূর্ণ বয়ষক হয়। লার্ভাগুলো ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধে যৌন উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয় এবং পরিণত স্ত্রী বক্র কৃমিগুলো এক মাসের মধ্যে ডিম দেয়া শুরু করে। ফিলারীফরম লার্ভাগুলো পায়ের চামড়া ভেদ করে মানুষের দেহে প্রবেশ করা হতে আবার ডিম আকারে পায়খানার সাথে বাইরে বেড়িয়ে যেতে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে। এভাবে একটি পূণাঙ্গ চক্র সম্পাদন হয় এবং নতুন একটি চক্র শুরু হয়। ফিলারীফরম লার্ভাগুলো পানীয় জলের সাথে মানুষের দেহে প্রবেশ করলে কদাচিৎ এই সংক্রমণ দেখা দেয়।

৩) শুকর ফিতা কৃমি (Pork tape worm or Taenia solium)

শুকর ফিতা কৃমি বা টেনিয়া সোলিয়াম সাধারণতঃ শুকরের মাংসভোজীদের মধ্যে যায়। ফলে মুসলিমদের মধ্যে এদের সংক্রমণ নেই। পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই কম বেশি এদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পরিণত ফিতা কৃমি মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাস করে।

অঙ্গসংস্থানঃ ফিতা কৃমি দৈর্ঘ্যে ২ মিটার থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের মাথায় ৪টি চোষক রয়েছে। মাথার দৈর্ঘ্য ১৪ মিলিমিটার। এদের মাথা কোলেক্স (Scolex) নামে পরিচিত। এদের ঘার ছোট এবং দেহ অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত।

ডিমঃ ফিতা কৃমির ডিম গোলাকার বাদামী রঙের। ডিমের ব্যাস ৩৬ um থেকে ৪৩ um পর্যন্ত হয়। ডিমের দুইটি আবরণ রয়েছে। একটা বহিরাবরণ এবং অন্যটি ভেতরের আবরণ। ভ্রূণ ভেতরের আবরণে আবৃত। চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় ভেতরের আবরণকে এম্ব্রায়োফোর (Embryophore) বলে। দুইটি আবরণের ভেতরে ডিমের কুসুম অবস্থিত। পায়খানার সাথে ডিমগুলো বাইরে বেরিয়ে আসার প্রাক্কালে এর উপরের স্বচ্ছ ও পাতলা আবরণ ভেঙ্গে যায়। সুতরাং পায়খানার সাথে শুধুমাত্র ভেতরের আবরণ বা এম্ব্রায়োফোরসহ ডিমগুলো বেরিয়ে আসে। এম্ব্রায়োফোর মোটা এবং ধূসর বর্ণের আবরণ। ডিমগুলো শুকর এবং মানুষের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।

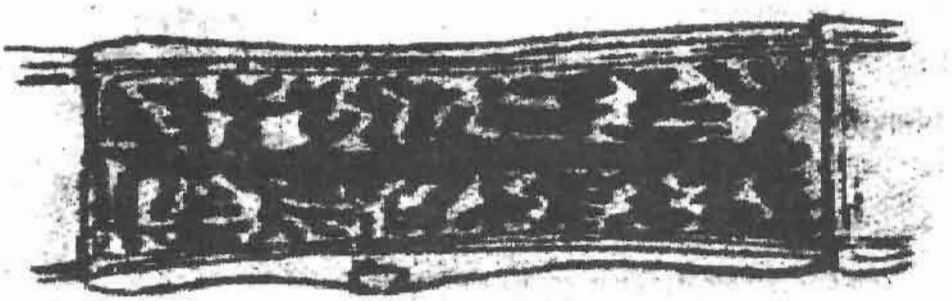

একটি শুকর ফিতা কৃমির অংশ বিশেষ

জীবনচক্রঃ ফিতা কৃমির পোষক হলো মানুষ। অল্পসিদ্ধ শুকরের মাংস খাওয়ার ফলে পরিণত ফিতা কৃমি শুধুমাত্র মানুষের দেহেই পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বিশেষ করে জেজুনামের (Jejunum) উপরের অংশে ফিতা কৃমি বসবাস করে। পোষক ত্যাগ করার পূর্বে একটি ফিতা কৃমি ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ ডিম ছাড়ে।

ফিতা কৃমির ডিমগুলো পায়খানার মাধ্যমে পরিবাহিত হয় এবং শাক–সবজি ও পানিতে মিশ্রিত হয়। এই সব ডিম মিশ্রিত শাক–সবজিও পানি মানুষ এবং শুকর গলধকরণ করে। অতঃপর ডিমগুলো মানুষ এবং শুকরের অন্ত্রের মিউকাস মেমব্রেনে প্রবেশ করে। এখানে এরা লার্ভা থেকে পরিণত ফিতা কৃমিতে রূপান্তরিত হয়। পরিণত ফিতা কৃমি পূণরায় ডিম ছাড়তে শুরু করে। এইভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ চক্র শেষ হয়ে এবং পুণরায় আর একটি নতুন চক্র আরম্ভ হয়।

প্রশ্নমালা–৫

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পরজীবী কাকে বলে?

২। পরজীবীর প্রকাভেদ লেখ।

৩। প্রোটোজোয়া কী?

৪। মেটাজোয়া কাকে বলে?

৫। হেপাটিক সিজোগনি কাকে বলে?

৬। সিজন্ট কী?

৭। লার্ভা কাকে বলে?

৮। গ্যামেটোসাইট কাকে বলে?

৯। গ্যামেট বলতে কি বোঝ?

১০। স্পোরোজয়েট কী?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। এন্টমোইবা হিস্টোলাইটিকার জীবনচক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২। কেঁচো কৃমির জীবনচক্রের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

৩। যকৃত সিজোগনির কয়াটি ধাপ রয়েছে? ধাপগুলো বর্ণনা কর।

৪। বক্র কৃমি কীভাবে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয় বর্ণনা কর।

৫। মুসলিমদের মধ্যে কোন পরজীবীর সংক্রমণ দেখ যায় না? কেন বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান

গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান

গণস্বাস্থ্য (Community Medicine) ঃ গণস্বাস্থ্য হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যা চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীর সমন্বয়ে গঠিত যারা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে সুস্থ ও অসুস্থ জনসগোষ্ঠির স্বাস্থ্য চাহিদা পরিমাপ করে। উক্ত চাহিদা পূরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্যও কাজ করে। এবং সেই সাথে রয়াল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস ইংল্যান্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত গণস্বাস্থ্য শিক্ষাক্রমের আওতায় (Faculty of community Medicine of Royal College of Physicians, England) এই বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। কমিউনিটি মেডিসিন জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রয়োগ প্রক্রিয়া।

গণস্বাস্থ্য কার্যক্রমের প্রকারভেদ (Classification of community medicine) ঃ গণস্বাস্থ্য কার্যক্রম দুই পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। যথা–

১। আরোগ্যমূলক চিকিৎসা (Curetive Medicine) ও

২। প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা (Preventive Medicine) ।

আরোগ্যমূলক চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে মানব দেহের বিভিন্ন রোগ হতে আরোগ্য লাভের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় এবং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের হাত হতে দেহকে সংরক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

গণস্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectvie of community medicine) ঃ গণস্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১) জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২) দেশবাসিকে মহামারী সম্পর্কে সচেতন করা।

৩) জনসাধারণকে স্বাস্থ্য–সচেতনতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক স্বাস্থ্য–সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫) জনসাধারণকে স্বাস্থ্য শিক্ষা লাভের কলা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

৬) জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক স্বাস্থ্য–সচেতনতা পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা করা।

স্বাস্থ্য (Health)

স্বাস্থ্য হচ্ছে পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা তবে রোগ বা পঙ্গুত্বের অনুপস্থিতি নয়। (Health is a state of complete physical, mental and social menta and social well being and not merely On absence of disease or infirmity.

স্বাস্থ্যের পরিধি (Dimention of Health)

স্বাস্থ্যের পরিধি বলতে মানব দেহ সম্পর্কিত সেই সমস্ত ক্ষেত্রসমূহ বোঝায়; যার সাম্যাবস্থার উপর একজন মানুষের সকল ক্ষেত্রসমূহ বিস্তৃত। অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রসমূহের বিচ্যুতির ফলে স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং অসুস্থতার সম্মুখীন হয়।

স্বাস্থ্য অবস্থার বিস্তার বা পরিধিকে নিম্নলিখিত উপায়ে বিভক্ত করা যায়–

১। শারীরিক (Rhysical) ঃ স্বাস্থ্য ও শরীর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রধানতঃ শারীরিক সুস্থতাকেই স্বাস্থ্য বা সুস্বাস্থ্য বলে। সুস্বাস্থ্য নির্ধারণের জন্য বেশ কিছু সূচককে মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করে সেই মাপকাঠিকে বা অবস্থার আদর্শ ধরে একজনকে তুলনামূলকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নিরূপণ করা যেতে পারে।

২। মানসি (Mental) স্বাস্থ্য এবং মন একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। মানসিক সুস্থতা ছাড়া কখনই কোন ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যাবেনা। মানসিক সুস্থতা নির্ধারণের জন্য বেশ কিছু সুচককে মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করে সেই মাপকাঠিকে বা অবস্থাকে আদর্শ ধরে একজন ব্যক্তির তুলনামূলকভাবে মানসিক অবস্থা নিরূপণ করা যেতে পারে।

৩। সামাজিক (Social) ঃ সামাজিক পরিধির আদর্শ মাপকাঠি বা সূচক নির্ধারণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই পরিধি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সামাজিক অবস্থাকেই স্বাস্থ্য অবস্থা নির্ণয়ের জন্য বিবেচনায় নিতে হবে।

৪। আধ্যাত্মিক (Spiritual) ঃ আধ্যত্মিক ধর্মীয় বিশ্বাস/আচার ইত্যাদি স্বাস্থ্যের উপর সাধারণভাবে সুপ্রভাব বিস্তার করে।

এছাড়াও রয়েছে ক) ভাবাবেগজনিত পরিধি, খ) পেশাগত পরিধি ও গ) অন্যান্য পরিধি। এসব বিষয়সমূহও স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব স্বাস্থ্যের পরিধি বলতে উপরোক্ত বিষয় বা ক্ষেত্রসমূহকে বোঝায়, যারা স্বাস্থ্য অবস্থা নির্ণয়ে বা বর্ণনায় জড়িত রয়েছে।

স্বাস্থ্যের বর্ণালী (Spectrum of health) ঃ

স্বাস্থ্যের বর্ণালী (Spectrum of health) বলতে স্বাস্থ্য অবস্থার দুটি প্রান্ত এবং এর মধ্যবর্তী অবস্থানসমূহকে বোঝায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষকে নিরোগ দেহে সুস্থতা এবং রোগাক্রান্ত অবস্থার মধ্যবর্তী যে সমস্ত পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয় তা নিম্নলিখিত ৭টি বর্ণের বর্ণালীতে প্রদর্শন করা হলো ঃ

স্বাস্থ্যের বর্ণালী

* সুস্বাস্থ্য (Positive health),
* তুলনামূলক ভাল স্বাস্থ্য (Better health),
* অসুস্থতা মুক্ত (Freedom from sickness),
* অনির্ণীত অসুস্থতা (Unrecoginzed Sickness),
* মৃদু অসুস্থতা (Mild sickness),
* মারাত্মক অসুস্থতা (Sever sickness) ও
* মৃত্যু (Death)

স্বাস্থ্য অবস্থার নির্ধারকসমূহ (Determinants of health) ঃ স্বাস্থ্য অবস্থার নির্ধারক বলতে সেই কার্যকর প্রভাবসমূহকে বোঝায় যার অবস্থার উপর প্রভাববিস্তার করে এবং একজন মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে কি কি করলে অসুস্থ্য হতে পারে তাই নির্দেশ করে। নিচে প্রভাব বিস্তারকারী বিভাগসমূহ উল্লেখ করা হল।

নির্ধারকসমূহ ঃ নির্ধারকসমূহ ২ প্রকার। যথা– ১) প্রত্যক্ষ প্রভাবক ও ২) পরোক্ষ প্রভাবক। একজন মানুষের স্বাস্থ্য অবস্থা নিম্নলিখিত ৩টি প্রধান বিষয় দ্বারা নির্ধারণ হয়ে থাকে। যথা–

১। বংশগতি (Genetic Factor) ঃ শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি বংশগতির স্থানান্তরের মাধ্যমে পিতামাতা বা পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে শিশু পেয়ে থাকে।

২। পরিবেশ (Environmental factor) ঃ পরিবেশ বলতে মানুষ বা প্রাণি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে তাকে বোঝায়। এই পরিবেশ মানুষের নিজের হাতে তৈরি করা বা প্রকৃতি প্রদত্ত হতে পারে।

৩। ব্যক্তিগত জীবন প্রণালি (Life style) ঃ ব্যক্তিগত জীবনযাপন প্রণালি প্রধানত ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা বা ধারণার উপর নির্ভরশীল, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং বিধি পালন একজন মানুষকে সুস্থ থাকতে অনেকখানি সাহায্য করে। এ ছাড়াও আছে;

ক) আর্থ–সামাজিক অবস্থা, খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা ও গ) অন্যান্য অবস্থা।

স্বাস্থ্য সূচক (Describe of health) স্বাস্থ্য সূচক হচ্ছে কিছু বিশেষ বিশেষ তথ্য যা সূচক আকারে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত তথ্য, কোন একটি দেশের এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য অবস্থার অবস্থান নির্দেশ করে। নিচে এগুলো দেয়া হলোঃ

১। মৃত্যুসূচক (Mortality indicators)

ক) স্থুল মৃত্যু সূচক হার - Crupe death rate (CDR),
খ) মাতৃ মৃত্যু হার - Maternal mortality rate (MMR),
গ) শিশু মৃত্যু হার - Infant mortality rate (IMR),
ঘ) বিশেষ রোগে মৃত্যু হার - Disease spcific death rate.,

২। অসুস্থতা সূচক হার (Morbidity indicators) :

ক) রোগ প্রাদুর্ভব সূচক – Incidence prevalenve rate (IPR)
খ) নতুন রোগ - Incidence,
গ) নতুন ও পুরাতন রোগ - Prevalence.

৩। পঙ্গুত্ব বা অসমর্থতা সূচক (Disability indicators) ঃ

ক)কর্মস্থলে অনুপস্থিতি দিন সূচক
খ) স্কুলে অসুপস্থিতি দিন সূচক
গ) শারীরিক প্রতিবন্ধী সূচক

৪। পুষ্টি অবস্থা সূচক (Nutritional status indicators) বিশেষ বিশেষ বয়সে উচ্চতা এবং ওজন বা বিভিন্ন শারীরিক পরিমাপ এর আদর্শ অবস্থা নির্ণয়কৃত থাকতে পারে। অথবা পরিমাপ নির্ণয় করে আদর্শ চিহ্নিত করে উক্ত অবস্থা এবং ব্যক্তির পুষ্টি অবস্থা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৫। স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা সূচক (Health care/Facility indicators) ঃ

ক) চিকিৎসক–রোগী তুলনা চিত্র।
খ) চিকিৎসক–সেবাকর্মী/নার্স তুলনা চিত্র।
গ) চিকিৎসক টেকনোলজিস্ট তুলনা চিত্র।
ঘ) স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান–জনস্বাস্থ্য তুলনা চিত্র।

৬। পরিবেশ অবস্থা সূচক (Environment state indicators) ঃ

ক) ঢাকার বাতাসে সীসার পরিমাণ।
খ) রাজশাহীর টিউবওয়েলে আর্সেনিকের পরিমাণ।

গ) গ্রামাঞ্চলে পরিবার প্রতি স্যানিটেশন পায়খানা ব্যবহারের পরিমাণ।

৭। আর্থ সামাজিক অবস্থা সূচক (Socio-economic state indicators) ঃ

ক) গড় মাথাপিছু বর্ষিক আয়,

খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণ বিদ্যমান আছে।

রোগ ও রোগ প্রতিরোধ

রোগ (Diseases) ঃ রোগ হচ্ছে একটি দৈহিক অবস্থা যখন শরীর বা এর কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক কাজ করতে অসমর্থ হয়। প্রাচীনকালে ধারণা ছিল রোগ ব্যাধি দেবদেবী বা অশুভ শক্তির অভিসম্পাত অথবা গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবের ফলশ্রুতি। সে জন্য তারা রোগমুক্তির জন্য দেবদেবীর পুজা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন বিভিন্ন কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করত।

রোগের কারণ (Causes of disease) ঃ রোগের কারণ সম্পর্কে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মনে করা হতো রোগ অশুভ শক্তির কারসাজি। তাই রোগের ভোগান্তি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ নানা প্রকার কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে গাছ-পাথরের পূঁজা অর্চনা করত এবং প্রতিকার হিসাবে কখনও গাছের শিকড়, পাতার রস অথবা ধাতু ও পাথরের তাবিজ কবজ ধারণ করত। সেই সময়ে জ্ঞানী লোকেরা রোগকে সৃষ্টিকর্তার গজব মনে করলেও রোগের চিকিৎসা করা জরুরী বিবেচনা করত। এজন্যতারা ঔষধী গাছ, লতা, পাতা, শিকড় ও প্রকৃতিক গুণসম্পন্ন অন্যান্য পদার্থের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং রোগের চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা কারণ ছাড়া কোন কিছুই ঘটান না। সুতরাং রোগের সৃষ্টিও কোন না কোন কারণেই হয়ে থাকে। সৃষ্টিকর্তা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন রোগের প্রতিকারও ততই সৃষ্টি করেছেন। আবার রোগের প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানও মানুষকে সুস্টিকর্তাই দিয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে ধীরে ধীরে কুসংস্কার মানুষের মন থেকে দূর হয়ে যায় ও নানা ধরনের গবেষণালব্ধ তত্বের আবিষ্কার হতে থাকে।যথা-

১। জীবাণু মতবাদ (Microorganism theory) প্রথম দিকে ধারণা করা হত যে, সকল রোগের উৎস কোন না কোন জীবাণূ।

২। পরবর্তীকালে জীবাণুর সাথে আরো দুটি উপাদান পোষক এবং পরিবেশকেও রোগ সৃষ্টির কারণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

৩। এক্ষেত্রে বিশেষ করে যে সমস্ত রোগের বেলায় সুনির্দিষ্ট এজেন্ট চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছেনা সেক্ষেত্রে বহুবিধ কারণকে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলা হচ্ছে। যেমন-Cancer, diabetes ইত্যাদি।

রোগের শ্রেণিবিভাগ (Cassification of diseases) ঃ রোগ কি কারণে সংঘটিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে রোগকে নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা হয়েছে ঃ

ক) জীবাণুঘটিত রোগ	:	হাম, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি।
খ) বিষক্রিয়াজনিত রোগ	:	আর্সেনিক পয়জনিং, এসিডে পুড়ে যাওয়া প্রভৃতি।
গ) পুষ্টীহিণতাজনিত রোগ	:	ম্যারাসমাস, রক্তশুন্যতা, রাতকানা, গলগন্ড, স্কার্ভি ইত্যাদি।
ঘ) বংশগত রোগ	:	মাসসিক বৈকল্য,হাঁপানী প্রভৃতি।
ঙ) হরমোনজনিত রোগ	:	বহুমূত্র, যৌন দুর্বলতা প্রভৃতি।
চ) মানসিক রোগ	:	দুশ্চিন্তা, স্নায়ু বৈকল্য, মৃগী রোগ প্রর্ভতি।
ছ) চিকিৎসাজনিত রোগ	:	রক্ত স্বল্পতা, অপুষ্টি প্রভৃতি।
জ) অজ্ঞাত কারন প্রসূত রোগ	:	ক্যান্সার, বাতজ্বর প্রভৃতি।
ঝ) তাপ ও শক্তিজনিত রোগ	:	দগ্ধ ক্ষত, বিদ্যুৎ পৃষ্ট, অস্থি ভাঙ্গা প্রভৃতি।

রোগ সৃষ্টির স্বাভাবিক ইতিহাস (Natural history of diseases) ঃ রোগ সৃষ্টির ইতিহাস তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১) নিদান পূর্বকাল ঃ নিদান পূর্বকাল বলতে কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বের সময়কালকে বোঝায়। এসময় কাল ঐ রোগে উন্মুক্ত থাকার পর থেকে আক্রান্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমনঃ কলেরা আক্রান্ত কোন একটি অঞ্চলে বাইরে থেকে কোন এক ব্যক্তি আসল। তখন সে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে আসল। পাঁচ দিন পর কলেরায় আক্রান্ত হলো। এইযে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে আসার পর থেকে আক্রান্ত হওয়ার সময়কালকে নিদান পূর্বকাল বলে।

২) নিদান কাল ঃ কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে ঐ রোগে ভোগের সময়কালকে নিদান কাল বলে।

৩) রোগ মুক্তিকাল বা মৃত্যু ঃ রোগে আক্রান্ত শেষ হবার পর থেকে পূর্ণ সুস্থতা অর্জনের সময়কালকে রোগমুক্তিকাল বলে। অতএব রোগে আক্রমণের পর ঐ ব্যাক্তি হয় রোগমুক্তি কাল অতিক্রম করবে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

রোগ বিস্তারের পথ বা পদ্ধতিসমুহ (Modes of kiseases transmition) ঃ যে সমস্ত অসুখ বিশেষ কোন এজেন্ট দ্বারা সংঘটিত হয় এবং এক ব্যক্তি বা প্রাণি উৎস থেকে অন্য ব্যক্তি বা প্রাণিতে বিস্তার লাভ করে, সেই সমস্ত রোগসমূহের বিস্তার লাভ করার পদ্ধতিকেই রোগ বিস্তারের পথ বা পদ্ধতি বলে। রোগ বিস্তারের পদ্ধতি সমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

ক) প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সংক্রমণ,

খ) পরোক্ষ সংক্রমণ।

প্রত্যেক্ষ বা সরাসরি সংক্রমণ ঃ এই পদ্ধতিতে রোগের জীবাণু সরাসরি উৎসস্থল থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে। বিভিন্নভাবে সরাসরি সংক্রমতণ হতে পারে। যথাঃ–

১। সরাসরি সংস্পর্শ (Contact) ঃ এই পদ্ধতিতে বিভিন্নরোগ জীবাণু সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ তথা – দাদ, স্ক্যাবিস, একজিমা ইত্যাদি এ পদ্ধতিতে ছড়ায়।

২। বাষ্পকণা সংক্রমণ (Droplet) ঃ এই পদ্ধতিতে সাধারণত গলা ও শ্বাসনালীর অসুখই বেশি ছাড়ায়। যেমনঃ যক্ষা, হাম, বসন্ত, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি। Droplet হচেছ হাঁচি কাশির সঙ্গে গলা এবং শ্বাস নালীতে উপস্থিত রোগ জীবাণু যখন বাষ্পকণার সঙ্গে মিশে সরাসরি সুস্থ ব্যক্তির নাক মুখ দিয়ে প্রবেশ করে সেই পদ্ধতি।

৩। মাটির সঙ্গে সংস্পর্শ (Contact with soil) কিছু রোগ জীবাণু মাটিতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। এরা চর্ম ভেদ করে বা ক্ষত স্থান দিয়ে সরাসরি শরীরে প্রবেশ করতে পারে যেমনঃ বক্রকৃমি, টিটেনাস, গ্যাস গংগ্রীণ ইত্যাদি।

৪। চর্ম ও মিউকাস মেমব্রেন স্থাপনের মাধ্যমে (Inoculation in skin/mucus membrane) কিছু কিছু রোগ জীবাণু চর্ম ও মিউকাস মেমব্রেনে স্থাপনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যেমনঃ চামড়া দিয়ে ঢুকে (Anthrax), মিউকাস মেমব্রেন দিয়ে ঢুকে (Aids) ইত্যাদি।

৫। গর্ভফুলের মাধ্যমে (Transplacentall) ঃ কিছু কিছু রোগ জীবাণু যদি মা এর শরীরে উপস্থিত থাকে, তবে গর্ভফুলের মাধ্যমে তা শিশুর শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যেমনঃ এইডস্ , ম্যালেরিয়া, সিফিলিস্ , গনেরিয়া ইত্যাদি।

পরোক্ষ সংক্রমণ ঃ এই পদ্ধতিতে রোগ জীবাণুর উৎসস্থল থেকে কোন একটি বা একাধিক বাহকের উপর নতুন পোষকের শরীরে প্রবেশ করে। যেমন:

১। মাধ্যম বাহিত ঃ খাদ্য, পানীয়, রক্ত ইত্যাদি দ্বারা বাহিত।

ক) রক্ত বাহিত হয়ে ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস–বি, এইডস ইত্যাদি রোগ বিস্তার করে।

খ) খাদ্য ও পানীয় বাহিত হয়ে সাধারণতঃ আন্ত্রীক রোগসমূহ বিস্তার লাভ করে। যেমন: কলেরা (Cholera), টাইফয়েড (Dysentry), কৃমি (Worm) ইত্যাদি।

২। কীটপতঙ্গ বাহিত

ক) যান্ত্রিক ভেক্টর ঃ মাছি, তেলাপোকা ইত্যাদি দ্বারা বাহিত। রোগ–Malaria, Dengue, Filaria।

খ) জৈবিক ভেক্টর ঃ মশা দ্বারা বাহিত। রোগ – ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া।

৩। বায়ু বাহিত ঃ সাধারণত গলা ও শ্বাসনালীর রোগসমূহ।

ক) ভাসমান বাষ্পকণা রোগ জীবাণু মিশ্রিত।

খ) ভাসমান ধূলিকণা রোগ জীবাণু মিশ্রিত। যে সমস্ত জীবাণু স্পোর তৈরি করে।

৪। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র দ্বারা ঃ থালা বাসন, চামচ, গ্লাস, তোয়ালে, চাদর ইত্যাদি । যেমন ঃ

ক) চর্মরোগ। যেমন ঃ খাস পাচড়া, দাদ, একজিমা ইত্যাদি।

খ) আন্ত্রিক রোগ। যেমন ঃ ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি।

৫। অপরিচ্ছন্ন হাত আঙ্গুল দ্বারা ঃ থালা বাসন, চামচ, গ্লাস, তোয়ালে চাদর ইত্যাদি যেমন ঃ

রোগ প্রতিরোধে হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়াসমূহ (Interventions) ঃ রোগ প্রতিরোধের কার্যক্রম হিসাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। যথা ঃ

i) ***স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নয়ন*** (Health promotion) ঃ স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নয়ন বলতে বিশেষ বিশেষ স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টির পূর্বেই রোগের প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এই কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিবেশের উন্নয়ন, পুষ্টি উন্নয়ন, জীবনযাপন প্রণালি ও আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগের আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রস্তুত থেকে শরীরকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

ii) ***সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ*** (Specific Protection) ঃ বিশেষ করে কোন স্বাস্থ্য বা ব্যবস্থা গহণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধে যে সকল কার্যক্রম দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে রোগ প্রতিরোধ সম্ভব সেগুলোতে টাকা প্রদান , বিশেষ বিশেষ পুষ্টির যোগান, ঔষধ দ্বারা প্রতিরোধ, কর্মস্থলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ইত্যাদি।

iii) দ্রুত রোগ ও চিকিৎসা ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ প্রতিরোধ না করার কারণে বা প্রতিরোধ গ্রহণ করার পরও বিশেষ কারণে যদি রোগাক্রান্ত হয়, তবে দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত রোগমুক্তি এবং পরবর্তি ক্ষয়ক্ষতি, পরিহার করা এই প্রক্রিয়ার অর্ন্তগত। দ্রুত রোগ নির্ণয় করতে রোগের লক্ষণ, বিবেচনা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক।

iv) ***পঙ্গুত্ব হ্রাস*** (Disability Limition) ঃ রোগাক্রান্ত হবার পর অগ্রসরমান অবস্থায় যে কোন পর্যায়ে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রোগের পরবর্তী ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া থেকে রোগীকে রক্ষা এবং সম্ভাব্য অসমর্থতা বা পঙ্গুত্বের হাত থেকে রক্ষা করাকে পঙ্গুত্ব হ্রাস বলা হয়।

v) *পূর্নবাসন* (Rehabilitation) ঃ পুনর্বাসন বলতে কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবার পর যদি উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবের কারণে অথবা যে কোন কারণে প্রতিবন্ধি বা শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষাম হয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা বোঝায়। যাতে সে পরিবার বা সমাজের বোঝা না হয়ে যত দিন সম্ভব অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে জীবনযাপন করতে পারে। নিম্নক্ত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা যেতে পারে। যেমন ঃ

ক) চিকিৎসাগতভাবে ঃ উন্নত বিশ্বে চিকিৎসা ব্যয় সরকারিভাবে বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে নির্বাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থারকারণে চিকিৎমা ব্যয় নির্বাহে অক্ষম হলে তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে চিকিৎসাগতভাবে পুনর্বাসন করা যেতে পারে। বাংলাদেশেও সীমিত পর্যায়ে বয়স্কদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে সরকারিভাবে উন্নত বিশ্বের ন্যায় চিকিৎসা বিষয়ক বীমা প্রচলনের প্রক্রিয়া চলছে।

খ) পেশাগতভাবে ঃ রোগাক্রান্ত হয়ে অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পরে অনেকেই প্রতিবন্দি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তাদের স্বাস্থ্য, দৈহিক সামর্থ্য, মনন ও মানসিকতার ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পেশাগতভাবে পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

গ) সামাজিকভাবে ঃ মাদকাসক্ত, কুষ্ঠ রোগী, এইডস প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ সামাজিকভাবে অবহেলার শিকার হয়। এসমস্ত অসহায় মানুষদের সহানুভতির সাথে সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

রোগতত্ত্ব বিজ্ঞান

প্রাথমিক রোগতত্ত্ব বিজ্ঞান (Basic Epidemiology) ঃ প্রাথমিক রোগতত্ত্ব বিজ্ঞান হচ্ছে কোন রোগের প্রাদুর্ভাবের বিস্তারিত কারণ নির্ণয় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। যখন কোন জনগোষ্ঠিকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবস্থা ও ঘটনাবলির বিস্তৃতি ও কারণ সম্বন্ধে অধ্যয়ন এবং উক্ত সমস্যা সমাধানে লব্দ জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে মহামারীর হাত হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়, তখন উক্ত জ্ঞানকে প্রাথমিক রোগতত্ত্ব বিজ্ঞান (Basic Epidemiology) বলা হয়। রোগতত্ত্ব কথাটি ইংরেজি 'Epidemilology' থেকে এসেছে। যেমন ঃ

Epi ——————→ Upon ——→ উপর ——→ সম্পর্কে
Demos ——————→ Human ——→ মানুষ ——→ জনগোষ্ঠি
Logos ——————→ Knowledge →জ্ঞান ——→ বিজ্ঞান রোগতত্ত্ব বিজ্ঞান;
Epidemioligy= জনগোষ্ঠি রোগতত্ত্ব বিজ্ঞান।

Epidemology is the study of the distribution and determicatiom and of health related stakes or evects in specified population and the application of this study to control health pronlems.

Distribution → বিস্তৃতি → কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে? → কোন জনগোষ্ঠির মধ্যেকার রোগতত্ত্ব?
Determination → কারণসমূহ নির্ণয় → কোন জনগোষ্ঠির মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ও উহার কারণ?
→ রোগটির প্রত্যক্ষ কারণ কি?
→ পরিবেশের কোন কোন বিষয় জড়িত?
→ পোষাকের কোন কোন কারণ ও দুর্বলতা জড়িত?

রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানের উপাদানসমূহ (Elements of epidemiology) ঃ রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানের তিনটি উপাদান রয়েছে।যথাঃ–

ক) রোগের প্রাদুর্ভাবের হার (Frequency of isease)
খ) রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণসমূহ (Determinants of disease)
গ) রোগের বিস্তৃতি (Distribution of disease) ।

ক) রোগের প্রাদুর্ভাবের হার (Frepuency of disease) ঃ রোগের প্রাদুর্ভবের হার বলতে কোন রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যার প্রাদুর্ভাব এবং তার বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত তথ্যসমূহকে বোঝায়। অর্থাৎ রোগটি কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। আক্রান্তদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? তাদের বয়স, লিঙ্গ, পেশা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণত পরিসংখ্যানগত সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন ঃ হার,অনুপাত ইত্যাদি।

খ) রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণসমূহ (Determinants of disease) ঃ রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ বলতে কোন একটি রোগ বিস্তারের জন্য যে কারণগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের বোঝায় প্রত্যক্ষ কারণ বলতে রোগ সৃষ্টির উপাদান যাকে আমরা প্রতিনিধি (Agent) বলি তা এবং পরোক্ষ কারণ বলতে পরিবেশ ও পোষকের যে সমস্ত ত্রুটি বা দুর্বলতা রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী তাদের বোঝায়। পরিবেশের এটি বলতে তার যে সমস্ত কারণগুলো বিস্তারের সহায়ক ভূমিকা পালন করে তাদের এবং পোষকের দুর্বলতা বলতে তার যে সমস্ত কারণ যেমন অপুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব ইত্যাদি কারণে রোগাক্রান্ত হবার উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় সেগুলোকে বোঝায়।

গ) রোগের বিস্তৃতি (Distribution of disease) ঃ রোগের বিস্তৃতি বলতে কোন একটি রোগের বিস্তার এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বোঝায়। রোগের বিস্তার আন্তর্জাতিক, তথা একদেশীয় বা

বিশেষ কোন অঞ্চল, গ্রামাঞ্চল, শহরাঞ্চল, বিশেষ এলাকা ইত্যাদি নিয়ে হতে পারে। এলাকার ভিত্তিতে মহামারী প্রাদুর্ভাবের বিস্তৃতি রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ ভৌগোলিক বৈশিষ্টের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানের লক্ষ ও উদ্দেশ্যে (Aims and objectices of epidemiology) ঃ রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য তিনটি। যথাঃ

১। কোন জনগোষ্ঠীকে বিশেষ কোন রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যার বিস্তৃতি ও পরিমাণ বর্ণনা করা।

২। উক্তরোগ ও সমস্যার কারণ বা কারণসমূহ নির্ণয় করা।

৩। উক্ত রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা, নিয়ন্ত্রণ ও কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্তের যোগান দেয়া।

রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ ঃ

১। উক্ত রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যা এবং উহার প্রভাবসমূহ হ্রাস বা নির্মূল করা।

২। সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নয়ন করা।

রোগতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Epidemiological methods) ঃ রোগতত্ত্ব বিষয়ক অন্যতম কাজ হচ্ছে মানবগোষ্ঠিত বার্তমান উদভুত রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার স্বপক্ষে বিস্তারিত অধ্যয়ন বা গবেষণা। উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে রোগতত্ত্বক বিশেষজ্ঞগণ (Epidemiologist) সাধারণত ৩ ধরনের গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

১। বর্ণনামূলক অধ্যয়ন (Descriptive study),

২। বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন বা গবেষণা (Analyic study),

৩। পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক অধ্যয়ন বা গবেষণা (Experimentic study) ।

বর্ণনামূলক অধ্যয়ন বা গবেষণা ঃ এই পদ্ধতিতে কোন একটি রোগের প্রাদুর্ভাবের পরিসর (Place) সময়কাল ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এর তথ্য সংগ্রহ, বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়। এই ধরণের গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

১। যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন একটি রোগের উপর অধ্যয়ন করা হবে তা নির্ধারণ করা।

২। রোগটির বিস্তারের সময় পরিসর ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠি সম্পর্কিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা।

৩। রোগটির পরিমাণ আক্রান্ত, সুস্থতা, মৃত্যু ইত্যাদি পরিসংখ্যাণগত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা।]

৪। রোগটির উৎপত্তি, বিস্তার, প্রভাব সম্পর্কে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া।

বিশ্লেষণমূলক রোগতত্ত্ব (Analytical epidemiology) ঃ বিশ্লেষণমূলক রোগতত্ত্ব অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগতত্ত্ব বিষয়ক অধ্যয়ন/গবেষণা পদ্ধতি। এক্ষেত্রে কোন রোগের উৎপত্তি, বিস্তার, প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কিত সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সমূহের পর আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়। ইহা আবার দুই প্রকার যথাঃ

ক) কেস কন্ট্রোল অধ্যয়ন পদ্ধতি বা পশ্চাদমুখী পদ্ধতি।

খ) কোহর্ট অধ্যয়ন পদ্ধতি বা ভবিষ্যৎবানী পদ্ধতি।

বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতির সাহায্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া সম্ভব হয় ঃ

ii) সম্ভাব্য নির্ণীত কারণের সঙ্গে পরিসংখ্যানগত মিল আছে কিনা।

iii) কোন একটি রোগ ও তার উৎপত্তি সম্ভাব্য নির্ণীত কারণের সঙ্গে পরিসংখ্যানগত মিল আছে কিনা।

iv) যদি থাকে তবে তা কতখানি জোরালো।

ক) কেস কন্ট্রোল অধ্যয়ন পদ্ধতি ঃ সাধারণভাবে এই পদ্ধতিকে পশ্চাৎদমুখী পদ্ধতি (Retrospective study) বলে। এক্ষেত্রে অধ্যয়নের পুর্বেই রোগটি সংঘটিত হয়েছে। অধ্যয়ন পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হয়।অর্থাৎ রোগের প্রভাব ফলাফল থেকে শুরু করে কারণ নির্ণয়ের দিকে অগ্রসর হয়।

খ) কোহর্ট (Cohort) অধ্যয়ন পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিও একটি গবেষণামূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎমুখী গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ইংরেজিতে এর অপর নাম (Prospective study) । একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি গবেষণার জন্য পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়। যাদের উপর বিশেষ কোন রোগ বা সমস্যা-এর প্রভাব একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণাটি কোন রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এর প্রভাব বা ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

গ) পরীক্ষা-নিরীক্ষমূলক পদ্ধতি ঃ এক্ষেত্রে কোন রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ ও প্রভাব নির্ণয়ে সরাসরি কোন প্রাণির বা মানুষের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয় এবং তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোহর্ট (Cohort) পরীক্ষা থেকে এর পার্থক্য হচ্ছে এ ক্ষেত্রে গবেষক কর্তৃক পরীক্ষাসমূহ সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রণকারী দল (Control group) থাকে-এই পদ্ধতিও দুধরনের। যথা ঃ

i) অবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা ও

ii) বিন্যস্ত নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা।

কেস কন্ট্রোল ও কোহর্ট পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

কেস কন্ট্রোল অধ্যায়ন পদ্ধতি	কোহর্ট অধ্যয়ন পদ্ধতি
১। ফলাফল বা প্রভাব থেকে কারণ নির্ণয়ের দিকে অগ্রসর হয়।	১। কারণ থেকে ফলাফল বা প্রভাব নির্ণয়ের দিকে অগ্রসর হয়।
২। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সন্দেহকৃত কারণ। কারণসমূহ দায়ী বা রোগাক্রান্ত হয়ে নাই তাদের মধ্যেও উক্ত কারণ বা কারণসমূহ বর্তমান ছিল কিনা তা নির্ণয় করে।	২। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গে বিশেষ কোন কারণ বা কারণসমূহ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে রোগাক্রান্ত হয় বা উন্মুক্ত হওয়ার পরও উক্ত রোগে আক্রান্ত হয় কীনা তা পরীক্ষা করে।
৩। একটি অনুমানকে (Hypothesis) পরীক্ষা করার প্রাথমিক পদ্ধতি হিসাবে নেয়া হয়।	৩। একটি অনুমানকে (Hypothesis) পুনঃপরীক্ষা করার পদ্ধতি হিসাবে নেয়া হয়।
৪। স্বল্প মেয়াদী পদ্ধতী।	৪। দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি
৫। বিরল রোগসমূহের জন্য সুবিধাজনক।	৫। বিরল রোগসমূহের জন্য সুবিধাজনক নয়।
৬। নির্ধারিত রোগ ব্যতিত অন্য কোন সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য দেয় না।	৬। অন্য কোন রোগ বা সমস্যা সম্বন্ধেও তথ্য বের হয়ে আসতে পারে।
৭। ব্যয় স্বল্প।	৭। ব্যয় অল্প।

রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানে ব্যবহৃত কতিপয় সংজ্ঞা (Some terms used in epidemiology)

ক) সংক্রমণ (Infection) ঃ কোন একটি সংক্রামক জীবাণু মানুষ বা প্রাণির শরীরে প্রবেশ, বৃদ্ধি এবং বংশ বৃদ্ধিকে সংক্রমণ বলে। সংক্রমণ প্রধানতঃ দুপ্রকার। যথা–

i) অনির্ণীত সংক্রমণ (Sub clinical infection) ও ii) নির্ণীত সংক্রমণ (Clinical infection)।

খ) দূষিত অবস্থা (Contamination) ঃ কোন সংক্রামক জীবাণুর শরীরের বহিরাংশে উপস্থিতি, যথা ঃ– কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, পানি বা খাদ্য বস্তু ইত্যাদিতে উপস্থিতিকে দূষিত অবস্থা বলে।

গ) দূষণ (Pollution) ঃ সংক্রামক জীবাণু, ব্যক্তি বা অন্য যে কোন ক্ষতিকর বস্তু পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানে উপস্থিতিকে দূষণ বলে। যেমন ঃ– বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি।

ঘ) পরজীবীসংক্রমণ (Infestation) ঃ শরীরের ভেতরে বা বাহিরে কোন পরজীবীর উপস্থিতি, বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধিকে পরজীবীসংক্রমণ বলে। যেমন– কৃমি দ্বারা সংক্রমণ, চুলে উকুন থাকা, ম্যালেরিয়ার জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ ইত্যাদি।

ঙ) সংক্রকমক রোগ (Contagious disease) ঃ সংস্পর্শজনিত কারণে জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ বা সৃষ্ট রোগকে সংক্রামক রোগ বলে। যেমন – খোচ পাচড়া (Scabes), দাদ (Ring) বা বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ, হাম, কলেরা, বসন্ত, বিভিন্ন প্রকার ফ্লু ইত্যাদি।

চ) গণসংক্রামক রোগ (Communicable diseade) ঃ সংক্রামক জীবাণু দ্বারা সংঘটিত রোগ যা ঘন বসতি অথবা এক সঙ্গে বসবাস করার ফলে প্রত্যক্ষভাবে মানুষ থেকে মানুষে, প্রাণি থেকে প্রাণিতে বা মানুষে, পরিবেশ থেকে মানুষে বিস্তার লাভ করে তাকে গণসংক্রামক রোগ বলে।

ছ) স্থানিক সংক্রামক রোগ (Endemic diseade) ঃ কোন একটি সংক্রামক রোগ কোন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী ও এলাকায় প্রায় সারা বছর নিয়মিতভাবে ও স্বাভাবিকহারে উপস্থিতিকে স্থানিক সংক্রামক রোগ বলে। যেমন – বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার অধিবাসিদের মধ্যে গলগন্ড, গোদ এবং কুষ্ঠ রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

জ) মহামারী (Epidemic) ঃ কোন রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যা কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রাদুর্ভাবকে মহামারী বলে।

ঝ) বিক্ষিপ্ত সংক্রমক (Sporadic) ঃ কোন একটি সংক্রামক রোগের অনিয়মিত বা বিক্ষিপপ্ত উপস্থিতিকে বিক্ষিপ্ত সংক্রমণ বলে। যেমন– ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি।

ঞ) বহুজাতিক মহামারী (Pandemic) ঃ কোন একটি মহামারী রোগ যখন আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে তখন তাক বহুজাতিক মহামারী রোগ বলে। যেমন– প্লেগ, বার্ড–ফ্লু প্রভৃতি।

ট) প্রাণিসংক্রমণ (Zoonotic disease) ঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাণি দ্বারা কোন রোগের সংক্রমণ হয় তখন তাকে প্রাণিসংক্রমণ বলে। যেমন– জলতঙ্ক রোগ (Water fair disease) পাগলা কুকুরের কামড় থেকে সংক্রমিত হয়।

ঠ) রোগতাত্ত্বিক অনুশীলন (Epidemiological trial) ঃ রোগতাত্ত্বিক অনুশীলনে প্রধানতঃ সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারে ৩টি বিষয়কে একত্রে রোগ সৃষ্টির ও সংক্রমণের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। উক্ত বিষয়সমূহকে রোগতাত্ত্বিক অনুশীলন (Epidemiological trial) বলে। নিচে উহা উল্লেখ করা হলো–

১) রোগ সৃষ্টিকারী উপাদান (Agent) ঃ যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী, ছত্রাক ইত্যাদি।

২) পোষক (Host) ঃ যেমন- মানুষের দেহ, প্রাণির দেহ ইত্যাদি।

৩) পরিবেশ (Environment) ঃ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য অসচেতন জনগোষ্ঠি প্রভৃতি।

সংক্রমণের ধারা (Chain of infecion) ঃ এর দ্বারা রোগ সংক্রমণের পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে। সংক্রমণের ধারা নিম্নলিখিতভাবে প্রদর্শন করা হয়।

১) সংক্রমণের উৎস বা ধারকের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ,

২) সংক্রমণ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ,

৩) সম্ভাব্য পোষকের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

১। সংক্রমণের উৎস বা ধারকের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ সংকমণের ধারার এই পর্যায়ে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা হয় ঃ

ক) দ্রুত রোগ নির্ণয় ঃ কোন সংক্রামক রোগ যখন কোন এলাকায় দেখা দেয়, তখন অতিদ্রুত উক্ত রোগটিকে চিহ্নিত করতে হবে। এই চিহ্নিতকরণের কাজটি উক্ত রোগের লক্ষণসমূহের সামঞ্জস্য দেখে নির্ণয় করা যাবে। এই চিহ্নিতকরণের কাজটি সাধরণতঃ ঐ এলাকায় কর্মরত চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকর্মী করতে পারেন।

খ) বিজ্ঞপ্তি জারীকরণ ঃ কোন একটি রোগ কোন এলাকায় সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে যাচ্ছে এমতাবস্থায় বিষয়টি সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। এই কাজটি উক্ত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী করবেন। বিজ্ঞপ্তি জারীকরণের কাজটি ধারাবহিকভাবে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তপক্ষকে জানতে হবে। এই ধারাবাহিক জানানোর প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঃ

তিনটি বিশেষ রোগ হলে তা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে জানাতে হয়। রোগগুলো হলো কলেরা, প্লেগ এবং ইয়োলো ফিভার।

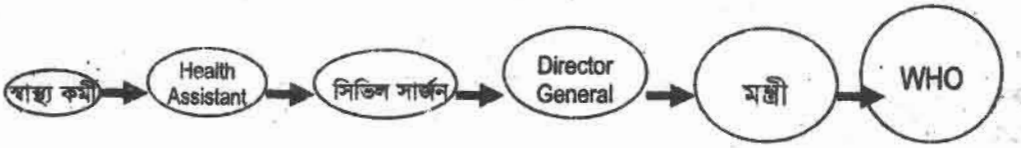

গ) রোগতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ঃ রোগতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়া কোন সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে বিস্তারিত ও সুসংগঠিত অনুসন্ধান পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে রোগটির প্রাদুর্ভাবের কারণ বা কারণসমূহ নির্ণয়, আক্রান্ত্র ব্যক্তি, এলাকা, সময় ইত্যাদি নির্ণয় অন্তর্ভুক্ত। এ কাজটি সাধারণতঃ উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা করেন।

ঘ) পৃথকীকরণ ঃ পৃথকীকরণ বলতে বিশেষ কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত সকল রোগী এবং তাদের সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে আসা ব্যাক্তিদের পৃথকীকরণ বোঝায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দ্বারা যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় এবং সুস্থ ব্যক্তি নতুন করে আক্রান্ত হতে না পারে।

ঙ) চিকিৎসা প্রদান ঃ রোগী চিহ্নিত করার পর উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে যথা সম্ভব দ্রুত রোগীকে সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করা। এর ফলে রোগীর শরীর থেকে বিস্তার লাভকারী জীবাণু মারা পড়বে এবং জীবাণুর উৎস বন্ধ হবে।

চ) সঙ্গারোধকরণ ঃ সঙ্গারোধকরণ করতে রোগীর সংস্পর্শে আসা সকল ব্যক্তিকে পৃথক অবস্থানে আবদ্ধ রাখাকে বোঝায়। এই ধরণের পৃথকীকরণ ব্যবস্থা সাধরণতঃ আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তার লাভকারী রোগসমূহের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। সঙ্গারোধকরণ কোন একটি রোগের উৎপত্তিকাল থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত করা হয়ে থাকে।

ছ) সংক্রমণ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ ঃ সংক্রমণের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত পরিবেশের উপাদানসমূহের নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ পরিবেশের বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে থাকে। সংশ্লিস্ট রোগের মাধ্যম বা মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করে মাধ্যমসমূহের দূষণ প্রতিরোধ করা হয়। সংক্রমণের শিকলকে নষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ফলে নতুন পোষক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

জ) পরোক্ষ প্রতিষেধক টিকা প্রদান ঃ পরোক্ষ প্রতিষেধক টিকা প্রদানের অর্থ হচ্ছে বাহিরে প্রস্তুতকৃত এন্টিবডি প্রয়োগের মাধমে সম্ভাব্য পোষকের শরীর প্রতিষেধক ক্ষমতা তৈরি করাকে বোঝায়। যেমন – বিভিন্ন প্রকার প্রতিষেধক টিকা যথাঃ কলেরা ভেক্সিন, বসন্তের টিকা, এটিএস ইত্যাদি।

ঝ) সক্রিয় ও পরোক্ষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মিশ্র প্রয়োগ ঃ এক্ষেত্রে সম্ভাব্য পোষক অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবাণুর সংক্রমণের কারণে দ্রুত রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে তাকে পরোক্ষ এবং সক্রিয় উভয় ধরনের টীকা একযোগে প্রদানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘ মেয়াদী সুরক্ষার জন্য মিশ্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ তৈরিকৃত এন্টিবডি এবং টীকা একত্রে প্রয়োগ করা হয়। যেমন– ATS + TT।

ঞ) ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধ ঃ বেশ কিছু রোগ রয়েছে যাদের প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় বা প্ররোক্ষ কোন টীকা নাই। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত এন্টিবায়েটিক জাতীয় ওষধ প্রতিরোধের কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন–

কলেরা টেট্রাসাইক্লিন,
প্লেগ টেট্রাসাইক্লিন,
ম্যালেরিয়া ক্লোরোকুইন ইত্যাদি।

২। সংক্রমণ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ ঃ পোষকের সক্রিয় প্রতিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে আক্রমণকারী কতিপয় রোগ জীবাণুর হাত থেকে শরীরকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করা যায়। সক্রিয় প্রতিরোধ সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে টীকা প্রদানের মাধমে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি একটি অন্যতম উপায়। এক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগকৃত টীকাটি একটি 'Antigen' হিসাবে কাজ করে, যা শরীরের প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে একটি সুনির্দিষ্ট 'Antibody' উৎপাদন করে উক্ত 'Antibody' পরবর্তীতে পূর্বতন 'Angigen' সমৃদ্ধ কোন জীবাণূ শরীরে প্রবেশ করলে তাকে সনাক্ত করে এবং বিশেষ 'Antigen-Antibody' প্রক্রিয়ার সাহায্যে উক্ত জীবাণুকে ধ্বংস করে। ইহা একটি সক্রিয় রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি।

৩। সম্ভাব্য পোষকের নিয়ন্ত্রণ বা সুরক্ষা ঃ সম্ভাব্য পোষককে সনাক্ত করে তার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয় ঃ

ক) সক্রিয় টীকা প্রদান,

খ) পরোক্ষ টীকা প্রদান,

গ) মিশ্র সক্রিয় বা পরোক্ষ টীকা প্রদান,

ঘ) ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি,

ঙ) স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি।

খাদ্য (Food)

খাদ্য হলো এক প্রকার সামগ্রী যা গ্রহণ করলে পরিপাক ও বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ তা ব্যবহার করে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ নতুন কোষ বা কলা গঠন করে থাকে। আবার ক্ষয়প্রাপ্ত কোষ বা কলা পুণঃনির্মাণ ও দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্য প্রত্যেক জীবের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। যে সকল উপাদান গ্রহণ করলে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, কর্মশক্তি উৎপাদন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি প্রভৃতি কাজ সাধিত হয় তাকে খাদ্য বলে।

খাদ্যের কাজ (Functions of food) ঃ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে গৃহের নিম্ন বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন হয় ঃ

ক) দেহের ক্ষয়পূরণ,
খ) দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন,
গ) দেহের শক্তি উৎপাদন ও তাপ উৎপাদন,
ঘ) দেহের রোগ প্রতিরোধ করা,
ঙ) দেহের ভিতরের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা।

খাদ্যের উপাদান (Elements of food) ঃ খাদ্যের প্রধান উপদান ৬টি । যথা ঃ

ক) শর্করা (Carbohydrate)
খ) আমিষ (Protein)
গ) চর্বি (Fat)
ঘ) খাদ্যপ্রাণ (Vitamin)
ঙ) খনিজ (Minerals)
চ) পানি (Water)

খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of food) ঃ বিভিন্ন ভাবে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। তম্মধ্যে কাজ, রাসায়নিক গঠন এবং পুষ্ঠিমান অন্যতম।

i) কাজের ভিত্তিতে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ঃ কাজের ভিত্তিতে খাদ্যেকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ
   ক) শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য (Energy yeiding food),
   খ) দেহ গঠনকারী খাদ্য (Body building food)
   গ) প্রতিরোধমূলক খাদ্য (Protective food)

ক) শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য ((Energy yeilding food) ঃ এসব খাদ্যের প্রধান ভূমিকা হলো দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপাদন করা এবং শরীর চালানোর জন্য শক্তি সঞ্চার করা। শরীরের ভেতরের বিভিন্ন কাজ কর্ম যেমন– হৃদপিন্ড, রক্ত সংবহনক্রিয়া, পরিপাক, বিপাক, প্রভৃতির জন্য শক্তি প্রয়োজন। প্রধান প্রধান শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্যগুলো হলো গম, আলু, চাল ইত্যাদি।

খ) দেহ গঠনকারী খাদ্য (Body Building food) ঃ যে সকল খাদ্য দেহের কাঠামে তৈরি করে থাকে তাদের সেহ গঠনকারী খাদ্য বলে। প্রত্যহ দেহে কলার যে ক্ষয়সাধন হয় এই খাদ্য তা পূরণ করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। দেহ গঠনকারী খাদ্যগুলোর মধ্যে মাছ, মাংস, ডাল, ডিম ইত্যাদি প্রধান।

গ) প্রতিরোধমূলক খাদ্য (Protective food) ঃ মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য যে সকল খাদ্যের প্রয়োজন হয় সেই জাতীয় খাদ্য এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এরা বাইরের ক্ষতিকর

বস্তু থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে। এই জাতীয় খাদ্য দেহের বিভিন্ন অংশের কাজ কর্ম স্বাভাবিক রাখে। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্যগুলো এই শ্রেণিভূক্ত। যথা ঃ দুধ, প্রাণির যকৃত, শাক--সবজি, ফলমূল ইত্যাদি।

ii) রাসায়নিক উপাদানের ভিত্তিতে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ঃ রাসায়নিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে খাদ্যকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন ঃ আমিষ, চর্বি, শর্করা, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ।

ক) আমিষ (Protein) ঃ আমিষ হলো নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ জৈব যৌগ যার মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার ইত্যাদি থাকে। এক কথায় আমিষ হলো এমাইনো এসিডের লম্বা শিকল। মানুষের দেহের বৃদ্ধির জন্য আমিষের ভূমিকা সর্বাধিক। আমিষ জাতীয় খাদ্য হলো-- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল ইত্যাদি। আমিষ সাধারণত দুই প্রকার।

১) প্রাণিজ আমিষ ঃ যা প্রাণি থেকে পাওয়া যায় তাই প্রাণিজ আমিষ। যেমন ঃ মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি।

২) উদ্ভিজ আমিষ ঃ যে সমস্ত আমিষ উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় তাই উদ্ভিজ আমিষ। যেমন ঃ ডাল, বাদাম, সিম ইত্যাদি।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। যেমন ঃ রক্ত স্বল্পতা, পুষ্টিহীনতা, শিশুদের কোয়াশিওরকর, ম্যারাসমাস ইত্যাদি।

খ) চবি (Fat) ঃ যে সকল খাদ্য দেহে দগ্ধীভূত হয়ে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে তাদরে চর্বি জাতীয় খাদ্য বলে। চর্বি সাধারণতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণি থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং উৎস অনুসারে চর্বি ২ প্রকার।

১) উদ্ভিদ চর্বি ঃ যে সমস্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সরিষা, সয়াবিন, সূর্যমুখী তৈল, বাদাম তৈল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২) প্রাণিজ চর্বি ঃ যে সমস্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য প্রাণি থেকে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ঘি, মাখন, পনির, ডিমের কুসুম ইত্যাদি প্রধান।

রাসায়নিক উপাদানের ভিত্তিতে চর্বি ৩ প্রকার। যথা ঃ

১। ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride)

২। ফসফোলিপিড (Phospholipid)

৩। কোলেস্টেরোল (Cholesterol)

মানুষের দেহে চর্বি জাতীয় খাদ্যের অভাবে ত্বক শুষ্ক হওয়া, দেহের তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

গ) শর্করা ((Carbohydrate) ঃ শর্করা হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জৈব যৌগ। শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহের শক্তি উৎপাদন করে। আটা, চাল, আলু উদ্ভিদের মূল, কাঁচা ফলমূল এবং বীজে প্রচুর পরিমাণে শর্করা বিদ্যমান। রাসায়নিক উপাদানের ভিত্তিতে শর্করাকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমনঃ--

১। মনোস্যাকারাইড (Mososaccharide) ঃ যে সকল শর্করার মধ্যে একটি মাত্র শর্করা অণু আছে তাদের মনোস্যাকরাইড বলে যেমন ঃ গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি।

২। ডাই–স্যাকারাইড) (Disaccharide) ঃ যে সকল শর্করার মধ্যে দুটি শর্করা অণু আছে তাদের ডাই–স্যাকারাইড বলে। যেমন– সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ইত্যাদি।

৩) পলিস্যাকারাইড (Polysaccharide) ঃ যে সকল শর্করার মধ্যে তিনটি বা ততোধিক শর্করা অণু আছে তাদের পলি–স্যাকারাইড বলে। যেমন ঃ গ্লাইকোজেন, স্টার্চ, সেলুলোজ, চিনি ইত্যাদি।

ঘ) খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) ঃ খাদ্য প্রাণ হলো কতকগুলো রাসায়নিক উপাদান, যা দেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এরা দেহকে রোগ থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন উপাদান থেকে খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। খাদ্যপ্রাণকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়।

১। চর্বি দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ (Fatsolule vitamin) ঃ চর্বিতে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণগুলো হলো ভিটামিন–এ, ভিটামিন–ডি, ভিটামিন–ই এবং ভিটামিন–কে।

২। পানিতে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ (Water soluble vitamin) ঃ পানিতে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণগুলো হলো ভিটামিন–বি কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন সি।

খাদ্যপ্রাণের প্রধান প্রধান উৎসগুলো হলো সামুদ্রিক মাছ, সবুজ শাক–সবজি, ঢেঁকি ছাটা চাল, ফলমূল ইত্যাদি। খাদ্যপ্রাণের অভাবে দেহে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। যেমন ঃ রাত কানা, শিশুদের রিকেটস, বেরিবেরি, স্কার্ভি, গালের ঘা ইত্যাদি।

ঙ) খনিজ (Minerals) ঃ এই জাতীয় খাদ্য উপাদান দেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। খনিজ উপাদান সাধারণত ঃ মাটির নিচ থেকে সংগৃহিত হয়। উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটির অভ্যন্তর থেকে বিভিন্ন খনিজ উপাদান সংগ্রহ করে। সুতরাং উদ্ভিজ খাদ্য থেকে প্রাণি খনিজ উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। আবার প্রকৃতি থেকেও সরাসরি খনিজ উপাদান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। খনিজ উপাদানগুলো হলো ঃ সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন, আয়োডিন ইত্যাদি। খাদ্যে খনিজ উপাদানের অভাবে বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। যেমন ঃ সোডিয়াম ও ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় ও দাঁত ভঙ্গুর , আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, আয়রনের অভাবে রক্ত স্বল্পতা প্রভৃতি হতে পারে।

iii) পুষ্টিমানের উপর ভিত্তি করে খাদ্যের উপাদান ঃ পুষ্টিমানের ভিত্তিতে খাদ্যকে নিম্নবর্ণিত ৮ টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন ঃ ক) শাক–সবজি (Vegetables) ঃ শাক–সবজি পুষ্টিমানের দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যেমন ঃ লাল শাক, পালং শাক, কচুর শাক, ফুলকপি, বাধাকপি, গাজর, মুলা, লাউ, সিম, টমেটো প্রভৃতি।

খ) বাদাম (Nuts) ঃ বিভিন্ন প্রকারের বাদামের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ ও পুষ্টিমান রয়েছে। যেমন ঃ চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম ইত্যাদি।

গ) তেল ও চর্বি (Oil & fat) ঃ তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের তেল বীজ ও প্রাণি থেকে তৈল ও চর্বি পাওয়া যায়। যেমনঃ সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, সূর্যমুখীর তেল, তিলের তেল, তিষির তেল, ঘি, মাখন, পনির, প্রাণীর চর্বি ইত্যাদি।

ঘ) ফলমূল (Fruits) বিভিন্ন প্রকার ফলমূলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য প্রাণ ও খনিজ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেপে, পেয়ারা, আমড়া, আমলকি, জামরুল, লিচু, সফেদা, কুল ইত্যাদি।

ঙ) চিনি (Sugar) বিভিন্ন প্রকার শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহের শক্তি যোগায়। শর্করা জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস ইক্ষু। এ ছাড়া চাল, গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতিতেও প্রচুর পরিমাণে শর্করা রয়েছে।

চ) প্রাণিজ খাদ্য (Animal food) ঃ প্রাণির দেহ থেকে যে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করা হয় তা প্রাণিজ খাদ্য। প্রাণিজ খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ আমিষ, চর্বি ও খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, চর্বি প্রভৃতি।

ছ) আচার ও মসলা (Condimets & spices) বিভিন্ন প্রকার মৌসুমী ফল সংরক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-সি থাকে। বিভিন্ন প্রকার মসলা খাদ্যের সাথে রান্নার জন্য ব্যবহার করা হয়। ফলে খাদ্য সুস্বাদু হয় বটে কিন্তু এতে খাদ্যমান কম থাকে। খাদ্যে মসলা কম ব্যবহার করাই শ্রেয়। বাংলাদেশে আমের আচার, কুলের আচার, আমড়ার আচার, তেঁতুলের আচার, মরিচের আচার প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়। এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, আলু বোখারা, জায়ফল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মসলা।

জ) মিশ্রিত খাদ্য (Miscellanious food) বিভিন্ন খাদ্যের সংমিশ্রনে যে সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। তা মিশ্রিত খাদ্য। মিশ্রিত খাদ্য অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিমান সমৃদ্ধ। যেমন- ফ্রুট কাস্ট্যারড ফালুদা, হালুয়া, পিঠা, পুলি প্রভৃতি।

সুষম খাদ্য (Balanced food) ঃ মানবদেহের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য তালিকায় সব ধরনের উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য থাকা প্রয়োজন। যেমন-আমিষ, শর্করা, চর্বি, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ ও পানি। যে খাবারে খাদ্যের সবগুলো উপাদান সুনির্দিষ্ট অনুপাতে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সুষম খাদ্য থাকা অপরিহায়। তবে বিশেষ করে শিশুদের খাদ্য সুষম না হলে তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিলাভে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। যেহেতু দুধে খাদ্যের সকল রূপাদান সঠিক ও সুনির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে সে জন্য দুধ একটি সুষম খাদ্য।

সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট ঃ একটি সুষম খাদ্যে নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্টসমূহ থাকা বাঞ্চনীয়।

ক) সুষম খাদ্য সহজ লাভ্য হতে হবে। খ) সুষম খাদ্য সুস্বাদু ও রুচিকর হতে হবে। গ) সুষম খাদ্য লঘুপাক হবে এবং সব ধরনের মানুষের শরীরের জন্য সহজে গ্রহণযোগ্য হবে। ঘ) সুষম খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ এবং খনিজ উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকতে হবে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (Primary health care) ঃ বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠী ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য জরুরী এবং আবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষে জাতিসংঘের অংগ সংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর উদ্যোগে ১৯৭৮ সালে সকল সদস্য রাষ্ট্রের একটি সমাবেশ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আলমাআতা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্য়া নামক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচীর রূপ রেখা প্রণয়ন করা হয়। যার মাধ্যমে সকল সদস্য রাষ্ট্র ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' শ্লোগানের সফল বাস্তবায়নের অঙ্গিকারবদ্ধ হয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা একটি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচী। যা বাস্তব,বিজ্ঞানসম্মত ও সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ও প্রযুক্তি বির্ভর এবং লোক সমাজের পূর্ণ অংশগ্রহণে ব্যক্তি ও পরিবারের সকল পর্যায়ে সহজলভ্য। লোক সমাজ ও দেশের উন্নয়নের বাধার সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ ও সামর্থের মধে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়া সংকল্পবদ্ধ।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার নীতিমালা ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মকান্ডসমূহ যে নীতিমালায় পরিচালিত হবে তা নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) সমতার ভিত্তিতে বন্টন (Equitable distribution), খ) জন্যনের অংশগ্রহণ (Peoples participation), গ) আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় (Interdepartmental coordination), ঙ) লাগসই প্রযুক্তি (Appropriate technology) ।

ক) সমতার ভিত্তিতে বন্টন (Epuitable diatribution) ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মূলমন্ত্র অনুযায়ী এই পরিসেবা এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে কোন ভূখন্ডে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে, সকল জনগোষ্ঠকে অন্তর্ভুক্ত করবে এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ধনী গরীব, প্ররুষ, মহিলা, শিশু, শহরবাসী গ্রামবাসী অর্থাৎ যে কোন মানুষ সর্ব পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা পাবে।

খ) জন্যনের অংশগ্রহণ (Peoples participation) ঃ যে জনগোষ্ঠির জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কম্কান্ড পরিচালিত হবে সেই জনগোষ্ঠীকে উক্তকর্মকান্ডের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করা। যাতে উক্ত কর্মকান্ডসমূহ তাদের জন্য এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে বলে আশানুরূপ ফল অর্জিত হয়। কর্মসূচীসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনে পরিসেবা কর্মকান্ড স্থানীয় জনগণের দ্বারা তাদের অর্থায়নে পরিচালনা করতে হবে।

গ) অন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় (Interdepartmental coordination) ঃ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় বলতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত সেবাসম্যূহ জনগণকে প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগে ও উক্তবিভাগের সাথে জড়িত কর্মীসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ যারা উক্ত বিশেষ সেবা প্রদানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ও সক্ষম, তাদের সকলের সমন্বিত কার্যক্রমকে বোঝায়। বিশখুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশনের কার্যক্রমটি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ পরিচালনা করে।

ঘ) লাগসই প্রযুক্তি (Appropriate technology) ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশ ও অঞ্চলে বিশেষ সহজলভ্য প্রযুক্তি ও সেবা গ্রহণকারী জনগণের জন্য উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তি এবং প্রদানের ব্যবস্থা

করতে হবে। যেমন আমদের গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের পাইপলাইনে পানি সরবরাহের পরিবর্তে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা। খাবার স্যালাইন সরবরাহ ও সেনেটারী পায়খানা অথবা পানিবন্ধি পায়খানা (Water seal latrine) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপাদানসমূহ (Components of primary health care) ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিচে বর্ণিত উপাদানসমূহ অত্যাবশ্যকীয়ঃ

১। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা ঃ কোন অঞ্চলে বা জনগোষ্ঠিতে বিরাজমান স্বাস্থ্য সমস্যা, উহার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষায় শিক্ষিত স্বাস্থ্য ও সেবাকর্মি তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। সুশিক্ষিত স্বাস্থ্য ও সেবাকর্মির সহযোগীতায় কোন একটি জনগোষ্ঠিকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্য ও সেবাকর্মিগণ উক্ত এলাকায় বিরাজমান স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে উহার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে তাদের পাশে থেকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা বলতে বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে পালনীয় বিশেষ বিশেষ স্বাস্থ্য বিধিসমূহ সম্বন্ধে জনগনকে অবহিত করা, তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিধিসমূহকে বাস্তবে চর্চা করার শিক্ষা এবং কৌশলে প্রয়োগ করার যোগ্যতাকে বোঝায়। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতন বৃদ্ধির লক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। খাদ্য সরবরাহের উন্নয়ন ও যথাযথ পুষ্টিঃ কোন এলাকায় বা জনগোষ্ঠিতে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য উক্ত এলাকায় খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য সরবরাহ এবং খাদ্য গ্রহণ সকল বিষয়ের উন্নয়ন প্রয়োজন । এ ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্ব প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কাজকর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমে উহা অর্জন করা সম্ভব।

৩। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনঃ শহর এবং গ্রামাঞ্চল ভেদে স্থানীয় পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং মলমূত্র, বর্জ্য পদার্থ ও আবর্জনা নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে পাইপ লাইনে অথবা নলকূপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতিতে মলমূত্র নিষ্কাশন ব্যবস্থা উক্ত কর্মসূচির অন্তর্গত।

৪। মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা ঃ এ কর্মসূচির আওতায় প্রধানতঃ প্রতি মায়ের পরিচর্যাও নবজাতক শিশু এবং ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সকল ধরনের পরিচর্যা। এ ছাড়া পরিকল্পিত পরিবার গঠণও জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সেবাসমূহ উল্লেখযোগ্য।

৫। সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদানঃএই কার্যক্রমের আওতায় ১ বছর বয়সী সকল শিশুকে বিনামূল্যে ৬টি সংক্রামক ব্যাধি যেমন– যক্ষা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও ও হাম রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান অন্তর্ভুক্ত।

৬। স্থানিক রোগসমূহের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণর স্থানীয় ভাবে সচরাচর বিরাজমান রোগসমূহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা এই কর্মসূচির অন্তর্গত। অঞ্চল ভেদে এই কার্যক্রম বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিয়মিত পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

৭। সাধারণ রোগ ব্যাধি ও জখমের যথাযথ চিকিৎসা ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমের আওতাধীন জনগোষ্ঠির সাধারণ ও নিয়মিত অসুখ বিসুখ ও দুর্ঘটনাজনিত আঘাত ও জখমের উপযুক্ত নিরাময়মূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

৮। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের যোগান ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমের আওতাধীন জনগোষ্ঠির সাধারণ ও নিয়মিত রোগসমূহের প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং আরোগ্যমূলক সেবাসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে ঔষধপত্র, প্রতিষেধক টিকা, চিকিৎসা সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সরবরাহ ও যোগান দেয়া এই কর্মসূচির অন্তর্গত।

প্রশ্নমালা

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গণস্বাস্থ্য কী?

২। স্বাস্থ্য কাকে বলে?

৩। স্বাস্থ্য বর্ণালী কাকে বলে?

৪। স্বাস্থ্য সূচক কি?

৫। রোগ কাকে বলে?

৬। রোগতত্ত্ব বিজ্ঞান বলতে কি বোঝ?

৭। সংক্রমন কী?

৮। খাদ্য কী?

৯। খাদ্যের কাজ কি কি?

১০। সুষম খাদ্য কাকে বলে।

১১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কি?

১২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার উপাদানগুলো কি কি?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বাস্থ্য অবস্থার নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর।

২। রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

৩। বিশ্লেষণমূলক রোগতত্ত্ব আলোচনা কর।

৪। রোগ সৃষ্টির স্বাভাবিক ইতিহাস বর্ণনা কর।

৫। রোগ প্রতিরোধে হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

৬। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার নীতিমালা বর্ণনা কর।

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক–১

২য় পত্র

ব্যবহারিক

১। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন চিহ্নিত কর এবং অংশগুলোর কাজ বর্ণনা কর।

একটি যৌগিক অণুবীক্ষন যন্ত্র

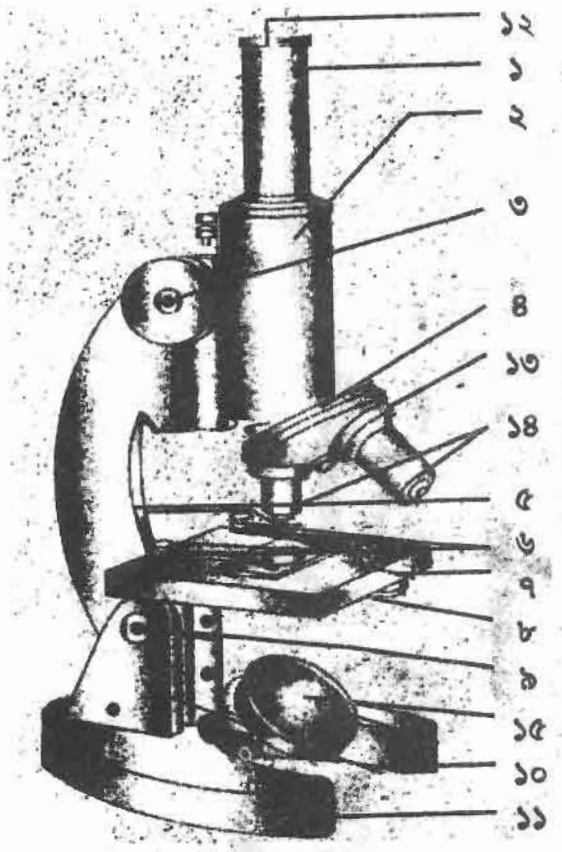

একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

২। একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পায়খানার নমুনায় পরজীবীর উপস্থিতি নিরূপণ কর।

একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

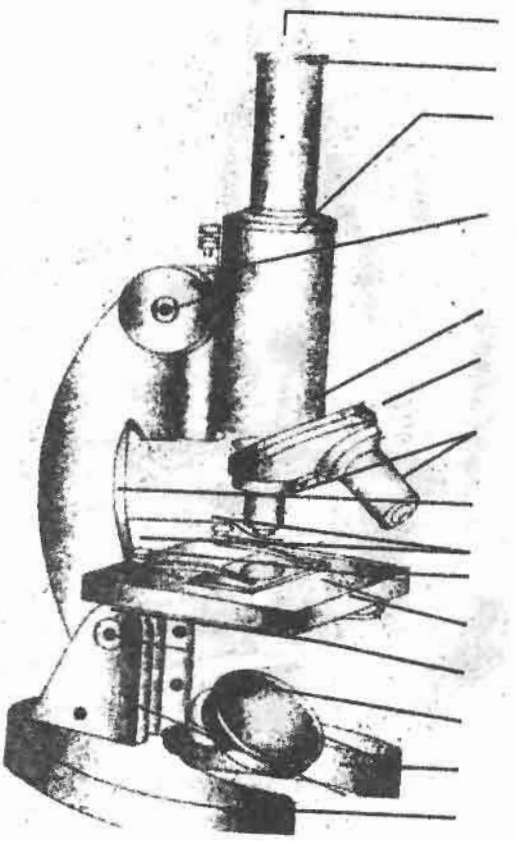

একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

৩। একটি ব্যাকটেরিয়ার আঙ্গিক গঠন বর্ণনা কর এবং অঙ্গাসমূহ চিহ্নিত কর।

ব্যাকটেরিয়ার গঠন।

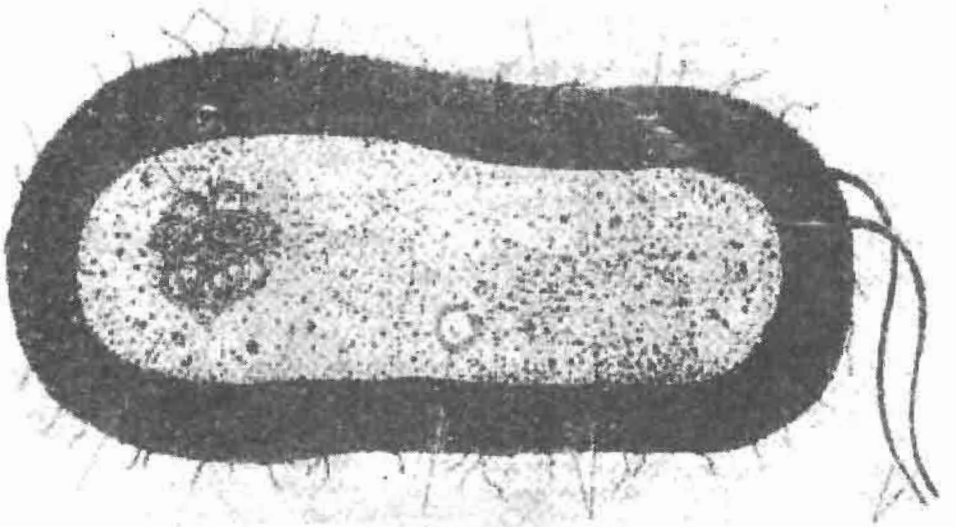

ব্যাকটেরিয়ার গঠন

৪। এন্টামোইবা হিস্টোলাইটিকার জীবনচক্রের ধাপগুলো বর্ণনা কর ও চিহ্নিত কর।

এন্টামোইবো হিস্টোলাইটিকার জীবনচক্র

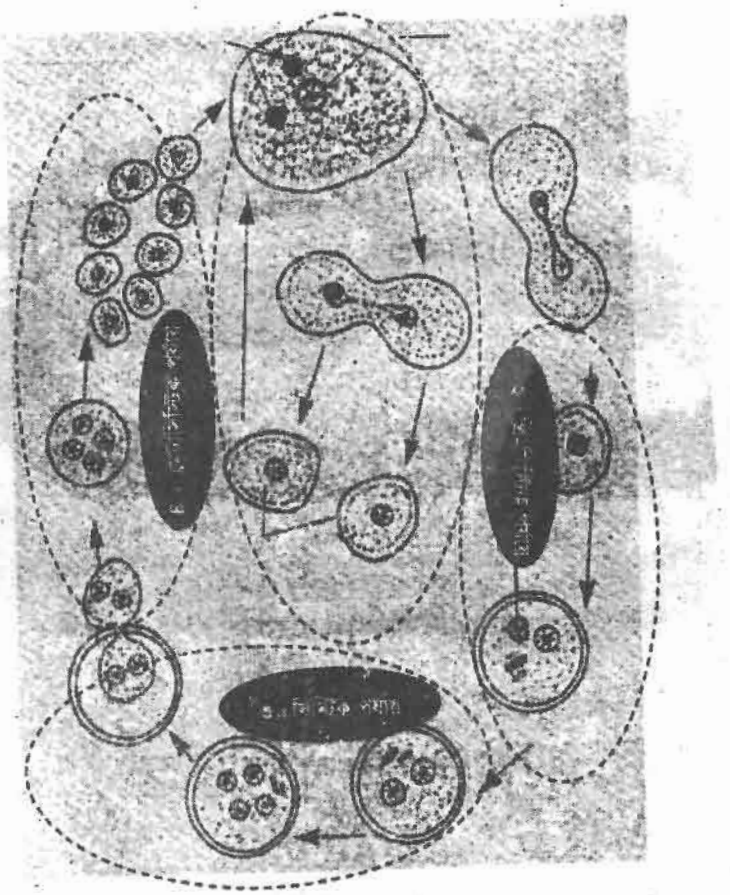

এন্টামোইবো হিস্টোলাইটিকার জীবনচক্র

৫। ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রের ধাপগুলো চিহ্নিত কর।

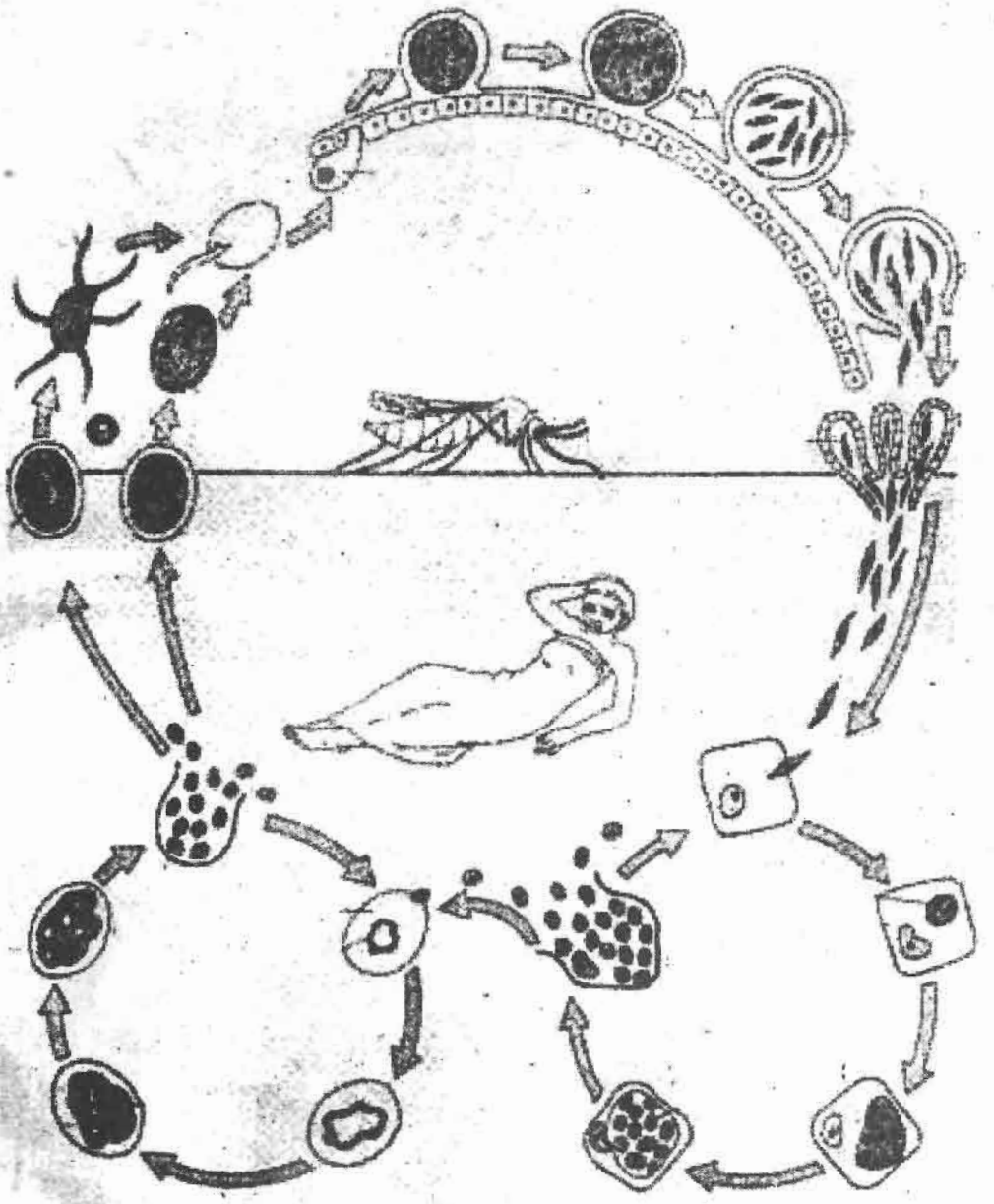

৬। নিচের চিত্রগুলো চিহ্নিত কর।

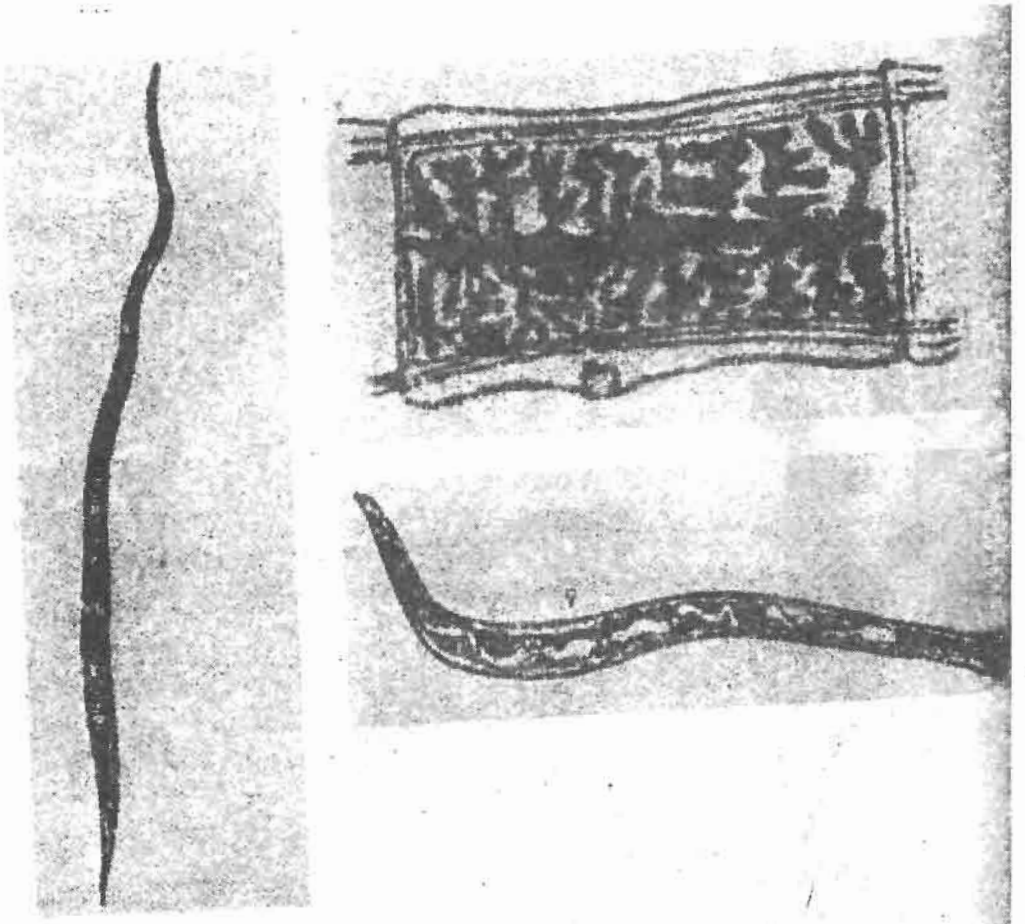

৭। নিম্নের কৃমির ডিমগুলো চিহ্নিত কর।

২০২০ শিক্ষাবর্ষ

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য